RIZON

সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

মেজর রাহাত

৭



সেবা

প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর
সাগর-সঙ্গম-১, ২ * রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২ * কায়রো * মৃত্যু-প্রহর
গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল
অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত
এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ? * বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২
অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর-১, ২
ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা * তিনশত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২
হংকং সম্রাট-১, ২ * কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩
প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২ * গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২
পপি * জিপসী-১, ২ * আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২
হ্যালো, সোহানা-১, ২ * হাইজ্যাক-১, ২
আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২

সেবা প্রকাশনী

মেজর রাহাত-১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১০৯

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮২

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

MAJOR RAHAT-1
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন।

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

বৃহস্পতিবার, তেসরা এপ্রিল, উনিশশো একচল্লিশ সাল।

বিস্ফোরণ ঘটতে দশ মিনিটও বাকি নেই আর। রেল-স্টেশনে দাঁড়ানো অয়েল ট্যাংকার ওয়াগনের মাথায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেজর রাহাত খান। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা। নিচে, প্ল্যাটফর্মে ভারি বুট জুতোর আনাগোনা শুরু হয়েছে, বুখারেস্ট রেলইয়ার্ড ঘিরে ফেলেছে জার্মান পেট্রল। পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

সেই সন্ধ্যে থেকে ঝিরঝির ইলশে গুঁড়ির মতো তুষার ঝরছে, জমাট বেঁধে পিচ্ছিল, শক্ত হয়ে গেছে ওয়াগনের ছাদ, তার ওপর নিঃসাড় পড়ে আছে রাহাত। কনকনে ঠাণ্ডায় শরীরের অস্থি-মজ্জা ব্যথা করছে সব। আচমকা রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ভরাট, গম্ভীর গর্জনে। কাছাকাছি থেকে একজন জার্মান অফিসারের কর্কশ গলা শোনা গেল। 'কাঁটাতারের বেড়ার ওপর নজর রাখো সবাই···কাউকে দেখতে পাবার দরকার নেই, কিছু নড়ছে বলে মনে হলেই গুলি করবে···

হুপার, সিগন্যাল বক্সে উঠে যাও—চারদিকটা ভাল করে দেখতে পাবে ওখান থেকে…’

এপ্রিলের এটা তৃতীয় রাত, অথচ শীত এখনও আঁকড়ে ধরে আছে রুমানিয়াকে, বসন্তের কোনো লক্ষণই নেই। পুবের রাশান স্তেপ আর ধু-ধু সাইবেরিয়া থেকে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাসে কুঁকুড়ে আছে দেশটা। রাত দুটোর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেদার কোটের বাধা মানছে না, সারা শরীরে কাঁকড়া বিছার বিষাক্ত কামড় অনুভব করছে রাহাত। টিউব আকৃতির ওয়াগন, ঠিক ওপরটায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও। একটু নড়ার যো নেই। নিচের রেল-লাইন ঘেঁষে একজন জার্মান সৈনিক শরীরের দু’পাশে হাতের বাড়ি মারতে মারতে এগিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পেয়ে নিজের দস্তানা পরা হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত নাড়তে সাহস হলো না ওর। কংক্রিটের প্ল্যাটফর্মেও জমাট বেঁধে গেছে তুষার, ভারি বুটের চাপে গাছের চিকন শাখা ভাঙার মট-মট আওয়াজ পেল ও।

হাত-পা ধীরে ধীরে অবশ, অসাড় হয়ে আসছে। নড়াচড়া করে রক্ত চলাচল বাড়াতে না পারলে মাংস আর মাংস থাকবে না, বরফ হতে শুরু করবে। এরই মধ্যে নাক আর কানে স্পর্শ-বোধ হারিয়ে ফেলেছে ও। ওগুলোর অস্তিত্বই অনুভব করছে না। হাত দিয়ে ডলে গরম করে তুলতে না পারলে চিরকালের জন্যে হারাতে হবে ওগুলোকে। ওদিকে, মার্চ করে দ্রুত এগিয়ে আসছে আরও জার্মান সৈন্য। কিন্তু এসবের চেয়েও গুরুতর একটা বিপদের কথা ভাবছে সে।

কয়েক হাজার গ্যালন রিফাইনড্ এভিয়েশন পেট্রলের

মাথায় শুয়ে আছে ও। মাত্র কিছুদিন হলো রুমানিয়া দখল করেছে জার্মানী, কিন্তু এরই মধ্যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি নিজেদের দেশে পাঠাবার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে তারা। এই বিশাল ট্যাংকারের পেটে আটকানো আছে দশ কিলোগ্রাম কম্পোজিট ডিমোলিশন চার্জ। নিজের হাতে টাইম ফিউজও সেট করে দিয়েছে ও, টিক টিক করে দ্রুত এগিয়ে আসছে জিরো আওয়ার। পেট্রল ট্রেনের লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছোট আরও কিছু চার্জ ফিট করা হয়েছে, দশ কিলোগ্রাম বিস্ফোরিত হলে এক এক করে ফাটতে শুরু করবে ওগুলো।

চার্জ ফিট করার কাজ শেষ করেছে রাহাত, এই সময় পৌঁছুলো জার্মান টহলদার বাহিনী। অর্ডারের বহর আর মতিগতি দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, অবাঞ্ছিত কেউ আছে কিনা চেক করতে এসেছে ওরা। তবে এখনও হয়তো ওদের মাথায় একজন অন্তর্ঘাতক ঠাঁই পায়নি। ইতিমধ্যে তারা শুধু পেট্রল ট্রেনটাকে নিখুঁতভাবে ঘেরার কাজ শেষ করেছে, তন্ন তন্ন করে কিছু বা কাউকে খুঁজছে না।

উলেন স্কার্ফ আর নরম হ্যাটের মাঝখানে ঘাড়ের খানিকটা জায়গা উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে, সেখানে ঝুরঝুরে তুষার জমেছে। মাথা ঝাড়া বা হাত ঝাপটা দিয়ে সেগুলো সরাবার কোনো উপায় নেই। মাথা নিচু করে আছে ও, নিচের প্ল্যাটফর্মে কে কোথায় দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছে না। একটু নড়লেই হয়তো কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। ঝুঁকি নেয়া চলে না।

হাতঘড়ির কাঁটায় রেডিয়াম লাগানো আছে, দূর থেকে ক্ষীণ আলোর আভাস পেয়ে কেউ ওর পজিশন জেনে ফেলতে পারে, তাই কব্জির উল্টোদিকে রেখেছে ডায়ালটাকে। এক চুল এক চুল করে ডায়ালটা চোখের নিচে নিয়ে এল রাহাত। বিস্ফোরণ ঘটতে আর মাত্র আট মিনিট বাকি।

আট মিনিট পর চার্জ বিস্ফোরিত হলে পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে ট্যাংকার—বিশাল একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে গোটা রেলইয়ার্ড। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মেজর রাহাত খান। কেউ ওকে ধরে রাখেনি, কিন্তু তবু পজিশন বদলাবার জন্যে এক চুল নড়তে পারছে না ও। সিলিণ্ডার আকারের মেটাল ট্যাংকারের ঢালু গায়ে জমাট তুষার পিচ্ছিল হয়ে আছে, নড়াচড়া না করলেও ওর শরীরের চাপে ধ্বসে পড়তে পারে বরফ, এবং পিছলে গিয়ে নিচে, জার্মান সৈনিকদের পায়ের কাছে পড়তে পারে ও।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি একটা ল্যাম্প, সেটার নিচ দিয়ে মেটে রঙের একটা মূর্তিকে হেঁটে যেতে দেখলো রাহাত। ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করলো লোকটা সিগন্যাল বক্সের দিকে। ছ'টা লোহার পায়ার মাথায় অনেক উঁচুতে চৌকো একটা ঘর, চারদিকে চারটে গরাদহীন জানালা।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এয়ারক্রাফট থেকে ল্যাম্প-গুলো দেখা যাবে না, রেলইয়ার্ডের ভেতর এবং বাইরে সবগুলো ল্যাম্পে হুড পরানো আছে। প্লোয়েসটি অয়েল-ফিল্ডে গিয়ে বোমা ফেলতে হলে এই পথ দিয়েই যেতে হবে মিত্রপক্ষের

বম্বারগুলোকে। আলো দেখতে পেলে পথের দিশা পেয়ে যাবে পাইলটরা। তারমানে অবশ্য এই নয় যে রয়্যাল এয়ারফোর্সের রেইড আশা করছে রাহাত। অসংখ্য বম্বার হারিয়ে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সে বম্বার আর গোণা-গুণতি খান কয়েক যাও বা আছে, সেগুলো এতটা দূরত্ব পেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ। এসব কারণেই সদ্য দখল করা অয়েল রিজার্ভগুলো অন্তত এয়ার অ্যাটাকের বিপদ থেকে মোটামুটি মুক্ত বলে মনে করছে জার্মান-রা। সেই একই কারণে, মিত্র পক্ষের জন্যেও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে জার্মানীর অয়েল রিজার্ভগুলো যে-কোনো উপায়ে ধ্বংস করা।

নিচে থেকে মটমট করে বরফ ভাঙার আরও শব্দ পেল রাহাত। আর সবার মতো লোকটা চলে গেল না, রাহাতের ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে পড়লো। নিজের অজান্তেই টান পড়লো ওর পেশীতে, তারপর ধীরে ধীরে ঢিল পড়তে শুরু করলো। ট্যাংকারের গায়ের এক পাশে ধাতব মই ফিট করা রয়েছে, মই-য়ের শেষ ধাপটা ওর মাথার কাছ থেকে ইঞ্চি কয়েক দূরে। মই বেয়ে উঠে আসছে নাকি? প্রশ্নের উত্তর পেল না, নতুন আরেক-টা বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। রেলের চাকার সাথে ধাতব কিছু ঘষা খেলো। সামনের চাকায় আটকানো আছে ডিমোলি-শন চার্জ। দেখে ফেললো নাকি!

'ওয়াগনের তলা দিয়ে ওপারে চলে যাও, চারদিকে নজর রাখো!' সেই জার্মান অফিসারের গলা। ভাষাটা বোঝে এবং বলতে পারে রাহাত, ব্রিটিশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে ঢুকে তালিম

নেবার সময় সবচেয়ে আগে এটাই শিখতে হয়েছে ওকে।

তারমানে, পনেরো ফিট নিচে একজন নয়, দু'জন জার্মান দাঁড়িয়ে আছে। আবার শোনা গেল কর্কশ গলাটা, 'পালাতে চাইলে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে ছুটবে সে। ট্রেনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লোক দাঁড় করাচ্ছি আমি...' ছ্যাঁৎ করে উঠলো রাহাতের বুকের ভেতরটা। তারমানে, রেলইয়ার্ডের ভেতর কেউ আছে, জানে ওরা।

হ্যাটের কার্ণিশ থেকে সড় সড় করে নেমে এসে চোখের পাতায় থামলো কিছুটা তুষার। বার কয়েক চোখ পিট পিট করলো রাহাত। ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি, পাতা থেকে সরাতে পারলো না তুষার। ভয় হলো, পাপড়িতে আটকে যাওয়া তুষার চোখের পাতাটাকে বরফ করে ফেলবে। ওদিকে কান খাড়া হয়ে আছে, ট্যাংকারের তলা দিয়ে লোকটা ওপারে যাচ্ছে কিনা বুঝতে চায়।

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করছে রাহাত। ক্রল করে ট্যাংকারের তলা দিয়ে যাবার সময় সৈনিকটার চোখে চার্জটা না পড়েই পারে না। এক চোখ তুলে সিগন্যাল বক্সের জানালায় তাকালো ও। একটা খোলা জানালায় দু'জন লোককে দেখা গেল, কম পাওয়ারের নীল আলোর নিচে জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সিগন্যালম্যানের কাছ থেকে বোধ-হয় রিপোর্ট নিচ্ছে হপার।

আরও কয়েকবার চোখ পিট পিট করতেই ঝাপসা ভাবটা কেটে গেল, পাপড়ি থেকে ঝরে পড়লো তুষার। নিচ থেকে বরফ

ভাঙার মুট মুট শব্দ ভেসে এল আবার। ট্রেন বরাবর লোক দাঁড় করাবার জন্যে চলে গেল অফিসার। মনটা আরও দমে গেল রাহাতের। রেলইয়ার্ডে ঢোকার সময় কাঁটাতারের বেড়া কাটতে হয়েছে ওকে, সেই ফাঁকটা গলে বেরিয়ে যেতে পারলে সময় অনেক কম লাগবে। কিন্তু এখান থেকে ফাঁকটার দূরত্ব একশো গজ, ট্রে-নের দু'পাশে পাহারা থাকলে এই দূরত্ব কোনোমতেই পেরোনো সম্ভব নয়। পকেটে অয়্যার-কাটার আছে বটে, কিন্তু কাঁটাতারের দিকে যেতে সংক্ষিপ্ত পথটা বেছে নিলে, তাতেও পঁচিশ গজের মতো পেরোতে হবে, তারপর বেরুবার জন্যে নতুন করে কাটতে হবে বেড়া। অতো সময় পাবে না ও, তার আগেই গুলি খাবে। নিচ থেকে তাজা কিছু শব্দ ভেসে এল। ট্যাংকারের তলা দিয়ে ক্রল করে ওপারে যাচ্ছে সৈনিকটা। চুপিসারে, নিঃশব্দে কাজ সারতে পারে না লোকটা, ভাবলো রাহাত। কে জানে, হয়তো এক নম্বরের বুদ্ধু! কিন্তু চার্জটা দেখতে না পাবার মতো বোকা নিশ্চয়ই নয়...

নিচ থেকে ঘষা লাগার আরও আওয়াজ পেল রাহাত। তাড়াহুড়ো করছে লোকটা, নিশ্চয়ই ভীতুর ডিম, ট্রেনের তলা দিয়ে যেতে ভয় করছে—হঠাৎ যদি ঘুরতে শুরু করে চাকা! সার্চ করা হচ্ছে, কাজেই ট্রেন চলতে শুরু করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রাহাত, ট্রেনের তলায় ঢোকার সময় এই অকারণ ভয় অনেককেই কাবু করে ফেলে।

আবার নড়াচড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। নিঃসাড় শুয়ে থেকে নিচের আওয়াজটা হঠাৎ বন্ধ হবার অপেক্ষায়

কান পেতে থাকলো রাহাত, তাহলেই বোঝা যাবে চার্জটা চোখে পড়ে গেছে। আওয়াজ বন্ধ হবার পরও আবার কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হবে ওকে, বিস্ময় আর উত্তেজনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠে চিৎকার করে তার আবিষ্কারের কথা জানাতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নেবে লোকটা। খসখসে আওয়াজটা হঠাৎ করেই থেমে গেল, সেই সাথে টান পড়লো রাহাতের পেশীতে, নিজের অজান্তেই বুকের ভেতর আটকে গেল দম। কিন্তু কোনো চিৎকার হলো না। হ্যা-হ্যা-হ্যাঁ-চ্চো! প্রচণ্ড এক হাঁচি দিল লোকটা। শব্দ শুনে বোঝা গেল, ট্রেনের তলা থেকে বেরিয়ে আরেক দিকে চলে এসেছে সে। ওখান থেকে সিগন্যাল বক্সটা একেবারে কাছে। ট্যাংকারের এপারে চলে এসে লোকটা এখন কাঁটাতারের বেড়া আর রাহাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো রাহাত। পাঁচ মিনিট বাকি।

শীতকাতর অন্ধকারে আবার জমাট বাঁধলো ভৌতিক নিস্তব্ধতা। কুকুরগুলোকে লাইনের আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বরফের ওপর থেমে গেছে হাঁটাহাঁটি। বাতাসও কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে বোঝা যায়, মঞ্চ সাজাবার কাজ শেষ। জার্মান সৈন্যরা পজিশনে দাঁড়িয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু রাহাতের দিশেহারা হয়ে ওঠা। উদভ্রান্তের মতো লোহার মই বেয়ে নিচে নামতে যাবে ও, সেই সাথে জার্মান সৈন্যদের বুলেট ঝাঁঝরা করে দেবে ওকে, শেষ হয়ে যাবে এত দিন ধরে এত পরিশ্রম করে গড়ে তোলা ক্যারিয়ার। তুষারপাতের আওয়াজ কমে যাওয়ায় পুবদিকের রেলইয়ার্ডে দাঁড়ানো

ইঞ্জিন থেকে ভেসে আসা কয়লা পোড়ার শব্দ পাচ্ছে ও। হঠাৎ একটা চিড় ধরলো জমাট নিস্তব্ধতায়। চোখ তুলতেই সিগন্যাল বক্সের একটা জানালা খুলে যেতে দেখলো রাহাত। কার্নিশে জমে থাকা বরফ আটকে গিয়েছিল জানালার কবাট, কাঁচ ভাঙার মতো আওয়াজ করে ভেঙে গেল সেগুলো। খোলা জানালা দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো হুপার। সরাসরি তাকালো পেট্রল-ওয়াগনের তুষার মোড়া ছাদের দিকে।

দম আটকে নিয়ে হুপারের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাহাত। চোখ ছাড়া আর কিছু নাড়লো না ও। একেই বলে ফাঁদে পড়া, ভাবলো ও। দুর থেকে নজর রাখা হয়েছে, নিচেই রয়েছে টহল-বাহিনী। সিগন্যাল বক্স থেকে হাতঘড়ির ওপর ফিরে এল দৃষ্টি। আর চার মিনিট বাকি, অথচ এখনও বেরুবার কোনো রাস্তা দেখতে পায়নি ও। শত্রুদের দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে সরাবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ চোখে পড়ছে না। নিজের মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে মনে মনে আশ্চর্যই হলো ও। কিসের আশায় আছে সে? নিজেকে জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পেল না। উদ্ভট একটা ঝোঁক চাপলো, পকেটের আধপোড়া চুরুটটা ধরাতে পারলে বেশ হতো। ঠোঁট প্রসারিত করে নিঃশব্দে হাসলো ও। উপলব্ধি করলো, ওর মধ্যে দুটো সত্তা আছে, একটা কখনই সিরিয়াস হতে পারে না। সেই মহাশয়ই ওর দ্বিতীয় সত্তার সাথে রসিকতা করছে। সম্ভবত তার প্ররোচনাতেই উপস্থিত বিপদের কথা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ভুলে গেল রাহাত। মনে পড়ে গেল

নিকট অতীতের কথা।

ব্রিটিশ ভারতের তরুণ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অফিসার মেজর রাহাতের ক্যারিয়ার খতম হতে চলেছে। কাছেপিঠে এমন কেউ নেই যে ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে পড়বে। তবে, মিত্রপক্ষ যদি শেষমেষ জেতে এবং ওয়র-রেকর্ড যদি সযত্নে রেখে দেয়া হয় তাহলে কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকবে, মেজর রাহাত গোটা বলকান এলাকার ওপর দিয়ে একটা প্যাসেজ তৈরি করে ছুটে এসেছিল, যে-প্যাসেজের দু'দিকে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ স্ট্র্যাটেজিক ওয়র মেটেরিয়াল ধ্বংস করেছে সে, এবং একই সাথে জার্মান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অ্যাবওয়েরের জন্যে রেখে এসেছে পিছু ধাওয়া করার সূত্র। মাঝে-মধ্যে মাত্র দু'এক পা পিছনে ছিল অ্যাবওয়ের, কিন্তু একবারও নাগালের মধ্যে পায়নি তাকে।

বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সুযোগ কতটা কি আছে হিসেব কষতে শুরু করলো রাহাত।

ভাগ্য সহায়তা করলে কোট পকেটের ল্যুগারটা ওয়াগনের নিচে দাঁড়ানো লোকটাকে অকেজো করে দিতে পারবে। কিন্তু সিগন্যাল বক্সে রয়েছে হপার, যার চোখে নিচের সামান্যতম নড়াচড়াও ধরা পড়বে। চোখ তুলে আবার জানালার দিকে তাকালো রাহাত, সিগন্যালম্যানের সাথে কথা বলার জন্যে জানালার দিকে পিছন ফিরেছে হপার। এবার আসা যাক কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে। ওটা বেয়ে মাথায় চড়বে, তারপর ওদিকে নামবে, তা সম্ভব নয়। ওয়াগন থেকে নামার সময় কারও চোখে যদি

ধরা নাও পড়ে, বেড়ার দিকে এগোবার সময় ধরা না পড়ে উপায় নেই। সৈনিকদের ওপর নির্দেশই আছে, বেড়ার ওপর নজর রাখো। ট্রেন বরাবর দাঁড়িয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে তারা।

ঝড়ের গতিতে সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করছে রাহাতের মাথা, কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সেকেণ্ডের কাঁটা। তিন মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড বাকি আছে। কোনো উপায়ই নেই ওর, কাজেই হিসেব কষে লাভ নেই। গাড়ি স্টার্ট নেবার আওয়াজটা এতোই নাড়া দিল ওকে, যে আরেকটু হলে তাল হারিয়ে ফেলতো। কাছেপিঠে যে একটা গাড়ি আছে, তাই জানতো না ও। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলে উঠলো। দেখা গেল সিগন্যাল বক্সের কাছাকাছি, বেড়ার দূর প্রান্তে পার্ক করা রয়েছে গাড়িটা। একটা মার্সিডিজ। ইঞ্জিন চালু করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, এই স্টার্ট নিতে ব্যর্থ হবার আওয়াজ রাহাতের কানে যেন মধু বর্ষণ করতে শুরু করলো।

ইঞ্জিনের কুঁই-উঁই-উঁই আওয়াজকে ছাপিয়ে নিচে থেকে ভেসে এল একজন সৈনিকের পা ঠোকার শব্দ। রক্ত চলাচল বাড়াবার কসরৎ করছে লোকটা। তারপর আবার শোনা গেল হ্যা-হ্যা-হ্যাঁচ্চো। তারপর ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ার শব্দ। জমাট বরফের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে ওয়াগনের পাশ থেকে খানিকটা সরে গেল লোকটা, আওয়াজটা অনুসরণ করে আন্দাজ করলো রাহাত, পাশের খালি লাইনের দিকে এগোচ্ছে সে। তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, নিজে থেকেই পাহারা দেবার এলাকা বাড়িয়ে

নিচ্ছে। ধীরে ধীরে আরও দূরে সরে গেল লোকটা, ওদিকে সিগন্যাল বক্সের জানালার সামনে থেকে হুপারের পিঠ সরে গেল একপাশে। মনে মনে প্রার্থনা করলো রাহাত, ইঞ্জিন বাবাজী স্টার্ট নাও! অচল মার্সিডিজ কোনো কাজেই আসবে না।

অস্থির হয়ে উঠলো রাহাত। ইঞ্জিন খক্ খক্ করে উঠলে প্রতিবার আশা করছে ও, এবার আর বন্ধ হবে না। কিন্তু বার কয়েক কেশে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে মটর। ড্রাইভারও নাছোড়-বান্দা, হাল ছাড়তে রাজি নয়। আবার খক্ খক্ করে উঠলো ইঞ্জিন, বেশ উৎসাহের সাথে আওয়াজ বের করলো, কিন্তু তার-পরই থেমে গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রাহাত, ভেবেছিল ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। নিরাশ হতেই ঢিল পড়লো পেশীতে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সিগন্যাল বক্সের দিকে চোখ তুললো। জানালার সামনে নেই কেউ। নিচে, ল্যাম্পের কাছাকাছি কি যেন নড়ে উঠতেই নেমে এল দৃষ্টি। পাশের লাইনের ওপর দিয়ে অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে এক-জন সৈনিক। আবার চেষ্টা করলো ড্রাইভার, কিন্তু এবারও ফলস্ স্টার্ট। হঠাৎ বুঝতে পারলো রাহাত, হাঁচিতে পাওয়া লোকটাকে কৌতূহলী করে তুলেছে মার্সিডিজ। সোজা বেড়ার দিকে এগোচ্ছে সে। আবার খক খক করে উঠলো ইঞ্জিন। স্টার্ট নিল। দশ মিনিটের মধ্যে এই প্রথম নড়লো রাহাত, কোটের পকেটে হাত ভরে বের করে আনলো ল্যুগারটা।

তাক করলো রাহাত। একটা গুলি করলো।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছিল মার্সিডিজ, পিছনের কাঁচে

ল্যুগার তাক করেছিল ও। যেদিকে ড্রাইভার বসে আছে সেদিকে নয়, আরেক পাশে—গাড়িটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্যে ড্রাইভারকে অবশ্যই দরকার। অক্ষত থাকবে লোকটা, কিন্তু আতংকিত হয়ে উঠতে হবে তাকে, তা না হলে ভেস্তে যাবে ওর প্ল্যান। পিছনের কাঁচে হাজারটা চিড় ধরলো, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হলো গুলির। পরমুহূর্তে রেলইয়ার্ড থেকে জার্মান ভাষায় গর্জে উঠলো একটা উচ্চ কণ্ঠ, 'গাড়িতে, গাড়িতে আছে! বেড়ার ওদিকে! খবরদার, পালাতে দিয়ো না!'

একে অন্ধকার, তার ওপর তুষার ঝরছে, কথাটা যে কোন্দিক থেকে কে বললো বোঝা মুশকিল। রাহাতের গলার আওয়াজটা ভারি, নিস্তব্ধ রাতে অনেক দূর পর্যন্ত গমগম করে উঠলো। সৈনিকদের একজন গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। চলন্ত মার্সিডিজের পিছনটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠলো মেশিন-পিস্তলের গুলি লেগে। তারপরই শোনা গেল রাইফেলের একক গর্জন। ট্রেনের আশপাশ থেকে পড়িমরি করে ছুটলো সৈনিকরা। তাদের একজন হঠাৎ কাঁটাতারের বেড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে গুঙিয়ে উঠলো, তারপর ভোঁতা, হেঁড়ে গলায় সাবধান করে দিল সবাইকে। দ্রুত পিছিয়ে এসে সিগন্যাল বক্সের একটা পায়ার আড়ালে গা ঢাকা দিল সে, তাড়াতাড়ি গ্রেনেড ছুঁড়লো একটা, তারপর আরেকটা। বিস্ফোরণের সাথে এক ঝলক করে চোখ ধাঁধানো আলো দেখা গেল। বেড়ার গায়ে সদ্য তৈরি ফাঁক গলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। হুড পরানো ল্যাম্পের নিচে দিয়ে আরও লোক ছুটছে সেদিকে। ইতিমধ্যে যারা বেড়ার ও-

পারে পৌঁছে গেছে তারা এলোপাতাড়ি গুলি করছে মার্সিডিজকে লক্ষ্য করে। ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতো ছুটছে গাড়িটা। চোখ তুলে দেখলো রাহাত, তীক্ষ্ণ একটা বাঁকে অর্ধেক অদৃশ্য হয়ে গেছে মার্সিডিজ।

মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করলো না রাহাত। তরতর করে নেমে এল ও। কয়েকটা ধাপ বাকি থাকতে লাফ দিয়ে পড়লো বরফের ওপর। পতনের ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে ওঠার আগেই পায়ের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো। ডানে বাঁয়ে দ্রুত তাকালো একবার। স্যাৎ করে পিছিয়ে এসে ঢুকে পড়লো দুই চাকার মাঝখানে, ট্রেনের তলায়। পিছু হটে ট্রেনের আরেক দিকে বেরিয়ে এল ও। হাতে উদ্যত ল্যুগার, চোখ দু'টো স্থির হয়ে আছে সিগন্যাল বক্সের জানালায়—ওটাই এখন বিপদের সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে।

খোলা জানালার সামনে পজিশন নিয়েছে হপার। হাতে রাইফেল, ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। রেলইয়ার্ড থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে সৈনিকরা, কিন্তু এই গড্ডলিকা প্রবাহ তাকে সম্মোহিত করতে পারেনি। ট্রেনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে। গোলমালের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে এমন লোক সবখানেই এক-আধজন পাওয়া যায়, ভাবলো রাহাত। জানালা থেকে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়লো হপার। রাইফেলটা তুললো অলস ভঙ্গিতে, শেষ পেট্রল ওয়াগনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি, তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলো সে। ঝট করে ল্যুগার ধরা হাতটা মাথার ওপর তুললো রাহাত। মনে

পড়লো, মই থেকে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামার সময় বরফের গায়ে গেঁথে গিয়েছিল ল্যুগারের মাজল। গুলি বেরুলে হয়! হাতটা মাথার ওপর তুলে সাথে সাথে গুলি করলো না, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করলো প্রথমে। তারপর টেনে দিল ট্রিগার। বেড়ার ওপারে মুহুর্মুহু গর্জে চলেছে রাইফেল আর মেশিন-পিস্তল, ল্যুগারের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল হপার, পরমুহূর্তে জানালার নিচের চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। হাত থেকে খসে গিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নেমে এল রাইফেলটা। জানালা থেকে ঝুলে পড়লো লোকটা, মাথাটা নিচের দিকে। বাতাসের সাথে দোল খেতে খেতে নেমে এল হ্যাট।

হপারকে ঝাঁকি খেতে দেখেই বেড়া লক্ষ্য করে ছুটলো রাহাত। কিন্তু পা দুটো প্রতিবাদ জানালো, একই ভঙ্গিতে অনেক-ক্ষণ পড়ে ছিল বলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী। পা টেনে টেনে এমন বিদঘুটে ঢংগে দৌড়াচ্ছে, পিছন থেকে দেখতে পেলে নিজে-রই হাসি পেত ওর। চোখ তুলে তাকালো একবার সিগন্যাল বক্সের জানালায়, প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছে এই বুঝি সিগন্যাল-ম্যান হৈ-চৈ বাধালো। কিন্তু জানালায় নেই কেউ—সম্ভবতঃ মেঝেতে শুয়ে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করছে সে।

বেড়ার মস্ত ফাঁকটা দেখতে পেয়ে গতি মন্থর করলো রাহাত। ফাঁকের দু'পাশে প্যাঁচ খেয়ে গুটিয়ে গেছে কাঁটাতার, গা বাঁচিয়ে রেলইয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে এল ও। মার্সিডিজের পিছু পিছু সৈনিকরা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকালো একবার, অন্ধকারে

কিছুই চোখে পড়লো না। ঘুরে উল্টোদিকে ছুটলো ও।

পিছন থেকে ভেসে এল কুকুরের ঘেউঘেউ। টহল বাহিনীর অপর দল ট্রেনের সামনের দিকটা চেক করার জন্যে এগিয়ে গেছে। খুব জোরে নয়, কিন্তু সমান গতিতে ছুটছে রাহাত। অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে, দু'পাশে মাথা সমান উঁচু কাঠের স্লিপার দেখতে পাচ্ছে ও। ল্যুগার ধরা হাতটা শরীরের কাছ থেকে বেশ খানিকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে, যাতে জরুরী প্রয়োজনের সময় দ্রুত লক্ষ্যস্থির করতে পারে।

রেলইয়ার্ডের এদিকে কোনো ইঞ্জিন, ওয়াগন বা তেলের ড্রাম নেই, কাজেই মানুষজনও নেই। এলাকাটা ছাড়িয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছুলো রাহাত। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো ও। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর রঙের ফোক্সওয়াগেন।

এবার নিজের গাড়ি স্টার্ট দেবার পালা। সাত বারের বার চালু হলো ইঞ্জিন। গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিন-বনেটের ওপর ফেলে রাখা জার্মান আর্মির কম্বলটা গুটিয়ে নিল ও। রেলইয়ার্ডে ঢোকার আগে এই কাজটা করেছিল বলেই এত তাড়াতাড়ি স্টার্ট নিল গাড়ি। গুটানো কম্বলটা প্যাসেঞ্জার সীটে ফেলে রাখলো ও। মাঠের ওপর তুষার জমে আছে, ছোটালেও ছুটতে চায় না গাড়ি। বার কয়েক নরম তুষারে ডেবে গেল চাকা, কিন্তু গাড়ি থেকে নামতে হলো না রাহাতকে। রাস্তায় উঠে এল ফোক্সওয়াগেন। এখানে তুষার জমে শক্ত হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা পিছলে যেতে চাইলো। বিপদের ঝুঁকি আছে, তবু স্পীড

বাড়িয়েই চললো রাহাত। ভঙ্গুর বরফ চাকার আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো রাস্তার দু'পাশে।

জার্মান ভাষায় অভিশাপ দিল রাহাত। ওর জার্মান কাভা-রের স্বার্থে ভাষাটা শুধু রপ্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি ও, এই ভাষায় চিন্তা করতে শিখেছে, এই ভাষায় স্বপ্ন দেখতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জিরো আওয়ার পেরিয়ে গেছে, ত্রিশ সেকেণ্ড আগেই বিস্ফোরণ ঘটা উচিত ছিল। সবগুলো টাইম ফিউজে ত্রুটি আছে এ হতে পারে না! তাহলে? ফাটছে না কেন? তবে কি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এত কিছু করা, সব বৃথা গেল?

গাড়ির স্পীড আরওবাড়িয়ে চললো রাহাত। টান টান হয়ে আছে পেশি, আশা যে-কোনো মুহূর্তে শুনতে পাবে বিস্ফোরণের আওয়াজ। হেডলাইটের দুর্বল আলোয় শুধু তুষার মোড়া রাস্তার কিছুটা দেখা যাচ্ছে, সামনে এবং রাস্তার দু'পাশে ঘন অন্ধকার। সামনে কি আছে জানে না রাহাত, কিন্তু দু'পাশে আছে ফাঁকা মাঠ। রেলইয়ার্ডটাকে নখদর্পণে নিয়ে আসার জন্যে এই রাস্তা ধরে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে ওকে। রাতের এই সময়ে জার্মান সৈন্যবাহিনীর কোনো দল এদিকে আসবে বলে মনে হয় না, এলেও ওকে দাঁড় করিয়ে কিছু বলবে বলে মনে হয় না। রুমানিয়ার দখল নেয়া হয়ে গেছে, এখানে কেউ তাদেরকে বাধা দেবার সাহস বা সাধ্য রাখে, এ-কথা ভাবতেও পারে না জার্মানী।

সামনে থেকে অস্পষ্ট একটা বেড়া ছুটে এল রাহাতের দিকে। একটা পরিত্যক্ত খামারের শেষ সীমানা। গতি কমিয়ে

বাঁক নিচ্ছে ও। এই সময় পিছলে যেতে শুরু করলো গাড়ির চাকা। নিজের অজান্তেই, সাথে সাথে রিয়্যাক্ট করলো রাহাত। জোর না খাটিয়ে স্টিয়ারিঙটাকে বরং গাইড করতে শুরু করলো ও। যেদিকে ঘুরতে চায় সেদিকেই গাড়িটাকে ঘুরতে সাহায্য করলো। তুষার ঢাকা প্রান্তরের ওপর বিশাল একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঘুরে এল হেডলাইটের আলো। গাড়িটা এখনও রাস্তার ওপর রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো ও। আধ পাক ঘোরা শেষ হতেই ব্রেক করার সুযোগ পেল। একশো আশি ডিগ্রী ঘুরে গেছে ফোক্সওয়াগেন, তার মানে যেদিক থেকে আসছিল ও এখন সেদিকেই মুখ করে আছে গাড়ি।

প্রথম আওয়াজটা ভোঁতা শোনালো। যেন ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল গান গর্জে উঠলো। পরপর আরও কয়েকটা বুম বুম শব্দ হলো। কেঁপে উঠলো ফোক্সওয়াগেন, কিন্তু তেমন ঝাঁকি লাগলো না। ধু-ধু প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠলো, কিন্তু দু'তিন সেকেণ্ড পর আবার সব ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে।

তারপরই এল পেট্রল ট্যাংকার বিস্ফোরিত হবার আওয়াজ। এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলো গাড়ি, যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল রাহাতের। একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকলো ওয়াগনগুলো। সাবোটাজ মিশন নিয়ে বেরুবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই রকম দৃশ্য আর দেখেনি সে কোনদিন। ঘন অন্ধকার এক নিমেষে দুর হয়ে গেল, দিগন্তরেখা পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কমলা রঙের উজ্জ্বল আলোয়। ওর পুব দিকে বুখারেস্ট, আকাশ ছোঁয়া বিল্ডি-

ঙের মাথায় তুষার জমেছে, তার ওপর আগুনের রঙ লেগে ঝকমক করে উঠলো ছাদ, কার্ণিশ আর দেয়াল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছে রাহাত, এই সময় ধোঁয়া দেখতে পেল ও। উজ্জ্বল কমলা রঙের আকাশটাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করলো কালো ধোঁয়ার বিশাল চাদর। যেন ভাঁজ খুলতে খুলতে শহরের দিকে ছুটলো সেই কালো চাদর।

ড্রাইভিং সীটে সিধে হয়ে বসলো রাহাত। ছেড়ে দিল গাড়ি। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো স্পীড। দ্রুত কাছে চলে আসছে বুখারেস্ট শহর।

দুই

উনিশশো বিরাশি। রানা ইনভেস্টিগেশনের লণ্ডন শাখা।

নিজের কামরায় একা বসে কাজ করছে মাসুদ রানা। আজ তিন দিন হলো লণ্ডনে এসেছে ও, রোজ আট ঘণ্টা করে ফাইল ওয়র্ক করছে। অনেক কেস অমীমাংসিত পড়ে আছে, অনেক হিসেব মিলছে না, একগাদা বিলে ওর সই পড়েনি। তিন মাসের মধ্যে এদিকে হয়তো আর আসা হবে না, তাই জমে থাকা কাজ শেষ করে যেতে চাইছে ও। প্রায় হয়ে এসেছে, এটাই শেষ ফাইল। কেস হিস্ট্রি পড়ে নোট লিখতে হচ্ছে সহকারীদের জন্যে, তাতেই যা সময় লাগছে। নোটগুলো পড়তে পড়তে বিস্ময়ে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ওদের মুখ, জানে রানা। এসব কেসের মীমাংসা সম্ভব নয়, সহকারীরা একবাক্যে জানিয়ে দিয়েছিল ওকে। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখলো ও, প্রায় সবগুলোরই এদিক ওদিক এক-আধটা লেজ আছে। সেই লেজ চেপে কষে মোচড় দিলেই চলতে শুরু করবে গাড়ি এবং সম্ভবত পৌঁছে দেবে

গন্তব্যস্থলে। সহকারীদের দোষ নেই—এই ধরনের কেসের সাথে ওদের আগে কখনও পরিচয় ঘটেনি বলে সমাধানের পথটা খুঁজে পায়নি। আসলে যাদেরকে লণ্ডন শাখায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে ও, তারা কেউ কারও চেয়ে কম উপযুক্ত নয়। সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তা না হলে সমাধান বের করা সম্ভব হয় না। সব কেস সব ছকের মধ্যে পড়ে না। মনে মনে একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করলো রানা। এ লাইনে মাথাটা ওর খেলে ভালোই। এবার ওদেরকে গোটা কয়েক নতুন ছকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ও।

আবার ঘড়ি দেখলো ও। পৌনে তিনটে। অক্সফোর্ডে এক বন্ধু থাকে, কথা দিয়েছে তাকে নিয়ে আজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে যাবে। চারটের মধ্যে রওনা না হলেই নয়। কলমের গতি হঠাৎ করে বেড়ে গেল।

সাড়ে তিনটের সময় ফাইল আর কলম বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিল রানা, আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুললো। কাজ শেষ, বাকি তুটো দিন ঘুরেফিরে বেড়ানো যাবে। বিশেষ কাজে লণ্ডনে আসার কথা ছিল সোহানার, কই, সে তো আর এল না! মনের কোণে কিসের যেন অভাব বোধ করলো ও। আশা করলো, ভাগ্য ভাল হলে আজ অথবা কাল পৌঁছে যেতে পারে সোহানা। একটা দিনও যদি তু'জন একসাথে কাটাতে পারে, মন্দ কি।

বাইরের কামরা থেকে খটাখট আওয়াজ ভেসে আসছে। ওর লেখা নোটগুলো টাইপ করছে শাহানা। আর সবাই খেতে

গিয়ে ফিরে আসেনি এখনও। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো রানা। দরজার দিকে এগোবে, হঠাৎ খেয়াল হলো, টাইপের খট খট বন্ধ হয়ে গেছে, সোহানার নিচু গলা ভেসে আসছে বাইরের কামরা থেকে।

আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো রানা। ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে মাথার পিছনে হাত রেখে হেলান দিল চেয়ারের পিঠে। চোখ দুটো বুঁজে ফেললো।

'শালার কাণ্ড দেখেছো! কতবার শিখিয়েছি, দিবানিদ্রা আয়ুক্ষয়!'

সোহানা নয়, সোহেলের গলা পেয়ে ধড়মড় করে চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলো রানা। 'তুই? কিন্তু আমি যেন শুনলাম সোহানা...'

দোর-গোড়ায় সোহানাকে দেখা গেল। 'কেমন আছো, রানা?' দু'পা এগিয়ে হাত-কাটা সোহেলের পাশে এসে দাঁড়ালো ও।

'ভাল,' বললো রানা। 'বসো তোমরা। সোজা এয়ারপোর্ট থেকে আসছো বুঝি?'

'আরে না!' একটা চেয়ার টেনে বসলো সোহানা। 'লণ্ডনে এসেছি আজ দু'দিন। কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার সাথে দেখা করা হয়ে ওঠেনি।'

হাতের ব্রীফকেস ডেস্কের ওপর রেখে সেটার পাশেই উঠে বসলো সোহেল। 'দে, একটা সিগারেট দে। হ্যাঁ-রে, এই তোর শাহানা?' কড়া মাল বা এই ধরনের আরও টক-ঝাল-মিষ্টি

মেশানো কিছু মন্তব্য করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো তার, মেয়েদের সামনে সব কথা বলা যায় না। চট করে সোহানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার রানার দিকে তাকালো সে, বললো, 'ভাল, ভাল!' সবজান্তার হাসিটা চেহারা থেকে মুছে জোর তাগাদা দিল, 'কই, সিগারেট বের কর! কফি-টফি আনা! তোর এই পচা অফিসে আমি যে দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে এলাম…'

সোহেল থামার আগেই সোহানাকে প্রশ্ন করলো রানা, 'এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে?'

'এই অ্যাসাইনমেন্টে সোহেল আমাকে অ্যাসিস্ট করছে,' বললো সোহানা।

'শাহানা, একটু এদিকে আসবেন, প্লিজ?' গলা চড়িয়ে ডাকলো সোহেল।

দোর-গোড়ায় দেখা গেল শাহানাকে। বয়স উনিশ-বিশ, ইংরেজ মেয়েদের মতোই লম্বা, ধূসর রঙের চোখের মণি, গায়ের রঙ ইউরোপিয়ানদের মতো। ওর মা বাঙালী, কিন্তু বাবা ইংরেজ।

'সেই বারোটায় লাঞ্চ করেছি,' আবেদনের সুরে রানাকে বললো সোহেল। 'ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। কিছু আনা, প্লিজ।'

'কি খেতে চাস বল্, শাহানাই সব ব্যবস্থা করতে পারবে,' রানার চেহারায় শান্ত ভালমানুষের ছাপ ফুটে উঠলো।

নড়েচড়ে বসলো সোহেল। তাকালো সোহানার দিকে 'তোমার কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারো।'

'আমি কফি ছাড়া আর কিছু খাবো না,' বললো সোহানা।

‘চিংড়ি মাছের কাটলেট, আলুপুরি, খাসীর মাংসের কিমা ভরা সিঙাড়া আর কফি…’

‘এসব এখানে পাবে কোথায় ?’ অবাক দেখালো রানাকে।

উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল সোহেলের মুখে। ‘বলে দিচ্ছি কোথায় পাওয়া যাবে। তোর অফিসের পেছনের গলিতে সোনা মিয়ার সিলেট ইন আছে, টেলিফোনে ঠিকানা জানিয়ে দিলে দশ মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে সব।’

‘আচ্ছা!’ বললো রানা। ‘টেলিফোন করার দরকার কি, পিয়নটা তো করিডোরে বসে মাছি মারছে, ওকেই পাঠিয়ে দাও, শাহানা।’ সোহেলের দিকে ফিরলো ও। ‘সোহানাকে বাদ দিয়ে আমরা তিনজন খাবো, তাই না ? সব মিলিয়ে দুই পাউণ্ডের বেশি লাগবে না। দিয়ে দে!’

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সোহেল।

নিচু গলায় বললো রানা, ‘শাহানা নতুন, ওর সামনে অপমান হবি, সেটা কি ভাল দেখাবে ? এমন কিছু করিস না যাতে প্রথমদিনই তোর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যায় ওর!’

চাপা গলায় বললো সোহেল, ‘তোর অফিসে এসে আমি কেন খরচ করবো ?’

সোহানার দিকে তাকালো রানা। চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললো, ‘তোমাকে কিন্তু আজ খুব সুন্দর লাগছে।’

‘আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস ?’ দাঁতে দাঁত চেপে বললো সোহেল। ‘ওকে বিদায় কর! আমি কিছু খাবো না!’

সোহেলের দিকে ফিরলো রানা। ‘কিরে, সোহেল, বিড়বিড়

করে কি বলছিস ? শাহানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, টাকাটা দিয়ে দে ওকে।' বলে আবার সোহানার দিকে তাকালো ও। 'ঢাকায় ফিরছো কবে ?'

'শালা, আমিও সুযোগ পেলে দেখে নেবো !' পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করে বললো সোহেল। 'ফাঁদে ফেলে খসিয়ে নিচ্ছিস...' শাহানা এগিয়ে এসে ওর বাড়ানো হাত থেকে দুই পাউণ্ডের দুটো নোট নিয়ে চলে গেল কামরা থেকে।

পরমুহূর্তে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলো রানা আর সোহানা।

'কাজটা কিন্তু ভাল করলি না, দোস্ত !' গম্ভীর স্বরে বললো সোহেল।

'টাকা তুমি না দিলেও তো পারতে,' বললো সোহানা। 'না হয় মেয়েটা তোমাকে হাড়-কিপটে ভাবতো, কি এমন ক্ষতি হতো তাতে ?'

'ছি, ছি, এ তুমি কি বলছো, সোহানা !' মাথা নেড়ে বললো রানা। 'আফটার অল সুন্দরী একটা মেয়ে, তার সামনে আমাদের সোহেল সাহেব কিভাবে অপমান হতে পারেন ? তার একটা প্রেস্টিজ আছে না ? টাকা গেছে টাকা আসবে, কিন্তু প্রেস্টিজ গেলে সে কি আর ফিরে পাবার জিনিস ? আমি তো মনে করি, সোহেল খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ভেবে দেখো না, এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো না ? কারও অফিসে গিয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকেই অ্যাপায়িত করা, ব্যাপারটা সহজে ভুলবে না শাহানা। এটা কি কম লাভ ? কারও মনে দাগ কাটতে পারা ?'

'রানা বোধ হয় ঠিকই বলেছে,' গম্ভীর সুরে বললো সোহেল। 'কারও মনে দাগ কাটতে পারায়, সত্যি লাভ আছে। এই যেমন এখন আমি রানার মনে দাগ কাটতে যাচ্ছি।'

সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। 'আমার মনে দাগ কাটতে যাচ্ছিস —মানে?'

প্রত্যাশা এবং কৌতূহল নিয়ে সোহেলের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'কি ব্যাপার, সোহেল?'

মানিব্যাগ থেকে এক পাউণ্ডের আরও একটা নোট বের করে ডেস্কের ওপর রাখলো সোহেল। 'রেখে দে এটা। আবার যখন সোনা মিয়ার সিলেট ইনের সিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করবে, আনিয়ে নিস। কি,' চোখে সরল প্রশ্ন নিয়ে তাকালো সোহেল, 'আমার এই বদান্যতা তোর মনে দাগ কাটছে না?'

'সত্যি তুই টাকাটা আমাকে সিঙাড়া খেতে দিচ্ছিস?' বিশ্বাস হতে চায় না রানার।

'কি আশ্চর্য দেখো দেখি,' চেহারায় অভিযোগের ভাব নিয়ে সোহানার দিকে তাকালো সোহেল। 'নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে দিচ্ছি, তবু ন্যাকার মতো জিজ্ঞেস করে!' রানার দিকে তাকালো। 'নে, তুলে পকেটে ভর।' এরপর ঝুঁকে পড়লো সোহানার দিকে। 'দেনা যত তাড়াতাড়ি শোধ দেয়া যায় ততোই ভাল, কি বলো?'

'দেনা?' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। 'কিসের দেনা? কার দেনা?'

মানিব্যাগটা পকেটে ভরে রাখলো সোহেল। 'গত বছর এই

লণ্ডনেই তোর কাছ থেকে তিন পাউণ্ড ধার নিয়েছিলাম আমি। ধার-দেনা করা আমি পছন্দ করি না, করলেও যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ করে দিতে পারলে বাঁচি। তুই চাইলে দিন দশেক আগে ঢাকায় থাকতেই শোধ করে দিতাম। কিন্তু না চাইতেই কত তাড়াতাড়ি শোধ করে দিলাম দেখ্, মাত্র ন'মাস হয়েছে!'

হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'মনে পড়েছে। কিন্তু নিয়েছিলি তিন পাউণ্ড, এক পাউণ্ড দিচ্ছিস কেন?' মার-মুখো দেখালো ওকে।

'আমি যে তিন পাউণ্ডই দিয়েছি, সোহানা সাক্ষী দেবে,' মুচকি হেসে বললো সোহেল। 'শাহানাও বোধ হয় অস্বীকার করবে না।'

'ওরে শালা...'

রানাকে বাধা দিয়ে বললো সোহেল, 'দেখ্, গালাগালি করবি না! পাওনাদার ভুলে গেলে কবে কোন্ দেনাদার যেচে পড়ে ধার শোধ করতে যায়, বল্? আমি তোর মনে দাগ কাটার জন্যেই...'

'যথেষ্ট হয়েছে, এবার তোমাদের দাগ কাটাকাটির প্রতি-যোগিতা থামাও দেখি,' বললো সোহানা। 'এই, রানা, আজ বিকেলে কোথাও যাচ্ছো নাকি? চলো না, তিনজন কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি?'

'বেড়ানো-টেড়ানো পরে,' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো সোহেল। 'তার আগে লিঙ্ক রোডে যেতে হবে...'

'লিঙ্ক রোডে?' পরমুহূর্তে কি যেন মনে পড়ে যেতে চোখ

ছুটো বড় হয়ে গেল রানার। 'তারমানে, আবার?'

'হ্যাঁ,' বললো সোহেল। 'রিটায়ার্ড জেনারেল ভদ্রলোককে পৌঁছে দেবার জন্যে বুড়ো এবারও আমার হাতে কয়েক বাক্স চুরুট পাঠিয়েছে। লণ্ডনে কেউ এলেই হয়, গত বছরও আমার হাতে চুরুটের কয়েকটা বাক্স গছিয়ে দিয়েছিল। ফিরলে আবার জিজ্ঞেস করতেও ভোলে না, জেনারেল ম্যালোরির সাথে দেখা করেছিলে তো?'

'ওখান থেকে ফিরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে, লিঙ্ক রোড কি এখানে?' বললো সোহানা। 'তারমানে আজকের বিকেলটাই মাটি!'

'তারচেয়ে প্যাকেটটা বের কর,' সোহেলকে পরীক্ষা করার জন্যে বললো রানা। 'দু'জন মিলে ফুঁকে উড়িয়ে দিই।'

'পাগল হলি নাকি?' ধমক দিল সোহেল। তারপর অনুরোধের সুরে বললো, 'না চাইতেই তিন পাউণ্ড পেয়ে গেলি, আমার একটা উপকার কর না, প্লিজ?'

'কি উপকার?'

'এই ঘণ্টাখানেকের জন্যে ধার দে না তোর গাড়িটা,' বললো সোহেল। 'পেট্রল যা লাগে আমি কিনে নেবো…'

'বুড়ো কি তোকে পেট্রলের পয়সাও দিয়ে দিয়েছে?'

'পেট্রলের পয়সা নয়, বাস ভাড়া দিয়েছে,' বললো সোহেল। "এটা অফিশিয়াল কাজ নয় বলেই প্রতিবার চুরুটের প্যাকেট হাতে গছিয়ে দেবার সময় বলে, বাস ভাড়া যা লাগে তুমি দিয়ে দিও, ফিরে এসে মনে করে চেয়ে নিও আমার কাছ থেকে। চাইতে

হয় না, সেক্রেটারীকে দিয়ে ঠিক পৌঁছে দেয়।'

'তাহলে গাড়ি চাইছিস কেন? বাসে চেপে চলে যা।'

'প্লিজ, রানা! বাসে চড়তে একটুও ভাল লাগবে না…

হেসে ফেললো রানা, বললো, 'ঠিক আছে, অক্সফোর্ডে যাবার সময় তোদেরকে আমি লিঙ্ক রোডে নামিয়ে দিয়ে যাবো। আর পেট্রলের বিল সবটা নয়, অর্ধেক দিলেই চলবে। রাজি?'

'অক্সফোর্ডে তোর বুঝি কাজ আছে?' জানতে চাইলো সোহেল।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পেট্রলের পয়সা নিবি কেন?'

সোহানার দিকে ফিরলো রানা। 'বুঝলে, এই এক্ষুণি ঠিক করলাম, আজ আর অক্সফোর্ডে যাবো না। চলো, আমরা বরং অন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'শালা হাড়-কিপটে!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো সোহেল। 'ঠিক আছে, তাই দেবো। চল এবার, ওঠ।'

'সেকি, এসব খাবে কে তাহলে?' হাতে ট্রে নিয়ে কামরায় ঢুকে বললো শাহানা।

'সরি,' বললো রানা। 'আগেই তোমার সাথে এদের পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত ছিল। শাহানা ফেরদৌস…'

অভিজাত এলাকা। বিরাট লন, ফুলের বাগান ইত্যাদি নিয়ে এক একটা সুরম্য অট্টালিকা। মস্ত একটা গ্রিল লাগানো গেটের সামনে গাড়ি থামাতে বললো সোহেল।

'তোরা বাসে করে ফিরে যাস,' বললো রানা। 'আমি কেটে পড়ি।'

'এই না বললি পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে?' জানতে চাইলো সোহেল।

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'তুই গ্যালনের দাম দিয়ে দে, বাকিটা আমি যোগ দেবো।'

'সেটি হচ্ছে না,' মুচকি হেসে বললো সোহেল। 'চাঁদা যদি দিতেই হয়, বাসে করে ফিরবো কেন? নিয়ে এসেছিস, পৌঁছেও দিতে হবে, তা নইলে তুই তুগুণে চার গ্যালনের কথা ভুলে যা।'

'ঠিক আছে, কিন্তু চিটিংবাজি করবি না!' সাবধান করে দিল রানা।

ব্যাকসীট থেকে নেমে পড়লো সোহেল আর সোহানা। 'এই আসবো আর যাবো, খবরদার, পালাবি না কিন্তু!' বলে গেটের দিকে এগোলো সোহেল, তাকে অনুসরণ করলো সোহানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে থাকলো রানা। দেখলো, খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। লনের মাঝখানে খান কয়েক বেতের চেয়ার আর একটা টেবিল পড়ে রয়েছে। গেটের দিকে মুখ করে পায়ের ওপর পা তুলে এক বৃদ্ধ বসে রয়েছেন। ইনিই বোধহয় ব্রায়ান ম্যালোরি, আন্দাজ করলো রানা। ভদ্র-লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যে হলো ওর, মন চাইলো তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মনের এই আকস্মিক বায়না উপলব্ধি করে আশ্চর্যই হলো ও। নিজের অজান্তেই, ভদ্রলোকের কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল ওর চোখে, এখন সেগুলো সচেতনভাবে

লক্ষ্য করতে শুরু করলো ও। বসে আছেন ব্রায়ান ম্যালোরি, কিন্তু তাতেই তাঁকে অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে। পায়ের ওপর তোলা পা-টা নাচাচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যেও একটা ধীর, অলস অথচ ছন্দবদ্ধ তাল আছে। মাথাটা একপাশে কাত করে রেখে-ছেন, ঠোঁটে ধরা চুরুটের ধোঁয়া যাতে চোখের কোণে না লাগে। ভদ্রলোকের কোলে সের পাঁচেক ওজনের মস্ত একটা খোলা বই, বাঁ হাতে ধূমায়িত চা বা কফির কাপ। চেহারার মধ্যে অভিজাত, স্মার্ট একটা ভাব আছে। বয়স আন্দাজ করা কঠিন, কারণ মুখে বলিরেখা ফুটে থাকলেও, চামড়া কোথাও ঝুলে পড়েনি বা ভাঁজ খেয়ে ফুলে ওঠেনি। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে টিয়া পাখির মতো টিকালো নাক। তারপর, চোখ। ত্রিশ গজ দূর থেকে গাড়ির ভেতর বার দু'য়েক তাকিয়েছেন তিনি, মনে হলো ওর অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। 'রক্ষে করো!' বিড়বিড় করে আপনমনে বললো রানা। 'এক বুড়োর ব্যক্তিত্বই হজম হচ্ছে না, নতুন আরেকজনের ঠেলা সামলাবার সাধ্য নেই আমার।'

কিন্তু কথাতেই আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। রানা দেখলো, ব্রীফকেস খুলে চুরুটের প্যাকেট বের করলো সোহেল। জেনারেল ম্যালোরির হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। রানা জানে, ডায়মণ্ড ব্র্যাণ্ডের সেন্টেড চুরুট ওগুলো। কক্সবাজারে তৈরি, কিন্তু বার্মীজ চুরুট নামে বিখ্যাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাকি এই চুরুট খেতেন রাহাত খান। বোধহয় বন্ধু ম্যালো-রিকেও দু'একটা খেতে দিয়েছিলেন, ব্যস, স্বাদটা মুখে লেগে গেল

ম্যালোরির। সুযোগ পেলেই জিজ্ঞেস করে, কি হে, তোমার চুরুটের খবর কি, আর বানায় না ওরা? আপনমনে হেসে ফেললো রানা। আরে, এ যে গল্প বানিয়ে ফেলছে সে!

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ম্যালোরি। সোহানা আর সোহেলের সাথে-এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছেন গেটের দিকে। সোহেলের সাথে কথা বলছেন, কিন্তু মাঝে মধ্যেই চোখ তুলে তাকাচ্ছেন ওর দিকে।

অস্বস্তিবোধ করলো রানা। মনে মনে একটু বিরক্তও হলো। সোহেলের আক্কেলটা কি! বুড়োকে সাথে করে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?

গেটের বাইরে, গাড়ির কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে থামলো তিনজনের দলটা। ওরা সবাই এখন গাড়ির ভেতর তাকিয়ে আছে। সোহেলের ওপর রাগে পিত্তি জ্বলে গেল রানার। কি হয়েছে ওর, এমন হাঁদারামের মতো আচরণ করছে কেন?

'হ্যালো, ইয়ংম্যান,' হঠাৎ সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল ম্যালোরি। 'কিছু যদি মনে না করো, তোমাকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। প্লিজ, একটু নামবে?'

মুখে জোর করা একটু হাসি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো রানা। হ্যাণ্ডশেকের জন্যে বাড়িয়ে দেয়া জেনারেল ম্যালোরির হাতটা ধরলো। পরমুহূর্তে তাজ্জব বনে গেল ও। কাছ থেকে চেহারা দেখে পরিষ্কার ধরা যায়, ষাট পঁয়ষট্টির কম হবে না বয়স, অথচ গায়ে অসুরের শক্তি রাখেন এখনও! ওর হাতটা

ধরে এমন ভাবে ঝাঁকালেন, আরেকটু হলে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল গলা থেকে।

'আমি মাসুদ রানা। কি জানতে চান, বলুন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তুমি কি মেজর জেনারেল রাহাত খানের ছেলে?'

চট্‌ করে সোহেল আর সোহানা পরস্পরের দিকে তাকালো একবার।

মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ বোধ করলো রানা, তারপর মৃদু হেসে বললো, 'জ্বী-না।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো জেনারেল ম্যালোরির। 'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন তিনি। ইঙ্গিতে সোহেল আর সোহানাকে দেখালেন। 'এদের সাথে এসেছো যখন, নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি, তাকে তুমি চেনো, মানে, তার সাথে তোমার পরিচয় আছে?'

'জ্বী,' বললো রানা। 'আছে।'

'তার সাথে আশ্চর্য মিল আছে তোমার···' আরও তীক্ষ্ণ, আরও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠলো জেনারেল ম্যালোরির দৃষ্টি। 'সেই নাক, সেই চোখ! দাঁড়াবার ভঙ্গি, গলার আওয়াজ পর্যন্ত মিলে যায়—এই অদ্ভুত মিলের কথা এর আগে কেউ বলেনি তোমাকে?'

হাসিমুখেই বললো রানা, 'হ্যাঁ, অনেকেই আপনার মতো ভুল করেছে। কিন্তু মিলটা কোথায়, আমি নিজে সেটা ঠিক বুঝতে পারি না।'

'স্ট্রেঞ্জ!' বিড়বিড় করে বললেন ম্যালোরি। তারপর খানিক

ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, 'তোমার সাথে রাহাতের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক···তাও নেই?'

'জ্বী-না,' বললো রানা।

'তোমাদের সম্পর্কটা···?'

জেনারেল প্রশ্ন শেষ করার আগেই বললো রানা, 'গুরু-শিষ্যের।'

'বুঝেছি,' ক্ষীণ, কিন্তু উজ্জ্বল একটু হাসি ফুটে উঠেই ম্যালো-রির মুখ থেকে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। 'আর বলতে হবে না। তা, ইয়ংম্যান, তোমার নামটা কি যেন বললে?'

'মাসুদ রানা।'

'ব্রায়ান ম্যালোরি,' রানার কাঁধে একটা ভারি হাত রাখলেন বৃদ্ধ। 'এসো না, আমার সাথে এক কাপ কফি খাবে? রাহাত আমার বন্ধু, তোমরা তার শিষ্য—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার এই সুযোগ আর হয়তো পাবো না।'

'জ্বী?' ম্যালোরির কথা বুঝতে পারলো না রানা।

'রাহাতই ছিল আমার আদর্শপুরুষ। তার সান্নিধ্য পাবার লোভ এই শেষ জীবনেও ছাড়তে পারিনি আমি। তোমাদের সাথে আলাপ করলে তার খবরাখবর কিছু জানতে পারবো···'

সেরেছে! মনে মনে আঁতকে উঠলো রানা। বুড়োর ঘাড়ে নিশ্চয়ই পুরানো দিনের গল্প ফাঁদার ভূত সওয়ার হয়েছে। অস-হায় দেখালো ওকে। তাকালো সোহেলের দিকে। অর্থাৎ, উদ্ধার কর ভাই!

কিন্তু সোহেলের ঠোঁটে শয়তানী চাপা হাসি দেখে বুঝে নিল

রানা, ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। সংকট থেকে একার চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে শুরু করলো ও, 'দুঃখিত, মিঃ ম্যালোরি। আজ আমরা একটা কাজে…'

ওকে থামিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে জানতে চাইলো সোহেল, 'আপনারা বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, মিঃ ম্যালোরি?'

উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো জেনারেল ম্যালোরির চেহারা। 'সত্যি কথা বলতে কি, ওর বন্ধুত্ব পাবার যোগ্যতা আমার ছিল না। কিন্তু মহৎ হলে যা হয়, সে-ই আমাকে নিচে থেকে টেনে তুলে বন্ধুর আসনে বসিয়ে দেয়। সেজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছি। বন্ধু বটে, কিন্তু তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঠিক তোমাদেরই মতো। কি, তোমরা তাকে শ্রদ্ধা করো না?'

'নিশ্চয়ই করি,' রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে উৎসাহের সাথে বললো সোহেল। 'কিন্তু ঠিক কেন যে শ্রদ্ধা করি, জানি না। জানার কৌতূহল আছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা জানি না। জানি মিলিটারী ইন্টেলি-জেন্সেও ছিলেন, কিন্তু তাঁকে কোনো ভয়ংকর ঝুঁকি নিতে হয়ে-ছিল কিনা বা সার্ভিসে থাকার সময় তিনি সত্যিকার কোনো বুদ্ধির চমক দেখাতে পেরেছিলেন কিনা, কিছু জানি না!'

মিটি মিটি হেসে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করলেন জেনারেল ম্যালোরি, 'জানতে চাও?'

সোহেল একা নয়, তার সাথে সোহানাও গলা মিলিয়ে বললো, 'চাই! অবশ্যই চাই!'

'ভেরি গুড়!' আনন্দে, উত্তেজনায় চক্ চক করে উঠলো জেনারেল ম্যালোরির চোখ জোড়া। রানার দিকে তাকালেন। 'বলছিলে, কাজ আছে। বেশ তো, কাজ শেষ করেই না হয় এসো। রাত ন'টায় তোমাদেরকে আমি ডিনারের নিমন্ত্রণ করলাম। গল্প করতে করতে যদি বেশি রাত হয়ে যায় অসুবিধে কি, গাড়ি তো আছেই। কি বলো, ইয়ংম্যান?'

'সেই ভাল,' উৎসাহের সাথে বললো সোহেল। 'কাজ সেরে ঠিক ন'টার মধ্যে চলে আসবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' একমুখ হাসি নিয়ে বললেন ব্রায়ান ম্যালোরি।

বিদায় নিয়ে গাড়িতে চড়লো ওরা। স্টার্ট দিল রানা। বৃদ্ধ ম্যালোরি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছেন লনে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো ও, তারপরই বোমার মতো ফেটে পড়লো। 'তোর কি কোনোকালেই আক্কেল হবে না, সোহেল? বুড়ো বললো, অমনি ক্যাবলার মতো ডিনার খেতে রাজি হয়ে গেলি? খেয়েদেয়ে আর কোনো কাজ নেই নাকি, যে ভীমরতি ধরা এক বুড়োর প্যাচাল শুনতে আসতে হবে? সময়ের দাম তোদের না থাকতে পারে, আমার আছে। আমি আর এ-মুখো হচ্ছি না!'

সোহেল আর সোহানা পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকালো।

'রাহাত খান আমাদের বস, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ,' বললো সোহেল। 'তুই-ই বল, তাঁর সম্পর্কে ভালমন্দ কি জানি আমরা? জানি, আমাদের মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘোরান তিনি, আমরা তাঁর কথায় বাঁচি, তাঁর কথায় মরি। কিন্তু কেন? কি তাঁর যোগ্যতা? কত ঘাটের পানি খেয়ে এতটা ওপরে উঠেছেন তিনি? তাঁর অতীত কি? তিনি কি আর দশজনের মতো একজন সামরিক অফিসার ছিলেন, নাকি গর্ব করার মতো ওয়াররেকর্ড আছে তাঁর? বল্, এসব কিছু জানি আমরা?'

'না জানালে জানবো কোত্থেকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা। চেহারায় রাগ রাগ ভাব।

'তা ঠিক,' বললো সোহানা। 'কিন্তু এখন যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে...'

'বুড়ো ম্যালোরি আসলে কিছু জানে কিনা, নাকি রাহাত খানের গল্প শোনাবার নাম করে নিজের গল্প ফেঁদে বসবে, তার কোনও ঠিক আছে?' সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো রানা।

'নিজের গল্প কে না শোনাতে চায়?' বললো সোহেল। 'কিন্তু আমাদের চেষ্টা হবে কৌশলে বুড়োর কাছ থেকে রাহাত খানের গল্প আদায় করা। বুড়ো আসলেই কিছু জানে কিনা, সেটা আমরা শুরুতেই বুঝতে পারবো। যদি দেখি ইন্টারেস্টিং কিছু বেরুচ্ছে না, কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়তে বাধা কোথায়?'

মনে মনে স্বীকার করলো রানা, সোহেলের কথায় যুক্তি

আছে। কিন্তু গল্প শুনতে যাবে কি যাবে না, এখুনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। বললো, 'তোরা কোথায় নামবি বল্। অক্সফোর্ডে আমাকে যেতেই হবে।'

'তোমাকে আবার পাবো কোথায়?' জানতে চাইলো সোহানা। 'তারচেয়ে যেখানে যাচ্ছো আমাদেরকেও নিয়ে চলো। কাজ সেরে একসাথেই ডিনার খেতে যাবো।'

'কাজে নয়,' বললো রানা, 'এক বন্ধুর সাথে ক্লাবে যাচ্ছি আমি। ওখান থেকে কখন বেরুতে পারবো, ঠিক নেই।'

সোহানা বললো, 'আমরা সাথে থাকলে সময় মতোই বেরুতে পারবে।'

'দরকার হলে গুঁতো মেরে, ঢুঁসিয়ে বের করে আনবো না!'

সামনেই পেট্রল পাম্প, বাঁক নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি তুললো রানা। 'দে শালা, চার গ্যালনের দাম দে!'

'আহা, আবার ভদ্রমহিলার সামনে গালাগালি কেন...'

সন্ধ্যে থেকে সময়টা ওদের খুব আনন্দেই কাটলো। জনা কয়েক ছাত্র-ছাত্রী একজোট হয়ে দাঁড় করিয়েছে ক্লাবটাকে, তারাই নিয়মিত পান-ভোজন, নাচ-গান করে এখানে। বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ, তবে সদস্য বা সদস্যারা যে যার অতিথি সাথে করে নিয়ে আসতে পারে। তিনজন বাংলাদেশীকে পেয়ে, বিশেষ করে ছাত্ররা সাংঘাতিক মেতে উঠলো। ঝড়টা বেশিরভাগ সোহানার ওপর দিয়েই গেল। ছাত্রদের এমন একজনকে পাওয়া গেল না যে তার সাথে একবার নাচতে আগ্রহী নয়। মেয়ের সংখ্যা কম,

মাত্র দু'জন। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও, উৎসাহ আর আগ্রহের জোয়ার বইয়ে দিয়ে সোহেল আর রানাকে সঙ্গ দিল তারা। ম্যালোরি বুড়ো ডিনার সামনে নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবেন, কথাটা সোহেল বা সোহানা, দু'জনের কারুরই মনে থাকলো না। রাত আটটা বাজলো। তখনও নেচে চলেছে সোহানা। আর সোহেলকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকেছে একটা মেয়ে। সোহেলকে গান শোনাবে, এই অজুহাতে তাকে বগলদাবা করেছে মেয়েটা। পাশের ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিয়েছে ওরা, যদিও গানের কোনো আওয়াজ এখনও পায়নি রানা।

সাড়ে আটটা বাজলো। সাথের মেয়েটার কাছ থেকে মাফ চাইলো রানা, বললো, 'এতটা অভ্যেস নেই তো, তোমার সাথে নাচতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি।' রানার ওপর একটু বোধহয় অসন্তুষ্ট হলো মেয়েটা। চেহারা ম্লান করে বিদায় নিয়ে একেবারে ক্লাব থেকেই বেরিয়ে গেল। একা একা বসে কোক খেলো রানা। ন'টা বাজলো।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ও, এই মাত্র একজনের সাথে নাচ শেষ করে আরেকজন হাতে নিজেকে তুলে দিতে যাচ্ছে সোহানা। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়লো ও, সোহানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। 'ন'টা বাজে।'

'তাতে কি?' হাঁপাচ্ছে সোহানা, কিন্তু সারা মুখে আনন্দঘন হাসি লেগে রয়েছে। 'দারুণ লাগছে আমার, রানা। ইচ্ছে করছে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিই।'

'ও,' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো রানা। 'তা, ঠিক আছে।

আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বুড়ো ম্যালোরি…'

'সর্বনাশ!' রানার কথা শেষ হলো না, আঁতকে উঠলো সোহানা। 'একদম ভুলে গেছি! সোহেল, সোহেল কোথায়? ইস, ভদ্রলোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন! দেরি করার জন্যে মাফ চেয়ে নিতে হবে…'

সোহেলকে ডাকার দায়িত্বটা রানাকেই নিতে হলো। দরজায় নক করলো ও। প্রায় দশ সেকেণ্ড পর দরজা খুললো সোহেল। 'কি রে?'

'জেনারেল ম্যালোরি।' আর কিছু বললো না রানা।

ঘরের ভেতর ফিরে গেল সোহেল, মেয়েটার কাছ থেকে বিদায় নিতে মাত্র তিন সেকেণ্ড সময় নিল সে। ক্লাবের সবাইকে নিরাশ, নিস্তেজ করে দিয়ে ন'টা পাঁচে গাড়িতে চাপলো ওরা।

পথে বিশেষ কথা হলো না। সোহেল শুধু বললো, 'রানা, পরিস্থিতি কিন্তু বদলে গেছে। বুড়ো ম্যালোরির কাছে আমরা তোকে নই, তুই-ই বরং আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিস!'

গাড়ি চালাতে চালাতে রানা বললো, 'মেজর জেনারেলের অতীত জীবনের ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে পাবো, এই প্রতিশ্রুতি কিন্তু তোদের কাছ থেকে এসেছে। যদি নিরাশ হতে হয়, তোদের-কে ফাইন দিতে হবে।'

'বাজি ধরতে চাস?'

'গল্প শুনিয়ে বুড়ো ম্যালোরি যদি আমাদের মুগ্ধ করতে পারে,' কথা দিল রানা, 'তোদেরকে আমি চাইনিজ খাওয়াবো। আর যদি গল্পের মাঝপথে বিদায় নিয়ে উঠে আসতে হয়?'

'আমরা খাওয়াবো,' কথা দিল সোহেল।

'গল্প শোনাবার কথা দিয়ে ফ্যাসাদেই পড়ে গেছি, বুঝলে হে।' পুরু কার্পেটে পায়চারি শুরু করে বললেন জেনারেল ম্যালোরি। চিন্তিত, অস্থির দেখালো তাঁকে। 'কোত্থেকে শুরু করবো, কোন্ গল্পটা বলবো? রাহাত সম্পর্কে এত কথা জানি, কোন্টা রেখে কোন্টা বলি? আবার, তার কোনো কাহিনীই সম্পূর্ণ জানা নেই আমার। আরেক কাপ করে কফি ঢেলে নাও তোমরা, এই ফাঁকে আমি একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।'

গল্প যদি ইন্টারেস্টিং না-ও হয়, এমন খাতির যত্ন পেয়েছে ওরা, কারও মনে কোনো খেদ থাকবে বলে মনে হয় না। ডিনারটা ছিল এক কথায় রাজকীয়। ইংলিশ ডিশের সাথে বাংলাদেশী ডিশ পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জেনারেল। বিনীত ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলেছেন, 'বাঙালীদের রুচি সম্পর্কে প্রথম এবং শেষ সবক রাহাতের কাছ থেকেই পাই আমি। অনেকদিন পর এলেমটা ঝালাই করার সুযোগ পেলাম। আমি নিজে রাঁধিনি বটে, কিন্তু আমার নির্দেশ ছাড়া রাঁধুনী মেয়েটা এক চিমটে লবণ পর্যন্ত কমবেশি করতে পারেনি।' লম্বা কোর্সের ডিনার, খেয়ে উঠতে এক ঘন্টা লেগে গেছে। সোয়া দশটায় জেনারেলের স্টাডিতে এসে বসেছে ওরা। ইতিমধ্যে এক কাপ করে কফি খাওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হলো মাত্র।

প্রকাণ্ড বাড়িতে গোটা চারেক চাকর-বাকর আর কর্মচারী নিয়ে একাই থাকেন জেনারেল। বাপ বিরাট বড়লোক ছিলেন,

বাপের একমাত্র পুত্র তিনি, কাজেই অবসর জীবনটা প্রাচুর্যের মধ্যে কাটাচ্ছেন। লণ্ডনের এই এলাকায় তাঁকে সবাই উদারহস্ত দাতা হিসেবে জানে। ম্যালোরি পরিবারের নামে এবং টাকায় ছোট দু'টো হাসপাতাল, আর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে।

স্টাডিরুমটা সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের মাঝখানে ফায়ার প্লেস। কাঠ-কয়লার আগুন জ্বলছে তাতে। চার দেয়াল জোড়া বইয়ের শেলফ। বিভিন্ন সাইজ এবং রঙের কয়েক সেট সোফা ফেলা আছে। এক কোণে রঙিন টিভি।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ওদের দিকে ফিরলেন ম্যালোরি। 'ওহে, ইতস্তত করার দরকার নেই, ইচ্ছে হলে স্মোক করতে পারো তোমরা!' তেপয়ের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'ওটার দু'পাশে দেরাজ আছে। খোলা। সিগারেট, চুরুট সব পাবে।'

আরও পাঁচ মিনিট পর নিজের সোফায় ফিরে এলেন ম্যালোরি। 'আঙ্গিকটা কি হবে, ঠিক করে ফেলেছি। আমি তোমাদেরকে রাহাতের গল্প শোনাচ্ছি, ভঙ্গিটা তা হবে না। মনে করো, গল্পটা তৃতীয় একজন লোক তোমাদেরকে শোনাচ্ছে। এই অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক রাহাত, রাহাত কি করছে না করছে সেটাই তোমরা শুনতে পাবে। এই আঙ্গিক তোমাদের পছন্দ না হলে বলো...'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বললো সোহেল। 'যেভাবে খুশি বলুন আপনি, গল্পটা ইন্টারেস্টিং হলেই হলো।'

কোনো মন্তব্য না করে আধ-পোড়া চুরুটটা আবার ধরালেন।

ম্যালোরি। চোখ বুজে গোটা কয়েক টান দিয়ে বললেন, 'কোন্‌টা শোনাবো, তাও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। এর কিছুটা আমি রাহাতের মুখে শুনেছি, কিছুটা নিজের চোখে দেখেছি, কিছুটা বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে জেনেছি, আবার কিছুটা পেয়েছি যুদ্ধের ওপর লেখা বিভিন্ন লেখকের বই থেকে। এদের সবার কাছ থেকে মাল-মশলা যোগাড় করে একট রেডিমেড কাহিনী তোমাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি আমি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গল্পটা বানানো। যা বলবো, তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি।'

'আপনার গল্পের বিষয়টা ?' জানতে চাইলো সোহানা।

গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধ জেনারেল। বললেন, 'যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।'

'আপনার গল্পের নায়ক মেজর জেনারেল রাহাত খান...'

'আমার গল্পের নায়ক মেজর রাহাত,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন জেনারেল।

বাধা পেয়েও দমলো না রানা, আবার শুরু করলো, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কি মেজর রাহাতের কোনো অবদান ছিল ? মানে, তিনি কি গর্ব করার মতো কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন ?'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ জেনারেল। তারপর গম্ভীর, থমথমে গলায় বললেন, 'মেজর রাহাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জানি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তোমাদের। বাই গড, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি

শুরু করছি, তোমারা শোনো—তাহলেই বুঝতে পারবে।’

নড়েচড়ে বসলো ওরা। প্রত্যাশা এবং আগ্রহে চকচক করছে তিন জোড়া চোখ

শুরু করলেন ব্রায়ান ম্যালোরি

তিন

পেট্রল ট্রেন উড়িয়ে দেয়া ছিল বলকানে মেজর রাহাতের শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। রুমানিয়া জার্মানীর হাতে চলে গেছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেড়ানো এবার অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে চলছে ফোক্সওয়াগেন। সামনেই দেখা যাচ্ছে শহরতলীর হু'একটা ক্ষীণ আলো। চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে মাথাটা। রুমানিয়া থেকে পালাতে হবে ওকে।

সম্ভাব্য একমাত্র রুটটা জানা আছে রাহাতের। হানাদার জার্মানীর দখলে রয়েছে বুলগেরিয়া, তার ভেতর দিয়ে নিরপেক্ষ তুরস্কে যেতে হবে ওকে। ওখান থেকে গ্রীসে যাবার বোট পাওয়া যাবে। কিছুদিন হলো মিত্রপক্ষের ট্রুপ ল্যাণ্ড করেছে গ্রীক মেইনল্যাণ্ডে। উদ্দেশ্য, জার্মান আগ্রাসনের হুমকি মোকাবিলা করা। গ্রীসে পৌঁছুতে পারলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় ওর। কিন্তু পৌঁছানো সহজ হবে না। প্রতিটি কণ্ট্রোল পয়েণ্টে কড়া নজর রাখা হয়েছে, ঢুকতে বা বেরুতে গিয়ে চেকিঙের সামনে পড়তেই হবে। রাহাতের একমাত্র আশা, ওর জার্মান কাভার। কিন্তু সব-

চেয়ে ভয় জার্মান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অ্যাবওয়েরকে। বলকানে উপর্যুপরি বিস্ফোরণের ঘটনা বন্ধ করার জন্যে অ্যাবওয়ের থেকেই একটা দলকে পাঠানো হয়েছিল। রাহাত জানে, ওর পিছনে এখনও লেগে আছে অ্যাবওয়ের, ওর আসল পরিচয় জানতে হয়তো আর বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওরা। কাজেই, সময় নষ্ট না করে ফ্ল্যাটে এক বার ঢুঁ মেরেই আবার রাস্তায় নামতে হবে ওকে। ব্যাগ গুছানোই আছে, বগলদাবা করে সেটা শুধু গাড়িতে তুলতে হবে। তারপর ছোটো। দক্ষিণ দিকে। বুলগেরিয়া হয়ে আরও দক্ষিণে। ইস্তাম্বুল।

ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত ও। হাতের উল্টোপিট দিয়ে চোখ রগড়ালো। গাড়ির স্পীড কমিয়ে এনেছে, এত রাতে শহরের ভেতর দিয়ে জোরে গাড়ি চালাতে দেখলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। রাস্তার ছ'পাশে পাথরের তৈরি বাড়ি-ঘর, ছ'একটা বাড়ির ওপরতালার জানালায় আলো দেখা গেল, বাকি সব অন্ধকারে ঢাকা। বিস্ফোরণের শব্দে কিছু লোকের ঘুম ভেঙে গেছে।

মেইন হাইওয়ে এড়িয়ে গলিপথ ধরলো রাহাত। যতোই কাছে চলে আসছে ফ্ল্যাট ততোই টান পড়ছে পেশিতে। অন্ধকার সিঁড়িতে কে অপেক্ষা করছে, কেউ বলতে পারে না। গ্যারেজটা এককালে আস্তাবল ছিল, উল্টো করে গাড়িটাকে ভেতরে নিয়ে এল রাহাত। দরজার দিকে থাকলো ফোক্সওয়াগেনের মুখ, ইমার্জেন্সী দেখা দিলে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারবে। গাড়ি থেকে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ও। খোলা গেট দিয়ে তুষার মোড়া উঠান দেখা গেল। কিছু নড়ছে না, কোথাও কোনো

শব্দ নেই। পকেট হাতড়ে আধ পোড়া জার্মান চুরুট বের করলো। উঠানে চোখ রেখে আগুন ধরালো তাতে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো গ্যারেজের গেটের সামনে। উঁকি দিয়ে তাকালো বাইরে। কেউ নেই। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে হন হন করে এগোলো মেইন গেটের দিকে।

নির্জন রাস্তা। একটা বিড়ালের ছায়া পর্যন্ত নেই। দ্রুত এগোলো রাহাত। কোটের পকেটে ডান হাত, শক্ত করে ধরে আছে ল্যুগারটা। অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক এখান থেকে পায়ে হাঁটা পাঁচ মিনিটের পথ। আস্তানার উল্টোদিকে একটা গ্যারেজ ভাড়া নিলে সুবিধে হতো, কিন্তু রাত দুপুরে গাড়ির আওয়াজ শুনে সম্ভাব্য শত্রু ওর আগমনের সংকেত পেয়ে যাবে, তাই নেয়নি।

গলিটা সরু, ভেতরে ঢুকেই হাতের চুরুট তুষারের ওপর ফেলে জুতো দিয়ে চেপে নিভিয়ে ফেললো রাহাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার, জ্বলন্ত চুরুট নিজের উপস্থিতিই ঘোষণা করে। বিশেষ করে এই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটা বেছে নেবার কারণ হলো, পাশের একটা গলি থেকে এর ভেতরে ঢোকা যায়। গলিটার ভেতর অন্যান্য বাড়ির এত বেশি দরজা আছে যে কোন্‌টা দিয়ে কোথায় ঢুকলো ও, সহজে আন্দাজ করতে পারবে না অনুসরণকারী। গলিটা সোজা এগোয়নি, ধনুকের মতো বেঁকে গেছে খানিকদুর, তারপর ডানে বাঁয়ে গোটা চারেক বাঁক নিয়েছে। ক্লান্তিতে পা চলতে চায় না, ঘুমে বুজে আসছে চোখ। কিন্তু তুষারের ওপর পায়ের দাগগুলো লক্ষ্য করতে ভুল করলো না ও। এদিকের লোকজন নাইট শিফটে ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, কাজেই উদ্বিগ্ন

হবার মতো কিছু দেখলো না। পায়ের ছাপগুলো ওর ফ্ল্যাট বাড়ির দোর-গোড়ার পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে দেখে স্বস্তি-বোধ করলো ও। দোর-গোড়ার সামনে ছোট্ট একটা কংক্রিটের চাতাল, সেখানেও তুষার জমেছে। তুষারের কোথাও কোনো ছাপ বা গর্ত নেই।

এবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। এখানেই সবচেয়ে বেশি ভয়। গ্যারেজে থাকতেই রিলোড করে নিয়েছে ল্যুগারটা। কোটের পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে ধরে আছে সেটা। তালার ফুটোয় চাবি ঢোকালো বাঁ হাত দিয়ে। দ্রুত ঘোরালো। ক্লিক শব্দটা বিস্ফোরণের মতো লাগলো কানে। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করলো কবাট। ভেতরে ঢুকলো নিঃশব্দে। কবাট বন্ধ করলো একটু একটু করে। টর্চ বের করে জ্বালার আগে অটল দাঁড়িয়ে থাকলো পাঁচ সেকেণ্ড। প্রথমে সিঁড়ির দিকে তাক করলো টর্চ, তারপর চাপ দিল বোতামে।

সিঁড়ির ধাপগুলো শুকনো।

ধীরে ধীরে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করলো রাহাত। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে থামলো ও, আরেক প্রস্থ সিঁড়ির সব ক'টা ধাপ দেখে নিল আলো ফেলে। থাকার কথা নয় অথচ আছে, এই রকম ছায়া খুঁজছে ও। ছয়তালায় উঠে নিজের দরজার সামনে আবার একবার থামলো। এরপর ওপর দিকে উঠে গেছে সিঁড়ি, শেষ মাথায় কেয়ারটেকার অ্যালবার্টের ঘর। টর্চের আলোয় দেখা গেল সাততালায় উঠে যাবার প্রথম প্রস্থ সিঁড়িতে, বাঁকের এদিক পর্যন্ত পায়ের কোনো দাগ নেই। জানে, স্ত্রীর সাথে দেখা করার

জন্যে কনস্ট্যান্টায় গেছে অ্যালবার্ট। পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় ঢোকাতে যাবে, এই সময় সিদ্ধান্ত পাল্টালো রাহাত। নিজেকে তিরস্কার করলো ও। এখানে তার ফিরে আসাই উচিত হয়নি। ভাগ্যের ওপর বড় বেশি আস্থা রাখা হয়ে যাচ্ছে। এই ক্লান্তিটাই যত নষ্টের গোড়া, দু'এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার লোভই আসলে তাকে ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে প্ররোচিত করেছে। শরীরটা তাজা থাকলে কিছুতেই এই অকারণ ঝুঁকি নিত না সে। বাস করার জায়গাটা সবচেয়ে বিপজ্জনক। মনে পড়লো, ডেভিসকে তার বুদাপেস্ট ফ্ল্যাটেই পেয়েছিল অ্যাবওয়ের।

আরও দু'চার ঘণ্টা বাঁচবো, ক্লান্তিতে মরে যাবো না, ভাবলো রাহাত। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুমানোর কথা ভাবা যাবে। হাতে তখনও টর্চটা রয়েছে, এই সময় শিরদাঁড়ার ওপর শক্ত কিছু ঠেকলো। জার্মান ভাষায় কথা বললো লোকটা।

'খুব, খুব সাবধান, হের স্মীট। আমি তোমার শত্রু, আমার হাতে এটা একটা পিস্তল, কাজেই মরতে চাইলে লাফ-ঝাঁপ দিতে পারো। তারচেয়ে, ল্যাণ্ডিঙের আলোটা জ্বালো। কিন্তু এখুনি ঘুরো না।

ক্লান্তি যে বুদ্ধিকে ঘোলা করে রেখেছে, তার আরেকটা প্রমাণ পেল রাহাত। হাতে এই মুহূর্তে ল্যুগার থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রয়েছে টর্চ। সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করতেও ভুল করে বসে আছে সে। টর্চ ধরা মুঠোটা আরও শক্ত হলো। এটাকেই হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে নাকি? কিন্তু

মাথায় চিন্তাটা আসার সাথে সাথে ঝেড়ে ফেলে দিল ও। ওর পিছনে দাঁড়ানো লোকটা নিজের কাজ বোঝে, ওর শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তলের মাজল এমন শক্ত ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে, যেন গোলমেলে নড়াচড়ার প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র ট্রিগার টিপে দেয়া যায়। দেয়াল হাতড়ে সুইচ বোর্ডটা স্পর্শ করলো রাহাত, বোতাম টিপে ল্যাণ্ডিঙের আলো জ্বাললো। কম পাওয়ারের বাল্‌ব, ম্লান আলো।

'ভেতরে ঢুকবো আমরা,' বললো লোকটা। পরিণত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। গলার আওয়াজেই বোঝা যায়, একজন অভিজ্ঞ লোক, কঠিন পাত্র। 'অস্থির হবার দরকার নেই। ধীরে সুস্থে তালা খোলো—খুব সাবধানে।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর রাহাতের বুক আর পেটের মাঝখানে পিস্তল তাক করে ছোট বেডরুমের ভেতর ঢুকলো জার্মান লোকটা। তার অনুরোধে বোতাম টিপে বেড সাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলেছে রাহাত। লোকটা জানতে চাইলো, 'ওভারহেড লাইটটা জ্বাললে না কেন?'

'এক সুইচেই দু'টো আলো জ্বলে,' বললো রাহাত। 'ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

টর্চের আলোয় সব ক'টা কামরা দেখে ছোট বলে এটাকেই পছন্দ করেছে লোকটা। আলো জ্বেলে পিছিয়ে গেছে রাহাত। কিন্তু দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে দূরত্বটাকে সমান করে নেয়নি প্রতিপক্ষ। ঘরের ভেতর নড়াচড়ার জায়গা একেবারেই কম, তার ওপর লোকটার হাতের পিস্তল এক চুল নড়ছে না,

হঠাৎ কিছু করে বসার চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রাহাত। সরু, মেদহীন মুখ লোকটার, তার চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা, চোখ দু'টো সতর্ক এবং বুদ্ধিদীপ্ত। বয়স রাহাতের চেয়ে বেশি, ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়। একই রঙের হ্যাট আর লেদার কোট পরে আছে। রিমলেশ গ্লাসের ভেতর চোখ দু'টো নিষ্পলক। ইঙ্গিতে বসতে বললো রাহাতকে। বিছানার ধারে বসলো রাহাত।

বললো, 'রাত দুপুরে এটা কি ধরনের রসিকতা, আশা করি তুমি নিজেই সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবে। তার আগে, যদি অনুমতি দাও, গা থেকে কোটটা খুলতে চাই আমি। দেখতেই পাচ্ছ, তুষার লেগে ভিজে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল লোকটা, এবার আর সতর্ক করে দিল না। সাবধানে, ধীরে ধীরে কোট খুললো রাহাত, তার প্রতিটি নড়চড়া ঠাণ্ডা চোখে লক্ষ্য করলো প্রতিপক্ষ। খুব যে শক্ত করে ধরে আছে পিস্তলটা তা নয়, কিন্তু হাত আর আঙ্গুল এমন আশ্চর্য স্থির হয়ে আছে যে মাজলটা এক চুল নড়ছে না। আগেই লক্ষ্য করেছে রাহাত, লোকটার কোট পকেট থেকে উঁকি দিয়ে আছে একজোড়া রাবার ওভার-শু। কিভাবে ভেতরে ঢুকেছে, এ থেকে বোঝা যায়। রাস্তার দিকের দরজা খোলার জন্যে নিশ্চয়ই স্কেলিটন কী ব্যবহার করেছে সে, তারপর জুতো খুলে দোর-গোড়ার চাতাল টপকেছে, তুষারে পা ফেলেনি। এমন একজন লোক যার সমস্ত দিকে খেয়াল আছে—অন্তত প্রায় সমস্ত দিকে। বিছানা ছাড়া ঘরের আরেকটা ভারি ফার্ণিচার হলো

ওয়ার্ডরোব, অত্যন্ত সাবধানে সেটার বাইরের দিকের একটা হুকে কোটটা ঝুলিয়ে রাখলো রাহাত। কাপড় চোপড় পাল্টাবার সময় সরু একটা জায়গা দিয়ে অনেক কষ্টে ওটার সামনে যেতে হয় ওকে। কোটটা হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখার সময় সাবধানতা অবলম্বনের কারণ হলো, ওয়ার্ডরোবের পায়াগুলো নড়বড়ে, অসমান। একটু ছোঁয়া লাগলেই উল্টে পড়ার উপক্রম হয়। সেটা লোকটাকে জানতে দিতে চায় না ও। কোটটা ঝোলাবার সময় লক্ষ্য রাখলো, একদিকের পকেট যেন বাইরের দিকে থাকে, যেটায় ল্যুগারটা রয়েছে।

লোকটার দিকে রাহাত ফিরতেই বললো সে, 'তোমার জ্যা-কেটের ভেতর একটা পিস্তল আছে, হের স্মীট। সাবধানে বের করো ওটা, তারপর বিছানার ওপর ফেলো।'

দ্বিতীয় ল্যুগারের বাঁটটা আঙ্গুল দিয়ে ধরে শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে নিয়ে এল রাহাত, ট্রিগারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো তর্জনী। হাতটা লম্বা করে দিয়ে ওপর থেকে ছেড়ে দিল, বিছানার ওপর পড়লো ল্যুগার। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে ও, আবার কাজ করতে শুরু করেছে মাথা। অন্তত একটা কৌশল টিকে গেছে, লোকটাকে দ্বিতীয় ল্যুগার দেখিয়ে কোটের কথা ভুলিয়ে দেয়া গেছে। প্রথমে এক পা, একটু থেমে তারপর আরেক পা, এইভাবে এগিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে বিছা-নার ওপর থেকে ল্যুগারটা তুলে নিজের পকেটে রাখলো প্রতিপক্ষ।

বললো, 'বিছানায় তোমার দিকটাতেই এবার বসো, হের স্মীট। জার্মান ভাষায় তুমি লেকচার ঝাড়তে পারো, কোথাও

ভুল হয় না, জানা আছে আমার। কাজেই যা যা জিজ্ঞেস করবো, গড় গড় করে বলে যাও।'

আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে রাহাতের। মুচকি হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'তুমি কে?'

'মেয়র। বুঝতেই পারছো, আমি অ্যাবওয়েরের লোক।'

মুচকি হাসি মুছে গিয়ে রাহাতের চেহারায় রাগ এবং কাঠিন্য ফুটে উঠলো। 'তাহলে এভাবে আমার সাথে দেখা করার কি মানে থাকতে পারে?'

পিছিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালো মেয়র, ধীরে ধীরে শরীরটা ঘোরালো সে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকলো রাহাতের দিকে। বেডরূম থেকে বেরিয়ে যাবার এই একটাই দরজা, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল সে-টায়। শরীরটা আবার ঘুরিয়ে নিল সে। দরজার কবাটে হেলান দিয়ে বললো, 'তোমার আসল নাম জানি না, তাই আপাতত তোমাকে আমি স্মীট বলেই ডাকবো।'

'আমার আসল নাম? ভুরু কুঁচকে বিহ্বল একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো রাহাত চেহারায়। 'তুমি পাগল নাকি? আমি ওয়ার্ণার স্মীট...'

'ওটা তোমার আসল নাম নয়,' বললো মেয়র। 'তুমি আদৌ জার্মান কিনা সে-ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। তবে তুমি যে মিত্রপক্ষের গুপ্তচর, একজন অন্তর্ঘাতক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি যদি জার্মান হও, তুমি জাতির কলংক।'

মনে মনে হাসলো রাহাত। নাম না জানা ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর

প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো ও। ওর এই গায়ের লালচে সাদা রঙটা সেই বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করা লেটেস্ট লোশনের কৃতিত্ব। ও যে ভারতীয়, কার বাপের সাধ্যি ধরে সেটা।

'তুমি বাড়াবাড়ি করছো, মেয়র!' রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে বললো রাহাত।

কিন্তু মেয়রকে ব্যাপারটা স্পর্শই করলো না। 'উনিশ শো চল্লিশ সালের জানুয়ারী, তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, -হের স্মীট,' জার্মান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অ্যাবওয়েরের এজেন্ট বললো। 'বুদাপেস্ট অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে এই ফ্ল্যাটের দূরত্বও অনেক। গিঅরে তোমাকে একবার আমি প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম, কিন্তু ভুল করেছিলাম নিজে না গিয়ে সহকারীকে পাঠিয়ে। কি ঘটেছিল তার ভাগ্যে? সেই থেকে বেচারার আর দেখা নেই।'

'রাইখের একজন নাগরিক হিসেবে···'

'তোমাকে আমার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া উচিত, তাই না?' চেহারা দেখে মনে হলো কৌতুক বোধ করছে মেয়র। হাসলে যে লোকটাকে এমন বীভৎস দেখায়, কল্পনাও করতে পারেনি রাহাত। হাসির সাথে ছোট না হয়ে চোখ দু'টো কি ভাবে যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, কদর্য রেখা আর ভাঁজ ফুটে উঠলো সারা মুখে। 'কিন্তু ধরো, তার বদলে আমি যদি তোমাকে গেস্টাপো হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে যাই? কি মনে করো, সময়টা ওখানে তুমি উপভোগ করবে?'

'সরাসরি বার্লিনে কমপ্লেন করবো আমি—ওখানের লোকজন চেনে আমাকে,' থমথমে গলায় বললো রাহাত। 'আমি একজন

জার্মান বিজনেসম্যান। মিউনিখ, আমার ফার্ম থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এসব প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট কাগজ-পত্রও আছে···'

'তা তো থাকবেই,' বিদ্রূপের সুরে বললো মেয়র। 'এবং সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেও জেনুইন বলে টিকে যাবে—যতক্ষণ না তোমার মনগড়া এমপ্লয়ির সাথে যোগাযোগ করে আসল ব্যাপারটা জানতে চাওয়া হয়।' চেহারা কঠিন হয়ে উঠলো তার। 'আজ তুমি আমাকে আরেকটু হলে খুন করে ফেলেছিলে, হের স্মীট। তাও আবার আমার নিজের লোকদের দিয়েই। আমি একজন জার্মান, অথচ জার্মান সৈনিকরা আমার গাড়ি লক্ষ্য করে বুলেট বৃষ্টি শুরু করলো। জান বাঁচাবার জন্যে পাগলের মতো গাড়ি চালাতে হয়েছে আমাকে। রেলইয়ার্ড থেকে তুমি যে পালাতে পারবে, সেটা আমি ধরেই নিই। অতী-তেও এই রকম কঠিন ঘেরাও থেকে বেরিয়ে এসেছো। ভাবলাম, রেলইয়ার্ড থেকে পালিয়ে আস্তানায় একবার আসতে পারো, তাই সরাসরি এখানে এসে অপেক্ষা করতে থাকি। তোমাকে আমি বেশ অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যের পর হারিয়ে ফেলি। আসলে তুমি যে রেলইয়ার্ডে যেতে পারো, সেটা আন্দাজ করতে একটু দেরি করে ফেলি আমি।'

'তুত্তোরী!' রাগ এবং বিরক্তি দুটোই প্রকাশ পেল রাহা-তের চেহারায়। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।' পায়ের ওপর পা তুলে শরীর ঢিল করে দিল ও। হাত দু'টো রাখলো কোলের ওপর, মেয়র যাতে চোখের সামনে

দেখতে পায়। এই নড়াচড়ার সুযোগে টেবিল ল্যাম্পের প্লাগ লাগানো ইলেকট্রিক কর্ডের সাথে ডান পা বাধিয়ে নিল ও।

ঠোঁটের কোণ প্রসারিত হলো মেয়রের, কিন্তু চেহারায় হাসি ফুটলো না। 'আজ রাতে রেলইয়ার্ডে ছিলাম আমি, স্মীট—গোলাগুলি শুরু হলো যখন। এবার বুঝতে পারছো?'

'কোন্ রেলইয়ার্ডে? এইসব আবোলতাবোল রাবিশ্ থেকে কি বুঝতে হবে আমাকে?'

'বুঝতে হবে, এবার আর তোমার রেহাই নেই। বুঝতে হবে, তুমি শেষ। রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছো। ওই রেলইয়ার্ডই ছিল তোমার রাস্তার শেষ মাথা।'

'আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, মেয়র,' ধমকের সুরে বললো রাহাত। 'তুমি কে, আমি জানি না। জানার কোনো ইচ্ছেও নেই। যদি অ্যাবওয়ের হও, বিছানার ওদিকে ওই যে আরেকটা টেবিল রয়েছে, ওটার দেরাজ খুললেই বুঝতে পারবে তুমি একটা ইডিয়টের মতো আচরণ করছো।'

এটা একটা সুযোগ তৈরির চেষ্টা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। রাহাত জানে, মিনিট কয়েকের মধ্যে হয় মারা যাবে সে, নয়তো মুক্ত হবে। নখ নিয়ে হাঁটু আঁচড়ালো ও, জায়গাটা যেন চুল-কাচ্ছে। এই সামান্য নড়াচড়ার মধ্যে পায়ে বাধিয়ে রাখা কর্ডটা পরীক্ষা করে নিল। পায়ের পাতা আর গোড়ালির সাথে বেশ জুতসই ভাবে আটকেছে ওটা। যদিও, শুধু অনুভব করে বুঝতে হলো ব্যাপারটা। পলকের জন্যেও চোখ নামানো উচিত হবে না, সাথে সাথে কিছু একটা গোলমাল আছে বলে সন্দেহ করবে

মেয়র। আর কিছু না বলে অপেক্ষা করে আছে রাহাত, আর বন্ধ দেরাজে কি আছে, কি থাকতে পারে তাই ভাবছে মেয়র রাহাতের রাগ আর বিরক্ত ভাব কতটা নিখুঁত হয়েছে, অনেক কিছু নির্ভর করছে তার ওপর। ওর মেজাজী কণ্ঠস্বর শুনে লোকটা যদি দ্বিধায় পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সুযোগ একটা তৈরি হলেও হতে পারে। পায়ের ওপর পা তুলে, হাঁটু চুলকে, শরীর ঢিল করে দিয়ে মেয়রকে বুঝতে দিয়েছে ও, তার হাতের পিস্তলটাকে ভয় পায় না ও। বুঝতে দিয়েছে, ও তাকে একটা ইডিয়ট বলে ধরে নিয়েছে।

টোপটা এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেই টেবিলটা মেয়রের নাগালের মধ্যে এসে যাবে। একটা হাত দিয়েই দেরজাটা খোলা সম্ভব। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু থাকলে বের করা যেতে পারে, শত্রুর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই। রাহাতকে খুঁটিয়ে দেখলো মেয়র। বিছানার আরেক প্রান্তে বসে আছে রাহাত। হাত দু'টো কোলের ওপর। আক্রমণ করতে হলে প্রথমে রাহাতকে উঠে দাঁড়াতে হবে, তারপর বিছানা আর ওয়ার্ডরোবের মাঝখানে ছোট্ট জায়গাটা ছুটে পেরিয়ে আসতে হবে। অতো সময় পাবে না ও, তার আগেই মেয়রের হাতে গর্জে উঠবে পিস্তল।

'কি আছে দেরাজে?' জানতে চাইলো মেয়র।

হাতের কাছে একমাত্র যে অস্ত্রটা পাওয়া গেল সেটাই ব্যবহার করলো রাহাত—বোবা হয়ে থাকলো। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো জার্মান লোকটা, তারপর ঠিক আছে, দেখা যাক,

এই রকম ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার কবাট থেকে পিঠ তুলে টেবিলের দিকে এক পা এগোলো। পিস্তলটা রাহাতের বুকের ওপর তাক করা। কিন্তু তার বন্দী চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকিয়ে আছে বন্ধ দরজার দিকে। দেরাজের হাতল ধরার জন্যে বাঁ হাতটা বাড়ালো মেয়র, তার দুই হাতের মধ্যে ওটাই রাহাতের কাছাকাছি। মেয়র বাঁ হাত দিয়ে হাতল ধরতে চাইলে শরীর বাঁকা করে নিতে হবে তাকে, ফলে রাহাতের দিকে তাক করা পিস্তলসহ ডান হাতটা অন্য দিকে ঘুরে যেতে বাধ্য। মেয়রের এই অসুবিধে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে রাহাত। মেয়র হাতল ধরতে যাচ্ছে, তখনও কোলের ওপর নিরীহ ভঙ্গিতে নিজের হাত দু'টো ফেলে রেখেছে রাহাত। পরমুহূর্তে ওর দিকে তাক করা পিস্তলটা অন্য দিকে সরে গেল। ঠিক এই সময় বন্ধ বেডরুমের ওদিক থেকে ভেসে এল ঝনঝন টেলিফোনের আওয়াজ।

'এত রাতে কে হতে পারে?' গলার স্বর শুনে মনে হলো টেলিফোনের জন্যে রাহাতকেই দায়ী করতে চায় মেয়র।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো রাহাত। আর কোনো অস্ত্র নেই ওর। এতেই অবশ্য কাজ হচ্ছে। ও চুপ করে থাকায় দ্বিধা আরও বেড়ে গেল মেয়রের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে টেলিফোনের শব্দ, সেটাও নাড়া দিল তার স্নায়ুকে। তার ওপর, কে টেলিফোন করেছে জানার আগে দেরাজে কি আছে দেখতে চায় সে। কাজেই হঠাৎ করে সব কিছুই তার কাছে জরুরী হয়ে উঠলো।

খপ্ করে দেরাজের হাতল ধরলো সে, টান দিয়ে বের করে

নিয়ে এল সেটা, ভেতরে লেদার মোড়া একটা খাতা দেখে ভাবলো ওটা একটা ডায়রী হতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে খাতার দিকে চোখ রয়েছে তার। এই প্রথম রাহাতের দিক থেকে চোখ সরিয়েছে সে। বিছানা থেকে উঠলো না রাহাত, ডান পা-টা বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁকি দিল। দেয়ালের সকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল প্লাগ, অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। টেবিল থেকে ঝনাৎ করে মেঝেতে আছড়ে পড়লো ল্যাম্প। ইতিমধ্যে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে রাহাত, মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে প্রথম গুলির আওয়াজ শোনার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

কিন্তু গুলি করলো না মেয়র। বোঝা গেল, প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসাধারণ সেলফ-কন্ট্রোল, দু'টোই আছে তার। এখন গুলি করা মানে রাহাতকে নিজের পজিশন জানিয়ে দেয়া। মেঝের সাথে ছোঁয়া লাগলেই শব্দ করবে জুতো, তাই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে শরীরটা ঘোরালো রাহাত। অন্ধকার হাতড়ে কোটের কিনারা ছুঁলো, আঙুলগুলো উঠে গেল পকেটে। ল্যুগার হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ওয়ার্ডরোবে হেলান দিল ও। এখন অপেক্ষার পালা।

রাহাতের মনে হলো, ল্যাম্পটা নিভে যাবার পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে। সেই থেকে আর কোনো শব্দ পায়নি ও। নাকি পেয়েছে? এই মাত্র খসখস করে উঠলো কিছু, ওটা কি তবে কানের ভুল? মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানে, জায়গা বদল করেছে মেয়র। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে, মুখ করে আছে নড়বড়ে ওয়ার্ডরোবের আরেক

পাশের দিকে। শরীরের ভর হাঁটুর ওপর রেখেই কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল রাহাত ওয়ার্ডরোবে। তিন মণ ওজনের নিরেট কাঠের ফার্ণিচারটা নব্বুই ডিগ্রী কোণ রচনা করে ঘুরলো। কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেল সেটা। গুঙিয়ে ওঠার চাপা আও-য়াজ পেল রাহাত। ঘোরা শেষ করে একপাশে কাত হয়ে পড়লো ওয়ার্ডরোব, সেই সাথে থেমে গেল চাপা গোঙানির আওয়াজ। অন্ধকারে হাতড়ে বাঁ হাত দিয়ে কোটটা স্পর্শ করলো রাহাত। হুকের সাথে এখনও সেটা আটকে আছে। দ্বিতীয় পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললো ও।

ভারি ওয়ার্ডরোবের নিচে চাপা পড়েছে মেয়র। মাথার একটা পাশ নেই বললেই চলে। অথচ চশমাটা এখনও লটকে আছে চোখের সামনে। আবার মাথার দিকে তাকালো রাহাত। ওরার্ডরোবটা সরালে হয়তো হলুদ মগজ দেখা যাবে।

বাইরের ঘরে বন্ধ হয়েছে টেলিফোনের আওয়াজ। এত রাতে কে ফোন করতে পারে, জানে রাহাত। লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ে দরজার তালা খুললো ও, টপকে চলে এল পাশের কাম-রায়। ফ্রন্ট-ডোরটা খুললো। নিচে থেকে কোনো শব্দ নেই। দরজায় আবার তালা লাগিয়ে ফিরে এল বেডরুমে। সুইচ অফ করে টেবিলে তুললো ল্যাম্পটা। প্লাগ লাগিয়ে জ্বাললো সেটা। লাশের মানিব্যাগ থেকে বেরুলো একটা আইডেন্টিটি কার্ড। মেয়রের নাম রয়েছে। আরেকটা বেরুলো কোটের লুকানো পকেট থেকে। এটায় চোখ বুলিয়ে জানা গেল, মেয়র আসলে একজন অ্যাবওয়েরের অফিসার। কিন্তু প্রথম কার্ডটাই আগ্রহী করে

তুললো রাহাতকে। "ডঃ রিচার্ড মেয়র, আর্কিওলজিস্ট"। অ্যাব-ওয়ের অফিসার নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইলে একটা সিভিলিয়ান কার্ড বের করে দেখায়। এটা মেয়রের সেই সিভি-লিয়ান কার্ড।

কার্ডটা হাতে নিয়ে বিছানার ওপর বসলো রাহাত। মেঝেতে রক্ত। লাশের ওপর পড়ে আছে ওয়ার্ডরোব। সাহায্য ছাড়া আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না। চুরুট ধরিয়ে কার্ডটা পরীক্ষা করতে শুরু করলো ও। কয়েক মিনিট পর আবার ঢুকলো লিভিংরুমে, ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

তিনবার রিঙ হলো অপরপ্রান্তে। ঘুম জড়ানো গলায় কথা বললো পেন। 'কে?'

'ওয়ার্ণার···'

'কিছুক্ষণ আগে আপনাকে আমি ফোন করেছিলাম, স্যার···

'জানি। জোনার ওখানে চলে যাও, মিউনিখ থেকে তোমার জন্যে কিছু খবর নিয়ে এসেছে সে।' আসলে নিজের ফ্ল্যাটে পেনকে আসতে বললো রাহাত।

রিসিভার রেখে দিয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাহাত। ফোনের সাথে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা আছে কি? থাকলেও অবশ্য কিছু এসে যাবে না। জার্মান ভাষায় কথা বলেছে ওরা। তাছাড়া, জোনার ঠিকানা উচ্চারণ করা হয়নি। মিউনিক শব্দটা শুনেই বুঝতে পারবে রবার্ট পেন, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

অপেক্ষার সময়টা শান্ত ভাবে বসে চুরুট ফুঁকে কাটালো

রাহাত। করার কিছু নেই ওর। এই ফ্ল্যাটে কোনো ক্লু বা এভিডেন্স রাখে না ও।

ফোনে কথা হবার দশ মিনিট পর রাহাতের ফ্ল্যাটে পৌঁছুলো রবার্ট পেন। স্প্যানিশ মিনারোলজিস্টের কাভার নিয়ে আছে ও, ফ্যাসিস্টদের প্রতি যার অকুণ্ঠ সহানুভূতি। আসলে সে একজন ব্রিটিশ, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে আছে। লিভিংরুমে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলো সে। একটাও কথা না বলে রাহাতের সব কথা শুনলো। তারপর রাহাতের হাত থেকে কার্ড দুটো নিয়ে পরীক্ষা করলো।

'সিভিলিয়ান কার্ডটা,' বললো রাহাত। 'ইউরোপ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ওটা আমি ব্যবহার করতে চাই। জাল করতে বেশি সময় দিতে পারবো না। আমার কিছু ছবি তোমার কাছে তো আছেই, তাই না?'

'সম্ভব,' বিড়বিড় করে বললো পেন। বছর ত্রিশেক বয়স, একহারা শরীর। 'কিন্তু স্যার,' চোখ তুলে তাকালো রাহাতের দিকে। 'বড়বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না কি? এইমাত্র যাকে খুন করলেন তার পরিচয় নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চান···' কথা শেষ করলো না, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো।

সাথে সাথে কোনো উত্তর দিল না রাহাত খান। এক মনে চুরুট ফুঁকছে। পেন ভাবলো, মেজর রাহাত এই মুহূর্তে কি ভাবছেন বলা মুশকিল। তার কথা শুনতে পেয়েছেন কিনা কে জানে। ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে, মনে মনে স্বীকার করলো সে। যদিও সাধারণ জার্মানদের চেয়ে খাটো তিনি, ধড়টাও তাদের

মতো চওড়া নয়। সাবোটাজ টিমটা তাকে যদি গড়তে দেয়া হতো, মেজর রাহাতকে দলে নিত না সে। তবে, মেজর রাহাত-কে যদি ব্যক্তিগতভাবে না চিনতো, তাহলে। পরিচয় থাকলে নিত। পেন জানে, শারীরিক কাঠামোর অসঙ্গতি দূর করার জন্যেই মেজর যখন জার্মানদের মধ্যে থাকেন তখন একরোখা, বদমেজাজী, বিদ্রূপাত্মক একটা ভূমিকা নেন। বোধহয় সেজন্যেই নাজী-অকুপাইড ইউরোপে তার ছদ্ম-পরিচয় এত বিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে মেজরের চেহারা এবং আচরণে আক্রমণাত্মক, হিংস্র ভাব নেই। ভাবছেন, কিন্তু ঠোঁটে লেগে আছে সহজ, সরল একটুকরো হাসি। মেজরের অনেক গুণের কথা জানে পেন, কিন্তু তবু, অ্যাবওয়েরের একজন সিনিয়র অফিসারের ছদ্ম-পরিচয় নেবেন তিনি, ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

তাকে শিউরে উঠতে দেখেই বোধহয় ঘাড় ফেরালো রাহাত। 'শোনো, পেন। কাভার হিসেবে ওয়ার্ণার স্মীট কেঁচে গেছে। মেয়রের উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। কাজেই নতুন একটা আইডেন্টিটি দরকার আমার। অদ্ভুত, উদ্ভট, এসবের মধ্যে একটা জাদু আছে—সেই জাদু দেখিয়েই গোটা বলকান চষে বেড়িয়েছি আমি, সেই জাদু দেখিয়েই নিরাপদে গ্রীসে পৌঁছুতে চাই। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।'

কিছু বলতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো পেন। মেজরের চেয়ে দু'ধাপ নিচের লোক সে, ওকে পরামর্শ দেয়া তার সাজে না।

'রেকর্ড ভাঙতে হবে তোমাকে,' বললো রাহাত। 'এর

আগে বারো ঘণ্টার মধ্যে কাগজপত্র তৈরি করে দিয়ে আমাকে তুমি তাক লাগিয়ে দিয়েছো, কিন্তু আজ তার অর্ধেক সময়ও দিতে পারবো না তোমাকে। তুমি এখন চলে গেলেই আমিও বেরিয়ে পড়বো। বুখারেস্ট ছেড়ে যাচ্ছি আমি। কার্ডটা তুমি আমাকে গিউরগুতে ডেলিভারি দিচ্ছো। সেই সরাইখানার কথা মনে আছে তো, আমরা যেখানে এক ছুটির দিন দেখা করেছিলাম? বেলা-ন'টার মধ্যে কার্ডটা চাই আমার।'

'হয়তো দিতে পারবো, স্যার,' কথা বলার এটা নিজস্ব ভঙ্গি পেনের, যার অর্থ হলো কার্ড নিয়ে সকাল ন'টায় গিউরগুতে পৌঁছে যাবে সে।

'ভেরি গুড।'

'চেহারার বর্ণনা আর ফটো চেঞ্জ করতে হবে,' বললো পেন। 'তবে, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এমন কিছু কালি পেয়েছি আমি, কাজে লাগানো যাবে।' হঠাৎ মুখ তুলে মেজর রাহাতের চোখে তাকালো সে, নিঃশব্দে হাসলো। 'দ্বিতীয় কার্ডটাও বানিয়ে দিতে পারবো, স্যার। কে জানে, এটাও হয়তো দরকার লাগতে পারে আপনার।' বেডরুমের দিকে তাকালো সে। 'হের মেয়রকে কি ওখানেই রেখে যাচ্ছেন, স্যার?'

'না, দিন কয়েকের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যাবে ও। যা করার আমিই করবো। তুমি শুধু ওয়ার্ডরোবটা সরাতে সাহায্য করো আমাকে।' হঠাৎ যেন জরুরী একটা কথা মনে পড়ে গেছে রাহা-তের, কপালের ওপর ক্ষীণ একটু উঁচু হলো ভুরু জোড়া। 'ভাল কথা, এটাই তোমার শেষ কাজ। কার্ডটা আমাকে ডেলিভারি

দিয়ে নিজের পথ ধরে বাড়ি ফিরে যাও। তবে, ইচ্ছে করলে আমার লেঙ্গও ধরতে পারো।'

খানিক ইতস্তত করার পর অপ্রতিভ একটু হেসে বললো পেন, 'কাজে না বেরিয়ে কাজে জড়িয়ে পড়া, আমার নার্ভ ওটা সহ্য করতে পারে না, স্যার।'

চোখ টান টান করে জিজ্ঞেস করলো রাহাত, 'তুমি বলতে চাইছো ফেরার পথেও আমি বিপদ খুঁজে বেড়াবো?'

'এবং পেয়েও যাবেন,' বললো পেন। 'আরও তো অফিসার আছেন, কিন্তু আপনার মতো অস্বাভাবিক ঝুঁকি নিতে আর কাউকে দেখিনি আমি।'

'তোমার গলার আওয়াজ বলছে,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রাহাত, ঠোঁটে মুচকি হাসি লেগে আছে, 'তুমি আমার প্রশংসা করছো না।'

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বেডরুমের দিকে তাকালো পেন। বললো, 'লাশটা এখানে রেখে গেলেই কি ভাল হতো না, স্যার? কিংবা, আমাকে বললে আমিই তো ওটা সরাবার ব্যবস্থা করতে পারি। রেলইয়ার্ড থেকে লাইন দিয়ে বেরিয়ে আসছে জার্মান আর্মির ট্রাকগুলো, লাশ নিয়ে রাস্তায় বেরুনো চেহারায় উদ্বেগ, কথা শেষ করলো না।

'কেন?' জানতে চাইলো রাহাত। 'রেলইয়ার্ডে কি করতে গিয়েছিল ওরা?'

'জানি না। তবে, ওদিকে বোধহয় কিছু বোমা ফেটেছে।'

'ট্রাকগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারবো। কিন্তু মেয়রের কার্ড

যদি ব্যবহার করি, কিছু সময়ের জন্যে ওর নিখোঁজ থাকা দরকার। ওর লোকজন ওকে যতক্ষণ না পাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে ওর। তুমিও জানো, অ্যাবওয়ের অফিসার কাউকে কিছু না জানিয়ে যখন যেখানে খুশি কাজ করতে চলে যায়।'

'তা ঠিক, স্যার।' বলে উঠে দাঁড়ালো পেন। মনে মনে আশা করলো, হঠাৎ ওর এই উঠে দাঁড়ানো দেখে মেজর না আবার ভেবে বসেন, ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে চায় সে। জানতে চাইলো, 'ডিমোলিশন চার্জের স্টোর নিয়ে কি করবো আমি? টাইম ফিউজ ভেঙেচুরে দিয়ে ওখানেই রেখে দেবো?'

'ঝামেলা বাড়াবার কোনো দরকার নেই,' হাতঘড়ি দেখে চেয়ার ছাড়লো রাহাত। 'জার্মানদের হাতে ও-জিনিস নেই বললেই চলে, কিছু না হয় দিয়েই গেলে ওদেরকে। টাইম ফিউজ ভাঙতে গেলে সময় লাগবে, তারচেয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো কেটে পড়াই ভাল। এসো, ওয়ার্ডরোবটা ধরো, লাশটা বের করি।'

নিজের কাজ আর কাউকে করতে দেবেন না, এই হলো মেজর রাহাত। ওঁকে শ্রদ্ধা করার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ, আজ হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করলো পেন। মেজরের নার্ভ বোধহয় ইস্পাত দিয়ে গড়া। ডেভিস, ম্যানডেল, জনি সহ সাবোটাজ টিমের বাকি সবাই মারা গেছে, বেঁচে আছেন একা শুধু মেজর রাহাত। কে জানে, তিনি একা কাজ করতে অভ্যস্ত, সেটাই বোধহয় এর কারণ। রাহাতের পিছু পিছু বেডরুমে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলো পেন, মেজর রাহাতকে দেখে

মনে হয় না জার্মানীর সাথে মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে নেমেছেন তিনি। মনে হয়, জার্মানীর বিরুদ্ধে তিনি ব্যক্তিগত যুদ্ধে নেমেছেন। এবং না জেতা পর্যন্ত তাঁর অস্থিরতা কাটবে না।

বুখারেস্টের রাস্তা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। মেইন হাইওয়ে পেরিয়ে, নিচু একটা সাইড রোড ধরলো রাহাতের ফোক্সওয়াগেন। হাইওয়ে থেকে নেমে আসার সময় বেশ কয়েকটা আর্মি ট্রাক চোখে পড়লো ওর। ক্লান্ত শরীরটাকে যথাসম্ভব ঢিল করে দিল সে, কিন্তু মনের ধুকধুকানি তাতে কমলো না। জানে, খানিক পরই আবার তাকে মেইন হাইওয়েতে উঠতে হবে। এবার শুধু এপার থেকে ওপারে যাওয়া নয়, ওটা ধরেই এগোতে হবে তাকে।

পিছনের সীটে রয়েছে লাশটা। আর্মি কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেছে রাহাত। এখন যদি চেকিঙের জন্যে থামানো হয় ওকে, বেঢপভাবে কম্বলটা ফুলে আছে দেখেই সন্দেহ জাগবে চেকারের মনে। সীটের সামনে কোথাও, মেঝেতে, লাশটা রাখার মতো জায়গা নেই। কোনোরকমে যদি বা রাখা যায়, লাশ ঢাকা দেওয়া কম্বলটা আরও বিদঘুটে ভাবে ফুলে থাকবে। তারচেয়ে এই ভাল। চেকিঙের জন্য থামানো হলে বিপদ হবে, সেজন্যে উদ্বেগের অন্ত নেই রাহাতের।

তবু, খানিক আগের কথা মনে করে স্বস্তিবোধ করলো রাহাত। অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ফায়ার এস্কেপ দিয়ে নামতে হয়েছে ওকে। কাঁধে ছিল মেয়রের লাশ। কিভাবে যে নামলো ও, এখন ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগছে। লোহার সরু সরু ধাপগুলোয়

বরফ জমে ছিল। পা পিছলে যাবে এই ভয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আতংকের মধ্যে কেটেছে। নিচে নেমে এসেছে, এই সময় শুনতে পেল জানালা খোলার শব্দ। অথচ গা ঢাকা দেবে এমন কোনো জায়গা ছিল না আশপাশে কোথাও। তবু দাঁড়ায়নি রাহাত। ফাঁকা উঠান ধরে পিছনের গেটে চলে এসেছে। ওখান থেকে গাড়িতে পৌঁছুতে দশ মিনিট সময় নিয়েছে ও। এই দশ মিনিট দরদর করে ঘেমেছে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও।

এত কিছু করেছে, কিন্তু আসল কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও। লাশটাকে এমন কোথাও ফেলতে হবে যেখানে সহজে কারও চোখ পড়বে না।

হাইওয়েতে আর্মি ট্রাক আসা-যাওয়া করছে, ওগুলোকে এড়ানো গেলে বিপদের আশংকা অর্ধেক কমে যায়। চিন্তা-ভাবনা করে উপায় বের করবে, তা সম্ভব নয়, কারণ হাইওয়েতে না উঠতে পারলে তার পালাবার রাস্তা প্রশস্ত হবে না। আর হাইওয়েতে আর্মি ট্রাক থাকবে কি থাকবে না সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভাগ্যের ওপর।

দেখতে দেখতে সাইড রোডের শেষ মাথা কাছে চলে এল। সামনেই হাইওয়ে। সাইড রোডের শেষ মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামালো রাহাত। হাইওয়ের দু'দিক দেখলো। অন্ধকার। কোথাও হেডলাইটের কোনো আলো নেই। হাতঘড়ি দেখলো ও। ঠিক করলো, দু'মিনিট অপেক্ষা করবে।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, তবু রাস্তার কোনো দিকে কোনো গাড়ি নেই। সাইড রোডের মাথা থেকে হাইওয়েতে উঠে এল

ফোক্সওয়াগেন। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ছুটে চললো উত্তরে, রেল-ইয়ার্ডটা ওদিকেই। কম সময়ের মধ্যে পালাতে হলে এই সহজ রাস্তাটাই ব্যবহার করতে হবে ওকে। তাছাড়া, এই রাস্তা ধরে এগোলে খুব তাড়াতাড়ি খোলামেলা এলাকা পেয়ে যাবে ও। খুব একটা স্পীড তুললো না ও, কিন্তু মাঝারী স্পীডটা ধরে রাখলো, কম-বেশি হতে দিল না। রাস্তার দু'ধারে বহুতালা বিল্ডিং, লোহার ঝুল-বারান্দার কার্ণিশে তুষার জমে আছে। কিন্তু হেডলাইটের আলোয় একটা জানালাও খোলা দেখলো না ও। এরপর সামনে পড়লো নির্জন একটা চৌমাথা, মাঝখানে সাদা মার্বেল পাথরের স্ট্যাচুটাকে মনে হলো বরফের তৈরি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে গাছ, সবগুলোর পাতা আর ডাল ঢাকা পড়ে আছে তুষারে। এরপর বস্তী এলাকা।

শহরতলীতে পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ থেকে ঝিমুনি একটা ভাব অনুভব করছিল ও। ওর ইচ্ছে শক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বার-বার নিজের অজান্তেই বুজে আসছিল চোখ। কখনও এক সেকেণ্ডের জন্যে, কখনও তারও কম সময়ের জন্যে অসতর্ক, অসচেতন হয়ে উঠছিল ও। কেন এমন হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত ও। শরীর আর বশ মানতে চায় না। বারবার ঘড়ি দেখে ঝিমুনি ভাবটা কাটাতে চেষ্টা করলো। চারটে বারো, চারটে তেরো। মনটাকে খালি থাকতে দিল না, কিছু না কিছু একটা কাজ দিয়ে ব্যস্ত করে রাখলো। চারটে চোদ্দ। দেশের কথা মনে পড়ছে। স্বাধীনতা! কতদুর আর! জনাব চার্চিল, তোমাদের

যুদ্ধ আমরাও করছি। একটিমাত্র আশায়, তোমরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে !···চারটে পনেরো! কুকুরের ডাক এখনও বাজছে কানে। রেলইয়ার্ডে কতক্ষণ আগে ছিলাম আমি? কতক্ষণ আগে শুয়ে ছিলাম পেট্রল ওয়াগনের মাথায়? হিসেবে করো! ছু'ঘণ্টা!

সামনে বাঁক। ফোক্সওয়াগেন ঘুরতেই সামনে দেখলো জার্মান ট্রাক! এইমাত্র একটা সাইড থেকে বেরিয়ে এসেছে।

রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো, হেলেদুলে ঝাঁকি খেতে খেতে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ক্যানভাস মোড়া ট্রাক। ক্যানভাসের একটা প্রান্ত হঠাৎ বাতাসে ঝাপটা খেলো। হেডলাইটের আলো পড়লো ভেতরে। চকচক করে উঠলো লোহার ওপর রঙ করা হেলমেট। সৈন্য বোঝাই ট্রাক। সাইড রোডটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় কিছু দেখতে পায়নি রাহাত, সম্ভবত সাইড রোডের মাথার কাছাকাছি ভেতর দিকে কোথাও একটা বাঁক আছে, অন্যান্য ট্রাকগুলো বাঁক নেয়া শেষ করেনি তখনও। একটা হেডলাইটের আলো এসে পড়লো ফোক্সওয়াগেনের পিছনে। রিয়ারভিউ মিররে তাকালো রাহাত। এটাও একটা আর্মি ট্রাক। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে আসছে পিছু পিছু। তারমানে শত্রুদের মাঝখানে আটকা পড়েছে সে। এখন শুধু চিঁড়ে চ্যাপ্টা হতে বাকি।

এক মাইলের মধ্যে আর কোনো সাইড রোড নেই, জানে রাহাত। শহরতলী ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। ছু'পাশে নিচু, ফাঁকা মাঠ। ফোক্সওয়াগেন নিয়ে নেমে যাবে, তাও সম্ভব নয়। পিছনের ট্রাক ড্রাইভার সন্দেহ করবে। ঘাড় ফিরিয়ে চট করে

পিছনটা দেখে নিল ও। বিশ গজ পিছনে রয়েছে ট্রাক। একটু সামনে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে রাস্তা, বাঁক নিতে শুরু করে আবার একবার পিছনে তাকালো ও। জোড়া হেডলাইটের বিরাট একটা মিছিল দেখতে পেল ও। জার্মান ট্রাকের গোটা একটা কনভয়ের মাঝখানে আটকা পড়েছে ফোক্সওয়াগেন।

নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁত দিয়ে আরও জোরে কামড়ে ধরলো রাহাত। সামনের ট্রাকের সাথে সমান দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে একই স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে ও। চোখ স্থির হয়ে আছে লাল আলোর ওপর। রিয়ারভিউ মিরর থেকে ছিটকে এসে হেডলাইটের আলো লাগছে চোখে। এই কনভয়ের ফাঁদ থেকে বেরুতে পারবে তো! সাইড রোডটা কাছে চলে আসছে। ট্রাকগুলো নিশ্চয়ই ওর ভেতর ঢুকবে না। ঢুকলে হাইওয়ে ধরে সোজা এগোতে হবে তাকে।

সময়ের একটা চুলচেরা হিসেব করে নিল রাহাত। সাইড রোড এগিয়ে আসছে, সেই সাথে সামনের ট্রাকের সাথে ধীরে ধীরে দূরত্ব কমিয়ে নিয়ে আসছে ও। নির্জন বাঁকটা দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল। সামনের ট্রাকের পাঁচ ফিটের মধ্যে চলে এসেছে ফোক্সওয়াগেন। জানালা দিয়ে হাত বের করে পিছনের ট্রাককে সিগন্যাল দেবার ঝোঁক চাপলো, হাতটা জানালা দিয়ে বেরও করতে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে সাইড রোডের ভেতর দিকটা দৃষ্টির আওতায় চলে এসেছে—দেখলো, রাস্তাটার মাথা থেকে গজ বিশেক পিছনে আড়াআড়িভাবে একটা ব্যারিকেড ফেলা হয়েছে। ব্যারিকেডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন ইউনিফর্ম পরা

মিলিটারী পুলিশ। হাইওয়ের এদিকটায় কোনো সিভিলিয়ানের গাড়ি ঢুকতে দিতে চায় না, তাই এই ব্যবস্থা। ঘাড় ফিরিয়ে সাইড রোডের দিকে না তাকিয়ে সেটাকে পাশ কাটিয়ে এল রাহাত। ফাঁদ থেকে বেরুবার প্রথম রাস্তাটা বন্ধ, নতুন একটা উপায় খুঁজতে শুরু করলো ও।

এক মাইলটাক সামনে হাইওয়ে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকেরটা গেছে রেলইয়ার্ড, ডান দিকেরটা সমতল প্রান্তরে। ওটাও নিশ্চয় বন্ধ করে রেখেছে ওরা। তারমানে কনভয়ের সাথেই থাকতে হচ্ছে ওকে। অন্তত যতক্ষণ না সৈন্য বোঝাই ট্রাকগুলো রেলইয়ার্ডে পৌঁছাচ্ছে।

মনটা দমে গেল। মাত্র দু'ঘন্টা আগে রেলইয়ার্ডের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়ে এসেছে ও, আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে? ওখানে এখন জার্মান ট্রুপস গিজগিজ করছে। সিভিলিয়ান কোনো গাড়ি দেখলেই হয়তো চেক করার জন্যে থামাবে। রবার্ট পেনের কথা মনে পড়লো। লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছিল।

বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, কাজেই সতর্ক, সচেতন হয়ে ওঠার কথা রাহাতের। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো। ঝিমুনি ভাবটা ফিরে এল আবার। ইচ্ছেশক্তিতে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। তাকিয়ে আছে সামনের লাল আলোটার দিকে, সেটা যেন সম্মোহিত করছে ওকে। ব্যথা করছে কপাল। নাকে সর্দি, ভারি হয়ে আছে মাথা। হাল ছেড়ে দিতে চাইলো শরীর। এই ক্লান্তি আর অসুস্থতা আরও যেন বাড়িয়ে তুললো ট্রাক ইঞ্জিনের এক-

টানা, একেঘেয়ে, গোঁ গোঁ আওয়াজ। কপালে চিকন ঘাম দেখা দিল। চুরুট ফেলে দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ব্যথা অনুভব করতে চাইলো ও, তবু যদি ঝিমুনি ভাবটা দূর করা যায়। মাথাটা কাজ করছে এখনও। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার সম্ভাব্য একটা মাত্র উপায় আছে. বুঝলো ও। একটু একটু করে স্পীড কমাতে শুরু করলো। সেই সাথে সামনের ট্রাকের সাথে বেড়ে যেতে লাগলো ফোক্সওয়াগেনের দূরত্ব। কিন্তু পিছনের ট্রাক ড্রাইভার গতি মন্থর করার ওর এই প্রবণতা একটা সীমা পর্যন্ত সহ্য করবে।

একটা কৌশল কাজে লাগাতে শুরু করেছে ও, বোধহয় সেজন্যেই ঝিমুনি ভাবটা আপনা থেকে কেটে গেল। গতি কমিয়ে নিয়ে এসে সামনের ট্রাক থেকে ফোক্সওয়াগেনকে এখন সে বিশ গজ পিছনে রেখেছে। এই দূরত্ব বজায় রাখলো ও। যদিও প্রতিটি মুহূর্তে আশংকা করছে, এই বুঝি পিছন থেকে কর্কশ হর্ণের আওয়াজ এল। অবশ্য জার্মান ড্রাইভার হর্ণ নাও বাজাতে পারে; সিভিলিয়ানের ফোক্সওয়াগেনকে পিছন থেকে গুঁতো দিলেও কারও কিছু বলার থাকবে না।

রাস্তাটা দু'দিকে ভাগ হয়ে যাবার আগেই আরও একটা সাইড রোড পড়বে। ওটা ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলে হিসেবের মধ্যে ধরেনি রাহাত। কিন্তু এখন ভেবে দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করলো, রেলইয়ার্ডে যেতে না চাইলে সাইড রোডটা ওকে ব্যবহার করতেই হবে। ডান দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকতে হবে ওটায়, বেরুবার বা ঢোকার ওই একটাই মুখ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে খানিক দূর এগিয়েছে, রেল-ক্রসিং পেরিয়ে শেষ হয়েছে মস্ত

একটা খামারে।

সাইড রোডে ঢুকতে হলে পিছনের ট্রাক ড্রাইভারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে হবে। তা না হলে রেলইয়ার্ডে পৌঁছে রিপোর্ট করবে ড্রাইভার, নিঃসঙ্গ ফোক্সওয়াগেনকে ছেঁকে ধরার জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসবে জার্মান সৈন্য। ইতিমধ্যে রাহাত হয়তো সাইড রোড থেকে বেরিয়ে আবার হাইওয়েতে ফিরে আসবে, সেখানে ওকে পাবে না তারা, কিন্তু ফোক্সওয়াগেনের খোঁজে চারদিকে খবর পাঠানো হবে। ধরা পড়া তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হাইওয়েটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে সামনে। মনে মনে তৈরি হয়ে গেল রাহাত। জানে, সময়ের একটু হেরফের হলে সব ভেস্তে যাবে।

সামনের ট্রাকের আলো লেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এক সার গাছ। ড্রাইভারও হাইওয়ের সাথে ট্রাকটাকে ঘুরিয়ে নিতে শুরু করলো। মিররে তাকালো রাহাত, দেখলো হেডলাইট স্থির হয়ে আছে ওর চোখে। হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিল ও। চাকার কামড় খাওয়া জমাট তুষারের ওপর দিয়ে ছুটলো গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেকটা পিছিয়ে পড়লো পিছনের ট্রাক। মনে মনে প্রার্থনা করলো রাহাত, আবার না চাকা পিছলাতে শুরু করে। হাইওয়ের সাথে বেঁকে যেতে শুরু করলো ফোক্সওয়াগেন, স্পীড কমিয়ে আনলো রাহাত। সেই এক সার গাছ আলোকিত হয়ে উঠলো ওর হেডলাইটের আলোয়। তারপরই, মুহূর্তের জন্যে, পিছনের ট্রাক ড্রাইভারের চোখের আড়ালে পড়ে গেল ও। কাঠের গেটটা রাস্তার মুখে নয়, কিছুটা পিছিয়ে আছে। প্রথমে দেখ--

তেই পেল না রাহাত। তারপর চোখে পড়লো। সাথে সাথে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে সেদিকে বাঁক নিতে শুরু করলো ও। ঝড়ের গতিতে সামনে থেকে ছুটে এল কাঠের গেট। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো সেটা। স্পীড কমালো না রাহাত, ঝাঁকি খেতে খেতে স্যাঁৎ করে আবার একটা বাঁক নিয়ে পাথরের পাঁচিলের পাশে দাঁড়ালো। আলো নিভিয়ে দিল ও, কিন্তু ইঞ্জিন চালু রাখলো। এখন অপেক্ষা করে দেখতে হবে।

নতুন একটা চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখলো রাহাত। একটু পরই পাঁচিলের ওদিকে আলোর আভা দেখা গেল, তুষার ঝলমল করে উঠলো গাছের শাখা আর পাতায় পাতায়। হাইওয়ে বেঁকে গেছে, দেখতে পেয়ে স্পীড কমাতে শুরু করেছে ড্রাইভার। স্পীড খুব বেশি কমিয়ে আনলে বিপদ, ভাবলো রাহাত। ফোক্সওয়াগেনের চাকার দাগ চোখে পড়ে যাবে। তারপর দেখতে পাবে সদ্য ভাঙা গেট।

ড্রাইভিং সীটে নিঃসাড় বসে আছে রাহাত। চুরুটের গোড়াটা আরও জোরে কামড়ে ধরলো ও। হেলে দুলে এগোচ্ছে ট্রাকটা, স্পীড আরও কমে যাচ্ছে। ড্রাইভার কিছু সন্দেহ করেছে নাকি? ইঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে বদলে গেল, মনে হলো দাঁড়িয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই চাকার দাগ, ভাঙা গেট দেখে ফেলেছে! খপ করে দরজার হাতল ধরলো রাহাত, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল মনে মনে। কিন্তু জানে, হেডলাইটের আলো ওকে একবার পেয়ে গেলেই হলো, ড্রাইভারের কাজ হবে ওকে তখন শুধু অনুসরণ করা। পালাতে চেষ্টা করবে

বটে, ভাবলো রাহাত, কিন্তু পা দু'টো কতক্ষণ সহযোগিতা করতে পারবে বলা কঠিন। এই সময় ইঞ্জিনের আওয়াজ যেন বাড়লো একটু। গোঁ গোঁ করতে করতে ভাঙা গেটের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ট্রাকটা।

সাথে সাথে গাড়ি থেকে তুষার মোড়া মাঠে নেমে পড়লো রাহাত। ছুটলো আরেক দিকের পাঁচিল লক্ষ্য করে। পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সার গাছ, মাটিতে পড়ে রয়েছে কাঠের উঁচু গুঁড়ি। টর্চ নিভিয়ে একটা গুঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়ালো ও। ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঁকি দিল পাঁচিলের ওদিকে। হাইওয়ের যেদিক দিয়ে এসেছে ওরা সেদিকে হেডলাইটের লম্বা মিছিল দেখা গেল। এই মিছিল শেষ হতে সকাল হয়ে যাবে, গাড়িতে লাশ নিয়ে ততক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কনভয়ের গাড়িগুলো একটা আরেকটার সাথে সমান দূরত্ব বজায় রাখবে, এই রকম অর্ডার দেয়া থাকলেও, কেউ না কেউ পিছিয়ে পড়েই। এই কনভয়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাহাত লক্ষ্য করলো হেডলাই-টের চার এবং পাঁচ নম্বর সেটের মাঝখানে একটা গ্যাপ রয়েছে। এখন ব্যাটা পাঁচ নম্বর যদি আরও কিছুক্ষণ পিছিয়ে থাকে তাহলে কিছুটা আশা আছে, ভাবলো ও। এক ছুটে ফোক্সওয়াগনে ফিরে এল। ইতিমধ্যে প্রথম সেটের আলো পাঁচিলের মাথা আলোকিত করে তুলেছে। ঠিক পিছনেই রয়েছে দ্বিতীয় ট্রাক। তারপর তিন নম্বর আর চার নম্বর। এবার!

ঝাঁকি খেতে খেতে গেটের দিকে ছুটলো ফোক্সওয়াগেন। গেটের মুখে পৌঁছে রাস্তা খালি দেখলো রাহাত। মাঠ থেকে

বেরিয়ে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিল ও। দূরে দেখা গেল সামনের ট্রাকের রিয়্যার লাইট।

ফার্মের দিকে যেতে সাইড রোডটা খুব তাড়াতাড়ি কাছে চলে এল। বাঁক নেবার সময় ফেলে আসা হাইওয়ের দিকে তাকালো রাহাত। কোনো হেডলাইট নেই। বাঁকের কাছে এখনও পৌঁছায়-নি পাঁচ নম্বর ট্রাক। একশো গজ এগিয়ে একটা ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে রাস্তাটা, হাইওয়ে থেকে ফোক্সওয়াগেনের আলো চোখে পড়বে না। রাস্তার দু'দিকে সারি সারি জানালা দেখতে পেল রাহাত, কোথাও কোনো আলো নেই। পরবর্তী সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো ও। মেয়রকে ফেলা যায় কোথায়!

গরমের দিন হলে চিন্তা ছিল না, চারদিকে মাথা সমান উঁচু ঘাস থাকতো, লাশ লুকোবার অন্তত ডজনখানেক জায়গা পেয়ে যেত ও। কিন্তু এই শীতে জমাট তুষার লোহার মতো শক্ত হয়ে আছে, মাটি ফুঁড়ে মাথাচাড়া দিতে পারেনি ঘাস। বরফ খুঁড়ে লাশটা লুকিয়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু গর্তটা অনেক গভীর করে খুঁড়তে না পারলে শিয়াল-কুকুর সেটা সহজেই বের করে ফেলবে। বরফ খোঁড়ার যন্ত্রপাতি বা অত সময়, কোনোটাই নেই হাতে। আরও ভাল কোনো উপায় বের করতে হবে।

পাঁচ মিনিট পর ঢাল বেয়ে একটা ব্রিজের ওপর উঠতে শুরু করলো ফোক্সওয়াগেন। ব্রিজের নিচে দিয়ে রেলের লাইনগুলো চলে গেছে। দিনের বেলাতেই এলাকাটা নির্জন, ভূতুড়ে লাগে। রাস্তার দু'পাশে নিচু জলা-ভূমি। ব্রিজের পরই হঠাৎ বাঁক

নিয়েছে রাস্তাটা, বাঁক নিতে শুরুও করেছে রাহাত, এই সময় নিচে থেকে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ ঢুকলো কানে। ব্রিজের নিচে দিয়ে সম্ভবত একটা গুডস ট্রেন যাচ্ছে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে ব্রিজের শেষ মাথায় ফোক্সওয়াগন দাঁড় করলো রাহাত। ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে পড়লো। ব্রিজের রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে তাকালো নিচে।

কাছেই একটা হুড পরানো ল্যাম্প দেখা গেল। ঠিক নিচে দিয়ে এগোচ্ছে স্টীম ইঞ্জিন। অনেকগুলো খালি কয়লার ট্রাক টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা। রেলইয়ার্ডের পুব প্রান্তে কয়লার ডিপো আছে, সেখানে যাবে। বিস্ফোরণের ফলে ওদিকে কোনো ক্ষতি হয়নি। কয়লা ভরা শেষ হলে ট্রাকগুলোকে নিয়ে সোজা জার্মানীর লাইন ধরবে ইঞ্জিনটা। হঠাৎ করেই ক্লান্তি কাটিয়ে উঠলো রাহাত। উপলব্ধি করলো মাত্র বিশ ফিট নিচেই রয়েছে ওর সমস্যার রেডিমেড সমাধান।

ট্রেন ওখানে পৌঁছুতে যা দেরি সাথে সাথে ট্রাকে কয়লা ভরার কাজ শুরু হয়ে যাবে। ট্রাকগুলো এক এক করে এগিয়ে যাচ্ছে ওর নিচে দিয়ে। এগোবার গতি লক্ষ্য করলো রাহাত। দু'টো ট্রাকের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু মাপলো। ফোক্সওয়াগনে ফিরে এল ও। লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার চলে এল রেলিঙের সামনে। পরবর্তী ট্রাকটা এগিয়ে আসছে। সেটার মাঝখানটা ওর ঠিক পায়ের নিচে পৌঁছুতেই রেলিঙের ওপর দিয়ে নিচে ফেলে দিল লাশ। ট্রাকের পিছনটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রাহাত। লাশটা পড়লো, পড়লো

পরের ট্রাকের ঠিক মাঝখানে। পরমুহূর্তে লাশসহ ট্রাকটা হারিয়ে গেল ব্রিজের নিচে। ডঃ রিচার্ড মেয়র রওনা হয়ে গেল জার্মানীর পথে।

চার

মেয়র।

আইডেন্টিটি কার্ডের নামটা দেখামাত্র তুর্কী পাশপোর্ট কন্ট্রোল অফিসারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। কার্ডের পুরো ছকের ওপর চোখ বুলালো সে।

নাম : ডঃ রিচার্ড মেয়র।

ন্যাশনালিটি : জার্মান। ফ্লেন্সবার্গে জন্ম।

প্রফেশন : আর্কিওলজিস্ট।

বয়স : উনত্রিশ।

কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে অফিসার সারাজু কার্ডের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো, যেন তার সন্দেহ হয়েছে। তার পিছনে গোল্ডেন হর্ণ হারবার, একটা টাগবোট কোনো বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। সকালের তাজা বাতাসে ভর করে সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন গোটা ইস্তাম্বুলে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিবেশ সচেতন লোক সারাজু, সাগর তীরে

টেনশনের ভাবটা অনুভব করতে পারছে ঠিকই, কিন্তু টেনশনের কারণটা নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। রিস্টওয়াচে চোখ বুলালো সে। সাড়ে ছ'টা। খারাপ কিছু যখন ঘটে, এই রকম শীতার্ত সকালেই ঘটে।

'আপনি ব্যবসা উপলক্ষে ট্রাভেল করছেন?' জানতে চাইলো সে।

'আমি টার্কি ছেড়ে যাচ্ছি,' ঠোঁট থেকে ছোট একটা চুরুট নামিয়ে টোকা দিল মেজর রাহাত, দু'জনের মাঝখানে নিচু কাউণ্টারের ওপর পড়লো ছাইটুকু। অত্যন্ত স্মার্ট, সুবেশী এবং রাশভারি দেখাচ্ছে ওকে। বেল্ট দিয়ে আঁট করে বাঁধা লেদার কোট পরে আছে সে। গাঢ় রঙের নরম একটা হ্যাট রয়েছে মাথায়। সে যে বদরাগী, কথার সুরেই সেটা বুঝে নিল সারাজু। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যা বললো তার ভেতরের অর্থ হলো তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কাজেই তোমার মতো বুরোক্র্যাটের আমার সম্পর্কে এত কথা না জানলেও চলবে।

অস্বস্তি বোধ করলো সারাজু, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুকটা টান টান করলো সে, যেন বোঝাতে চাইলো, তোমরা জার্মানরা এই কিছুদিন হলো রুমানিয়া আর বুলগেরিয়া দখল করে নিলেও তুরস্ক এখনও নিরপেক্ষ দেশ। চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে দস্তানা পরা আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিল সে, কাউন্টার থেকে ফেলে দিল ছাইটুকু। কাউন্টারের কিনারা থেকে নিচে পড়লো সেটা, সোজা একেবারে রাহাতের পালিশ করা চকচকে বুটে। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে চোখ তুলে রাহাতের দিকে

তাকালো সারাজু। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পিছনে হাত বেঁধে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কাঁচ ভেদ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে হারবারে।

রাহাতকে খুঁটিয়ে দেখলো সারাজু। শরীরটা প্রকাণ্ড নয়, কিন্তু গঠন দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না এই লোক প্রচণ্ড শক্তি রাখে। শরীরের তুলনায় মাথাটা একটু বড়ই বলা যায়। চোয়াল রেখা বেশ উঁচু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর স্বাধীনচেতা মনোভাবের স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু সারাজুকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলো চোখ দুটো। গভীর কালো মণি, তাকাবার ভঙ্গিটা ধীর, যেন দৃষ্টিপথে যা কিছু পড়ে সব দেখে নিতে অভ্যস্ত। পরিচিত জার্মান এজেন্টদের এক-জন হতে পারে, ভাবলো সারাজু। কার্ডটা ফেরত না দিয়ে রাহাত-কে অপেক্ষা করতে বললো সে।

'ওই বোটটা ধরতে হবে আমাকে,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো রাহাত। 'টাটরা। কাজেই তাড়াতাড়ি করুন।'

কোনো জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সারাজু, একটা দরজা খুলে পাশের অফিস কামরায় ঢুকলো। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ফাইলিং কেবিনেট খুলে বের করলো একটা ফোল্ডার। এতে জার্মান এজেন্টদের গোপন একটা তালিকা আছে। তালিকায় মেয়র নামটা পাবার আশা করেনি, পেলোও না। ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের এক কোণে বসা যুবক কেরাণীর দিকে তাকালো সে।

'টাটরার সেইলিং শিডিউল বদলেছে কিনা জানো?'

'না, বদলায়নি। সাড়ে সাতটায় রওনা হবে। সেই আগের

ফেরী পথ, ইস্তাম্বুল থেকে জার্ভোস। কেন, স্যার?'

'তেমন কিছু নয়। তবে, এরই মধ্যে টাটরায় তিনজন জার্মান উঠেছে—আরেকজন উঠবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টারে। ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক, তাই না? যুদ্ধের এই পর্যায়ে এতগুলো জার্মান হঠাৎ গ্রীসে যাচ্ছে কেন?'

'গ্রীস জার্মানীর সাথে যুদ্ধ করছে না, শুধু ইটালীর সাথে করছে।'

'তা বটে। কিন্তু তাতেই তো পরিস্থিতিটা বিদঘুটে হয়ে উঠেছে।' রাহাতের কার্ডটা আবার একবার চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করলো সারাজু। 'জার্মানীর মিত্র ইটালীর সাথে আজ ছ'মাস ধরে যুদ্ধ করছে গ্রীস, অথচ এখনও জার্মানী নিরপেক্ষ থাকছে—বিদঘুটে নয়? কাল শুনলাম ব্রিটিশ ফৌজ নাকি গ্রীসে ল্যাণ্ড করছে। আমাদের একজন ক্যাপ্টেন ওদের ট্র্যান্সপোর্ট দেখেছে পিরিয়াসে। তারমানে, গ্রীসে জার্মান আক্রমণের আশংকা করছে ব্রিটিশরা।'

'আক্রমণ হয়তো ঠেকিয়েও দেবে,' বললো কেরাণী। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সে। রাহাতকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। 'আপনি বোধহয় ওর কথা বলছেন, স্যার? বাপরে, কি গম্ভীর চেহারা!'

জানালা দিয়ে সারাজুও তাকালো। হ্যাঁ, গম্ভীর বটে, কিন্তু ডঃ রিচার্ড মেয়র সম্পূর্ণ শান্ত, অস্থিরতা বা নার্ভাসনেসের কোনো লক্ষণই নেই তার মধ্যে। সারাজুর মন খুঁতখুঁত করার এটাও একটা কারণ। আরোহীদের কাগজপত্র যখন চেয়ে নেয়া হয়, তাদের

মধ্যে নির্দোষ লোকটিও অস্বস্তি বোধ করে, তার ডকুমেন্টে অজান্তে কোনো ভুল থেকে গেছে কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু ডঃ মেয়র অটল অনড় দাঁড়িয়ে আছে, যেন কাঠের একটা মূর্তি। শুধু মাঝে মধ্যে তার হাত উঠে যাচ্ছে মুখে, চুরুটে টান দিয়ে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়ছে শেডের দিকে। 'হ্যাঁ,' বললো সারাজু। 'ওই লোকটাই ডঃ রিচার্ড মেয়র। কার্ডে লেখা রয়েছে বয়স নাকি উনত্রিশ, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হয় আরও কম হবে। উনত্রিশ যদি হয়ও, জার্মান আর্মিতে নেই কেন?'

'জিজ্ঞেস করাটা বোধহয় উচিত হবে না,' বলে নিজের কাজে মন দিল কেরাণী।

ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করলো সারাজু, তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালো। কাউন্টারের সামনে ফিরে এসে দেখলো যে-ভাবে দেখে গিয়েছিল ঠিক সেভাবে, সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়র। হাত দুটো পিছনে বাঁধা। তাকিয়ে আছে হার-বারের দিকে। অন্তত বাইরে থেকে চেহারা দেখে মনে হলো, সারাজু ইচ্ছে করে দেরি করাতেও তার কোনো ভাবান্তর ঘটেনি। আরও আড়ষ্ট বোধ করলো সারাজু। কাউন্টারে কার্ডটা রাখলো সে।

'আপনি যেতে পারেন, ডঃ মেয়র। আপনার ভ্রমণ উপভোগ্য হোক।'

ঘাড় ফিরিয়ে কটমট করে অফিসারের চোখে তাকালো রাহাত, হাত বাড়িয়ে ধীরে সুস্থে তুলে নিল কার্ডটা। মানি-ব্যাগের ভেতর ভরলো সেটা। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা লক্ষ্য

করলো সারাজু। জার্মানদের পরিচিত ভঙ্গি। পা দুটো অনেক ফাঁক করা।

ওপরমহল থেকে কড়া হুকুম আছে, জার্মান ট্যুরিস্টদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র নম্র ব্যবহার করতে হবে, যাতে বার্লিন থেকে অভি-যোগ আসার কোনো কারণ সৃষ্টি না হয়। রাহাতকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে স্বস্তি বোধ করলো সারাজু। ঝট্ করে একটু মাথা ঝাঁকালো সে, সাথে সাথে রাহাতের একমাত্র ব্যাগটা তুলে নিল পোর্টার।

শেড থেকে বেরিয়ে গ্যাঙওয়ে ধরে জাহাজে উঠলো রাহাত। নিজের কেবিনে ঢুকে দরজার দিকে পিছন ফিরে পকেটে হাত ভরলো। মানিব্যাগ থেকে বখশিশের টাকা বের করলো। ঘুরে দেখলো, ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার। 'রাখো,' বললো রাহাত। যন্ত্রচালিতের মতো মেঝেতে ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো পোর্টার। কেন কে জানে, তার মধ্যেও কেমন যেন একটা নার্ভাস ভাব লক্ষ্য করা গেল। 'হাত পাতো।' হুকুম শুনে হাত পাতলো লোকটা। তার হাতে লম্বা একটা নোট গুঁজে দিল রাহাত। 'যাও।' নোটটার দিকে তাকাতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল পোর্টারের। এই বখশিশ তার এক হপ্তার বেতনের চেয়েও বেশি। কিন্তু মুখ তুলে রাহাতের দিকে তাকাবার বা ধন্যবাদ জানাবার সাহসটুকুও হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়া-তাড়ি, একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল সে কেবিন থেকে।

পোর্টার বেরিয়ে যেতেই কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল রাহাত। মন জুড়ে রয়েছে পরম একটা স্বস্তি। নিরপেক্ষ তুরস্কে পৌঁচেছে

সে। ফেরী বোট টাটরার কেবিনে এখন সে একা। খুব বেশি হলে আর ত্রিশ ঘণ্টা পর ছদ্ম পরিচয় বাদ দিয়ে নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে। সবাই জানবে, সে আসলে মেজর রাহাত খান। স্বদেশী কাউকে না পেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা একা নিজের সাথে কথা বলতে পারবে বাংলায়। ওয়াশবেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। দেয়ালে আটকানো আয়নার দিকে তাকালো। ইচ্ছে হলো গলা চড়িয়ে কিছু বলে নিজেকে, কিন্তু ইচ্ছেটার গলা টিপে মারলো। তুরস্ক শত্রু নয়, কিন্তু মিত্রও তো নয়। কাজেই অসতর্ক হওয়া সাজে না।

বুখারেস্টের ফ্ল্যাট ছাড়ার পর এই প্রথম রাহাতের পেশীতে ঢিল পড়লো। চেহারায় ওর নিজের প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে শুরু করেছে। মধুর একটুকরো হাসির ক্ষীণ আভাস দেখা গেল ঠোঁটে। জার্মান হ্যাট আর লেদার কোট পরে থাকলেও, টিউটনিক ইমেজটা খসে পড়েছে চেহারা থেকে।

জার্মান কাভার নিয়ে থাকা অস্বস্তি আর ক্লান্তিকর হলেও, নিরাপদে গ্রীসে না পৌছানো পর্যন্ত এর প্রয়োজন আছে। ওর সাথে জার্মান কাগজপত্র রয়েছে, হঠাৎ করে জাতীয়তা বদল করলে গ্রীক ক্যাপ্টেন ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও গ্রহণ করতে পারে। অন্তত আরও একটা দিন এবং রাত জার্মান আর্কিও-লজিস্ট ডঃ রিচার্ড মেয়র সেজে থাকতে হবে তাকে।

আয়নার সামনে থেকে সরে এল রাহাত। বিছানাটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্তি লাগলো। ঠিক এই সময় নক হলো দরজায়।

ক্লান্তির কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়লো। এখন যদি কোনো ইমার্জেন্সী দেখা দেয়, সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। কোটটা আর খোলা হলো না। পকেটে হাত ভরে ল্যুগারটা ধরলো ও, তারপর দরজার তালা খুললো। প্রথমে কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করলো। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্দি পরা একজন লোক। চীফ স্টুয়ার্ড, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না।

একজন জার্মানের মুখে সাবলীল উচ্চারণে গ্রীক ভাষা শুনে তাজ্জব বনে গেল চীফ স্টুয়ার্ড।

'কি চাই?' জানতে চাইলো রাহাত।

'স্যার! আপনি গ্রীক জানেন!' লোকটার চেহারায় প্রশংসা ফুটে উঠলো। 'একজন জার্মান ভদ্রলোক...আশ্চর্য!'

'আমি জিজ্ঞেস করছি, কি চাই তোমার?'

ঘাবড়ে গেল চীফ স্টুয়ার্ড। এ কেমন লোক, প্রশংসা করলে গায়ে মাখে না? রাহাতের চোখের ওপর দৃষ্টি পড়তে আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো সে। জার্মান লোকটা যেন তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানতে চাইলো সে, 'সব ঠিক আছে তো, স্যার?'

'সব ঠিক আছে কিনা সেটা তো আমি আসার আগেই তোমার দেখে রাখার কথা,' বললো রাহাত। 'আর কিছু?'

'না.. মানে, জানতে এলাম আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা,' হড়বড় করে বললো চীফ স্টুয়ার্ড। 'আপনার কিছু লাগলে আমাকে শুধু একবার ডাকবেন...'

দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে রাহাত, এইসময় লোকটার একটা কথা কানে যেন গরম লোহা ঢেলে দিল।

'আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে আপনার দেশের আরও তিনজন রয়েছেন জাহাজে...'

মুহূর্তের জন্যে ভুল বুঝলো রাহাত, ভাবলো স্টুয়ার্ড বোধহয় তিনজন বাঙালীর কথা বলছে। পরমুহূর্তে হুঁশ হলো। জানতে চাইলো, 'তিনজন? একসাথে?' প্রশ্নের-মধ্যে খুশির সুর ফোটাতে হলো, তা নাহলে মনের উদ্বেগ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

'না, স্যার,' বললো স্টুয়ার্ড। 'ওঁরা আলাদাভাবে ট্র্যাভেল করছেন। আমি তাহলে আসি, স্যার? ডাইনিংরুমে আছি, ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে, দরকার মনে করলেই আমাকে ডাকবেন।'

'ঠিক আছে,' অনেকটা ধমকের সুরে বললো রাহাত। 'রাখো এটা।' বলে মানিব্যাগ থেকে বের করে লম্বা দুটো নোট গুঁজে দিল লোকটার হাতে। 'শান্তিতে থাকতে চাই আমি, কাজেই নিজের ডিউটি ঠিকমতো করবে।'

স্টুয়ার্ডের মুখ ঝুলে পড়লো। টাকার ওপর থেকে মুখ তোলারও সময় পেল না সে, মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো রাহাত। একটু চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, স্টুয়ার্ডকে কাজে লাগাতে হবে। ইনফরমেশনের ভাল যোগানদার হতে পারে লোকটা। জার্মান আরোহীদের সম্পর্কে জানতে হবে ওকে। কিন্তু এখন নয়, পরে। এখুনি কিছু জিজ্ঞেস করলে বেশি আগ্রহ দেখানো হয়ে যাবে।

হ্যাট-কোট খুলে মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে গোসল করে নিল রাহাত। তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে, কিন্তু ভাবছে স্ট্যার্ডের কথাগুলো। তিনজন জার্মান। কে জানে, বিপদ হয়তো এখনও কাটেনি ওর ! ফিনিশিং টাচ বাকি রয়ে গেছে। ইস্তাম্বুলে পৌঁছে ভুলেও ব্রিটিশ লিগেশনের কাছেপিঠে যায়নি ও। কারণ, ওকে ফিরে আসতে দেখার আশায় অ্যাবওয়েরের হয়তো শুধু ব্রিটিশ এসট্যাবলিশমেন্টের ওপরই চোখ রেখে অপেক্ষা করছে। ওকে গ্রেফতার করবে, এখন আর সে উপায় নেই অ্যাবওয়েরের, কিন্তু খুন করতে বাধা কোথায় ?

অ্যাবওয়েরের প্রতিশোধকে ভয় পায় না ও, প্রতিশোধ নেয়ার চেয়েও বড় কারণে ওকে তারা জীবিত অবস্থায় মিত্রপক্ষের এলাকায় ফিরতে দিতে চায় না। রাহাত জানে, নিরপেক্ষ তুরস্কে বসেও অ্যাবওয়ের একজন এজেন্টকে টাটরায় পাঠাতে পারে। সেই এজেন্ট লোকটাকে জার্মানই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

রাহাতের মাথার ভেতর কিছু তথ্য রয়েছে, সেটাই ধ্বংস করতে চায় জার্মান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স। মাসের পর মাস বলকানে ছিল সে, চোখ খোলা রেখে অনেক গোপন অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট, স্টোরেজ ডিপো, সাপ্লাই রুট ইত্যাদি দেখেছে। নিজেদের এলাকা থেকে এই ইনফরমেশন বেরুতে দিতে চায় না ওরা।

তোয়ালে রেখে দিয়ে বিছানার দিকে তাকালো রাহাত, সাথে সাথে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। না, এটা আরাম করার সময় নয়, নিজেকে বোঝালো সে। বুখারেস্ট থেকে এখানে আসতে

বারোটা বেজে গেছে শরীরের। আটচল্লিশ ঘণ্টায় ঘুমিয়েছে বড়-জোর চার ঘণ্টা। তার অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা নিঃসন্দেহে কমে গেছে। একটু ঘুমিয়ে নিলে সবদিক থেকে ভাল হতো, কিন্তু তার আগে জাহাজটা ঘুরেফিরে একবার দেখে নেয়াটা জরুরী। গ্রীসে না পৌঁছানো পর্যন্ত ঘুমের কথা ভুলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

কাপড়চোপড় পরে গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট চাপালো রাহাত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে বার কয়েক পরীক্ষা করলো ল্যুগারের অ্যাকশন। আবার প্রফেশন্যাল হয়ে পড়লো ও। চেহারায় ফুটে উঠলো গুরু-গম্ভীর, থমথমে, বদমেজাজী জার্মানের ছাপ। আমি এখন ডঃ রিচার্ড মেয়র, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও। কোটের ভেতর ল্যুগার নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়লো। পাঁচ হাজার টনের গ্রীক ফেরীটা চেক করে দেখতে হবে।

ডেকে বেরিয়ে আসতেই হিম ঠাণ্ডা বাতাসে মুখটা যেন পুড়ে গেল রাহাতের। ডেক খালি দেখে বুঝলো, বাতাসের হামলা আছে বলেই ওপরে ওঠেনি কেউ। আধ ঘণ্টা পর, গোটা জাহাজে চোখ বুলানো শেষ করে, স্টার্ণের কাছে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো ও। এখান থেকে গ্যাঙওয়েটা দেখা যায়। লেট লতিফ যারা আসবে তাদেরকে দেখে রাখতে চায় ও। বলা যায় না, একেবারে হয়তো শেষ মুহূর্তে নিজেদের এজেন্টকে পাঠাবে অ্যাব-ওয়ের। রেলিঙে ভর দিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো, বাতাস বা আবহাওয়া তাকে যেন স্পর্শই করছে না। নতুন একটা চুরুট ধরালো, লাইফবোটের কাভারগুলো থেকে রাতের তুষার

এখনও গলে যায়নি। মাস্ট হেড রিগিঙে এখনও লেগে রয়েছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ বরফ। কিন্তু তোবড়ানো ফানেল থেকে সড়-সড় করে নেমে আসছে তুষার গলা পানি। ইঞ্জিনরুম থেকে বাষ্প উঠে আসতে শুরু করেছে।

জাহাজটা ঘুরে দেখে আসার সময় এমন ভাব করছিল রাহাত, যেন সদ্য আগত একজন আরোহী তার কৌতূহল মেটা-বার জন্যে এদিক সেদিক ঘুরেফিরে দেখছে, বিশেষ ভাবে কিছু লক্ষ্য করা তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ঘুরে বেড়াবার সময় যা যা আবিষ্কার করেছে তার একটা তালিকা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো এখন।

চীফ স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে জানা গেছে, টাটরায় ক্রু রয়েছে ছয়জন। ক্যাপটেনের নাম মোপাসু। মোপাসু নাকি গত চোদ্দ বছর ধরে ইস্তাম্বুল আর জার্ভোসের মধ্যবর্তী প্যাসেজ ধরে যাওয়া-আসা করছে।

ঘাড় না ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে ডান দিকে তাকালো রাহাত। বকবক করতে করতে এইমাত্র তার কনুইয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো চীফ স্টুয়ার্ড। চেহারায় সতর্ক ভাব থাকলেও, বেশ হাসিখুশি দেখালো তাকে।

'মনে হয় আরোহী যাদের আসার কথা ছিল তারা সবাই এসে পৌঁচেছেন, স্যার।'

বখশিশটা খুব বেশি দেয়া হয়ে গেছে কিনা, ভাবলো রাহাত। লোকটা ওর ছায়া হয়ে উঠেছে। রিস্টওয়াচ দেখলো ও। 'শেষ মুহূর্তে পৌঁছায়, এমন লোকের অভাব নেই,' বললো ও। আসলে

কথা বলাতে চায় লোকটাকে, যদি আরও তথ্য পাওয়া যায়।

'না, স্যার, আর কেউ আসবে না। ফোনে টিকেট অফিসের ম্যানেজারের সাথে কথা হয়েছে আমার। এই ট্রিপের জন্যে টিকেট বিক্রি করেছে সাতটা, কাজেই আর কারও আসার সম্ভাবনা নেই।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকালো রাহাত। আলাপের মুড নেই, বুঝতে পেরে বিদায় নিয়ে কেটে পড়লো স্টুয়ার্ড। আবার একা হয়ে, আবিষ্কারগুলো স্মরণ করলো রাহাত। জাহাজে আরও রয়েছে দু'জন ব্রিটিশ নাগরিক। একজনের বয়স বিশ-বাইশ, আরেকজনের চব্বিশ-পঁচিশ। দু'জনের কাউকেই এখনও দেখেনি ও। লক্ষ্য করতে ভুল করেনি, দু'জনের বয়সই সামরিক বাহিনীতে যাবার অনুকূলে। আরোহীদের মধ্যে একজন মাত্র গ্রীক আছে, জার্ভোসে বসবাস করে। ওখানে যেসব সন্ন্যাসী থাকে তাদের সাথে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক আছে লোকটার। এর বয়সও সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার অনুকূলে। তবে লোকটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে, রাহাতের ধারণা গ্রীক আর্মিতে তাকে না নেবার সেটাই বোধহয় কারণ। এরপর, সবশেষে, তিনজন জার্মান।

দু'জনকে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে দেখেছে রাহাত। দুই সিভিলিয়ানেরই পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে বয়স, চেহারা দেখে মনে হয় ব্যবসায়ী। কিন্তু তিন নম্বর জার্মান, যার নাম বেন ফকার, যতদূর জানা গেছে ভোর অন্ধকার থাকতে বোটে এসে উঠেছে, এবং সেই থেকে নিজের কেবিনের দরজা বন্ধ করে

রেখেছে। তার সাথে নাকি একটা কেবিন ট্রাঙ্ক আছে। ট্রাঙ্কের কথাটা বলার সময় স্টুয়ার্ডের চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গিয়েছিল, প্রশ্ন করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেছিল রাহাত।

'এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে ? কেবিনে যে-কেউ ট্রাঙ্ক নিয়ে ঢুকতে পারে।'

'কিন্তু স্যার, ওটা যে বিরাট একটা ট্রাঙ্ক! দেখলে তবে বুঝতেন। এত করে বললাম, দিন, হোল্ডে রেখে আসি, কিন্তু কোনোমতে রাজি হলো না!' সবজান্তার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল স্টুয়ার্ডের চেহারায়। 'বুঝলাম, নিশ্চয়ই খুব দামী কিছু আছে ওতে।'

দামী কিছু ? স্টুয়ার্ডের কথাটা মনে পড়ে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠলো রাহাতের। গোল্ডেন হর্ণ হারবারে চোখ ফেলে ছোট বোট আর কোস্টারগুলোকে দেখার সময় এই কেবিন ট্রাঙ্ক ওর মন জুড়ে থাকলো। ঠিক এই সময় মৃদু একটা আওয়াজ পেল পিছনে। ঘাড় ফেরালো না ও। যেমন সাগরের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকলো। দূর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এল, তাকালো কাছের একটা বোটের ওপর। মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এও কি সম্ভব, এই শেষ মুহূর্তে ওকে খুন করার চেষ্টা করা হবে, ফেরী ছাড়তে আর যখন মাত্র মিনিট কয়েক বাকি ? চোখের কোণে ধরা পড়লো একজন লোক। -সেই খোঁড়া গ্রীকটা। পা টেনে টেনে হাঁটছে। লোকটার নাম পাপাগোপালা। খুব সামান্য খোঁড়ায় সে, কিন্তু খোঁড়া হলেও, রাহাতের ধারণা, যে কোনো

আর্মির জন্যেও একটা সম্পদ হতে পারে। মাঝারী আকৃতি, কিন্তু বেশ মোটাসোটা, দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি রাখে গায়ে। কাঁধ দু'টো ভীষণ চওড়া, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বুক। গায়ে রঙচঙে ছিট কাপড়ের শার্ট। বিলাসী বা ধনী, কোনোটাই হয়তো নয়। টাইটা পুরনো হয়ে গেছে, জুতো জোড়া তোবড়ানো। স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে পাপাগোপালার দুর্লভ একটা গুণের কথা জানা গেছে। জার্ভোসের সন্ন্যাসীরা ওকে ইংরেজী শিখিয়েছে।

রাহাতের একেবারে কাছে চলে এসেছে পাপাগোপালা। চোখের চারপাশ কুঁচকে আছে, সতর্ক দৃষ্টি।

'বোট ছাড়ার সময় যতোই এগিয়ে আসে, ততোই আস্তে চলতে শুরু করে ঘড়ির কাঁটা, কি বলেন?' এইভাবে আলাপ শুরু করলো লোকটা। 'তা, জার্ভোসে এর আগে আপনি কখনও গেছেন নাকি?'

'একবার,' গ্রীক ভাষায় বললো রাহাত, তারপর আবার হারবারের দিকে ফিরিয়ে নিল চোখ। এই এক পলক তাকিয়েই অপরিচিত লোকটা তার কত কি লক্ষ্য করে নিয়েছে জানতে পারলে অবাক হয়ে যেত পাপাগোপালা। মুখের শক্ত কঠিন চেহারা, উঁচিয়ে থাকা চোয়ালের হাড়, ঘন গোঁফ, লম্বা জুলফি আর কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে তাকে ডাকাত অথবা গরিলা বলে মনে হয়। বলকানে পা ফেলার পর থেকে এই রকম নিষ্ঠুর চেহারার লোক এই প্রথম দেখলো রাহাত। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলো, ওর সাথে গ্রীক ভাষায় কথা বললো পাপাগোপালা।

তারমানে হয় সে ওর আর স্টুয়ার্ডের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছে, নয়তো স্টুয়ার্ড তাকে জানিয়েছে গ্রীক ভাষা বলতে পারে এমন একজন জার্মান আছে জাহাজে।

'লক্ষণ ভাল নয়,' বলে এবার নিয়ে তিনবার আকাশের দিকে তাকালো পাপাগোপালা। 'আবহাওয়া খারাপ হবে।'

'কিভাবে বুঝলে?' ধমকের সুরে জানতে চাইলো রাহাত। কিন্তু পাপাগোপালাকে সেটা স্পর্শ করলো বলে মনে হলো না। বললো, 'ওই যে, পাখিগুলোর দিকে তাকান।' আকাশের দিকে একটা হাত তুললো সে।

ঝাঁক ঝাঁক সীগালের বিরাট একটা মেঘ সাদা মাথার গম্বুজ আর মিনারের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বললো রাহাত, 'হারবারের মাথায় পাখি তো থাকবেই।' গলার সুরে বিরক্তি। কিন্তু আগ্রহের সাথে পাপাগোপালার লোমশ, পেশীবহুল হাত দু'টো লক্ষ্য করলো ও। রেলিংটা সহজভাবে ধরে আছে, কিন্তু তাতেই মনে হলো, একটু চাপ দিলেই পাটখড়ির মতো মট্ করে ভেঙে যেতে পারে ওটা।

'তা থাকে, কিন্তু এই রকম অগুণতি নয়। তাছাড়া, দেখছেন না, কেমন অস্থির হয়ে আছে ওরা?' পাপাগোপালার নিষ্ঠুর চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'জার্ভোসের ওপর একবার ওদেরকে এই রকম চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখেছিলাম, সেবারই তো সেই ভয়ানক তুফানটা এল।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'উঁহুঁ, মন বলছে, এবারের যাত্রায় কপালে খারাবী আছে। দেখবেন, কাটায়রায় আমরা ল্যাণ্ড করার আগেই ঝড় শুরু হবে।

ঠেলে জার্ভোস থেকে সরিয়ে না নিয়ে গেলেই হয় এখন।' বলে চললো সে, 'গাল্‌ফে ঢোকার পথটা ভীষণ সরু। কেপে তো শয়ে শয়ে জাহাজ তলিয়ে গেছে।' নিষ্ঠুর হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। দাঁতগুলো ঝকঝকে, মুক্তোর মতো সাদা। 'এসব তো আপনি জানেনই, একবার যখন গেছেন ওখানে।'

কিছু না বলে কাঁধ ছুটো সামনে ঝুঁকিয়ে পানিতে ফেলে দিল রাহাত চুরুটটা। জেটি বরাবর, ছ'টো জাহাজ পরে, আরেকটা জাহাজ রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাদা ফানেলের মাথথোকে হুহু করে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে রাহাত, পিছন থেকে শব্দ পেল ও। চলে যাচ্ছে পাপা-গোপালা, একটা পা একটু দেরি করে পড়ছে। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে আর কাউকে খুঁজতে যাচ্ছে, যে তার বকবকানি শুনবে। পকেট থেকে একটা সিঙ্গেল লেন্স ফিল্ড গ্লাস বের করে চোখে তুললো রাহাত। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে ধোঁয়ার নিচে জাহাজটার দিকে তাকালো। মাস্টহেডে রুমানিয়ার পতাকা পত পত করছে। জাহাজটার নাম জানে রাহাত—রুপেসকু। রুপে-সকুর ডেক একেবারে খালি, কেউ নেই। আশ্চর্য একটা ব্যাপার। যে জাহাজ রওনা হতে যাচ্ছে তার ডেক কখনও খালি থাকতে দেখেনি রাহাত। গ্যাঙওয়েের মাথায় ছ'জন লোককে দেখা গেল, তাদের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে, ওরা যেন পাহারা দিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, একটু পরই সী অফ মারমারা এবং ডারডানেল্‌স্‌ ধরে টাটরাকে অনুসরণ করবে রুপে-সকু। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগলো রাহাত খানের।

স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে জানা গেছে, রুপেসকু অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন মটর ভেসেল। বারো ঘন্টা আগে বেরিয়ে এসেছে বুলগেরিয়ার পোর্ট ভার্ণা থেকে। পরিস্থিতি একটু ঘোলাটে হয়ে উঠতে পারে, কারণ রুপেসকু নাকি ঈজিয়ান ধরে এগোবে। রুমানিয়া এখন জার্মানীর দখলে, কাজেই টেকনিক্যালি রুপেসকুকে শত্রুর জাহাজ বলে ধরে নিতে পারে মিত্রপক্ষ। সন্দেহ নেই ইস্তাম্বুল থেকে ব্রিটিশ লিগেশন এরই মধ্যে স্ট্রেইটে ওটার উপস্থিতির কথা ওয়ায়েরলেসের সাহায্যে জানিয়ে দিয়েছে ঈজিপ্টকে। কিন্তু ব্রিটিশ নেভী রুপেসকুকে সীজ করবে কিনা সে-ব্যাপারে রাহাতের মনে সন্দেহ আছে। রুমানিয়ার সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটিয়েছে ব্রিটিশ সরকার, কিন্তু তার সাথে এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

যা দেখলো, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেল না রাহাত। চোখ থেকে নামিয়ে পকেটে রেখে দিল গ্লাস, পরমুহূর্তে টান পড়লো পেশীতে—গ্যাঙওয়ে ধরে ছুটে জাহাজে উঠে আসছে একজন লোক। লোকটার পরনে ঢিলেঢালা, নোংরা কাপড়, বগলে একগাদা খবরের কাগজ। রাহাতের সামনে এসে থামলো লোকটা। আগেই পয়সা বের করেছে রাহাত, একটা কাগজ কিনলো ও। ভাঁজ খুলে শুধু হেডিংটা দেখলো—হামলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে জার্মান সৈন্য ?

নিচে নেমে এল রাহাত। সরু কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে এগোবার সময় ইঞ্জিনের সমান একটানা গম্ভীর আওয়াজ শুনলো ও। শান্তভাবে সেলুনে ঢুকলো। ছোট একটা কামরা, সেগুন কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা দেয়াল। এরই মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে

গেছে। এককোণে একটা খালি আর্ম চেয়ার দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোলো রাহাত। চেয়ারে বসে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলো ও। পড়ার ভান করে কামরার তিন দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সরু, ছুঁচোমুখো মুলার। একজন জার্মান। বয়স প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, আবার আন্দাজে ভুলও হতে পারে রাহাতের—তোবড়ানো মুখ, বয়স যা তার চেয়ে বেশি দেখায়। সস্তাদরের একটা স্যুট পরে আছে লোকটা। দেখে মনে হয় ব্যবসায়ী। কামরার এক কোণে বসে আছে সে, একমনে চুরুট ফুঁকছে। আরেক কোণে আরেক-জন জার্মানকে দেখলো রাহাত। মুলারের ঠিক উল্টো চেহারা এর। বিশাল কাঁধ, মাথাটা প্রকাণ্ড, কিন্তু বেঁটেই বলা যায় তাকে, টেনেটুনে চার ফিট দশ ইঞ্চির বেশি হবে না। বেশ দামী আর সুন্দরভাবে কাট-ছাঁট করা কাপড় পরেছে সে। টাইপ করা একটা কাগজ পড়ছে। এর মুখেও চুরুট। এ নিশ্চয়ই ফ্র্যাংক। ঘরের চার নম্বর কোণে ছোট্ট একটা বার, তার পিছনে সাদা উর্দি পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ফর্সা ন্যাকড়া দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে একটা গ্লাস পরিষ্কার করছে।

জার্মান দু'জনকে মিশুক বা সামাজিক বলে মনে হলো না, কাজেই আন্দাজ করে নিল রাহাত, আলাপ করতে গেলে নিরাশ হতে হবে ওকে। আরও কিছুক্ষণ কাটলো, কিন্তু এর মধ্যে জার্মান দু'জন কেউ কারও সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, পরস্পরের দিকে ভুলেও একবার তাকালো না। ছোট্ট কামরা, কেউ গা চুল-কালে বা জোরে নিঃশ্বাস ফেললে সবাই শুনতে পাবে, অথচ কাম-

রার ভেতরে কবরের নিস্তব্ধতা। কিছুই ঘটছে না, সেটাই পরিস্থিতির মধ্যে উত্তেজনা এনে দিয়েছে। প্রত্যেকে নির্লিপ্ত থাকার ভান করছে, কিন্তু আসলে যেন কিছু একটা ঘটবে বলে অপেক্ষা করছে সবাই। এই সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভারি কবাট দুটো নিস্তব্ধ কামরার ভেতর বোমা ফাটার মতো আওয়াজ করলো। দু'জন লোক ঢুকলো সেলুনে। একজনের পায়ের সাথে আরেকজনের পা বেধে গিয়েছিল, সামনের জন হোঁচট খেয়ে পড়েছে দরজার গায়ে। ওদের প্রথম কথাটাই সাবধান করে দিল রাহাতকে। বুঝলো, ওরা ব্রিটিশ।

'দুঃখিত, গ্রীণ,' শান্ত গলায় বললো ম্যালোরি। 'তোমার হাঁটার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, সেজন্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। ভদ্রলোকেরা মেপে পা ফেলেন, কখনও কমবেশি হয় না। তুচ্ছাই, হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলে কি মনে করে?' হোঁচট খেয়ে এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে গ্রীণ, সেলুনে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

ফিসফিস করে বললো গ্রীণ, 'ওরা···ওদেরকে দেখেছেন, স্যার? ব্যাটারা জার্মান!'

'তাতে কি?' চাপা গলায় ধমক দিল ম্যালোরি। 'ওদের মতো আমরাও গাঁটের পয়সা দিয়ে টিকেট কেটেছি। ঢোকো! আর, ফের যদি আমাকে 'স্যার' বলো, তোমার আমি···'

চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে সোজা বারের দিকে এগোলো গ্রীণ, কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে খালি একটা টেবিল

দেখতে পেয়ে আর এগোলো না, সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। তার সামনের চেয়ারটায় বসলো ম্যালোরি।

স্টুয়ার্ড রাহাতের অর্ডার নিয়ে গেল। একটু পরই এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে ফিরে এল সে। রাহাতের দিকে বার দুয়েক তাকালো গ্রীণ, তারপর ফিসফিস করে বললো ম্যালোরিকে, 'ও শালাও জার্মান।'

'সুরত দেখেই বোঝা যাচ্ছে,' বললো ম্যালোরি। 'এই যুদ্ধটা, বুঝলে গ্রীণ, মাঝে মধ্যে ভারি মজার হয়ে ওঠে।'

অবাক হয়ে ভাবলো গ্রীণ, যুদ্ধ মানে রক্তপাত আর জীবন-নাশ, এর মধ্যে উনি মজাটা দেখছেন কোথায়? যুদ্ধ তার নিজের ভাল লাগে না, যদিও কথাটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয় না সে। সে ভীতু, তা নয়। কিন্তু খুব বড় যোদ্ধা হবার স্বপ্ন সে কখ-নোই দেখে না। কিন্তু স্যারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এতোই তার শেখার আগ্রহ, যা দেখে সব যেন গিলে খেয়ে ফেলতে চায়। কিছু নিয়ম কানুন, কিছু ট্রেনিং, ব্যাস, শেখা হয়ে গেল যুদ্ধ। অন্তত তার কাছে ব্যাপারটা এর বেশি কিছু না। কিন্তু স্যারের চিন্তাধারা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ভদ্রলোক সাং-ঘাতিক উচ্চাভিলাষী, ভবিষ্যতের নিজেকে ছোট করে ভাবতে পারে না।

চুটকি বাজিয়ে স্টুয়ার্ডকে ডাকলো গ্রীণ। শান্ত এবং স্বাভা-বিক লাগছে তার। কিন্তু ম্যালোরির দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলো, ভদ্রলোকের পেশীতে টান পড়েছে। কিছু না দেখার ভান করে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে গ্রাস করছে হাড়-মাংসভেদী দৃষ্টি

দিয়ে। স্টুয়ার্ড চলে যেতেই আগের কথার খেই ধরলো গ্রীণ, 'কথাটা কি মনে করে বললেন আপনি?' জানতে চাইলো সে। তাকিয়ে আছে রাহাতের দিকে।

'কোন্ কথাটা?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ম্যালোরি।

'সুরত দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানে?'

'দেখছো না, কেমন বদরাগী চেহারা,' বললো ম্যালোরি। 'শুধু তাই নয়, কপালটা লক্ষ্য করো, লক্ষ্য করো মাথাটা। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক ও, গ্রীণ। শুধু নির্মম নয়, সেই সাথে বুদ্ধিমানও। এই টাইপের লোকেরাই সবচেয়ে ভয়ংকর হয়!' আরও হয়তো কিছু বলতো ম্যালোরি, কিন্তু স্টুয়ার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল সে।

'দুটো বিয়ার আর দু'পেগ হুইস্কি,' অর্ডার দিল গ্রীণ। ইচ্ছে করেই গলা চড়ালো, কামরার সবাই যাতে শুনতে পায়। স্টুয়ার্ড তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে গম্ভীরদর্শন জার্মানের দিকে আঙুল তুলে দেখালো, বললো, 'ওই যে, ওখানে ওকে যা দিয়েছো—বিয়ার, বিয়ার!'

সেলুনের অপর দু'জন জার্মান মুখ তুলে তাকালো গ্রীণের দিকে, কিন্তু সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল তারা। কিন্তু রাহাত খান চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে কঠোর, ভীতিকর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে।

'রাগ আর টগবগে রক্ত ভর্তি একটা ঝুড়ি,' রাহাতের দিকে চোরা চোখে একবার তাকিয়ে নিচু গলায় বললো গ্রীণ। 'ওর সাথে আমার যদি লিবিয়ায় দেখা হতো, ব্যাটার কপালে খারাবী

ছিল। যুদ্ধ না থাকলেও শালার নাকে গুণে গুণে হাফ-ডজন পাঞ্চ কষতাম। তারপর অবশ্য আপনার পেছনে লুকাতাম আমি। তবে জানি, তখন আপনি ওকে তুলোধোনা করে ছাড়তেন।'

প্রশংসাটা স্পর্শ করলো না ম্যালোরিকে। চোখ, কান, মন, মাথা সব চালু করে দিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইছে সে। ঘড়ঘড় যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল, সম্ভবত তুলে নেয়া হলো গ্যাঙওয়ে। চোখের কোণ দিয়ে দেখলো সে, ছুঁচোমুখো একজন জার্মান একটা বইয়ের ভেতর নাক ডুবিয়ে তুনিয়াদারি সম্পর্কে কোনো ধারণা না রাখার ভান করছে। কামরার আরেক কোণে দেখলো একজনকে, টাইপ করা কাগজে পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখছে আপনমনে, এটাই যেন তার সাধনা। দেখে-শুনে মনে হতে পারে, শান্তি-পরিস্থিতিতে সাগর-ভ্রমণে বেরিয়েছে তারা। মনে হতে পারে, ইস্তাম্বুল থেকে যুদ্ধ অনেক, অনেক দূরে।

'কিছু একটা ঘটবে, বুঝলে, গ্রীণ,' বললো ম্যালোরি। 'এটা আমরা একটা গ্রীক ফেরীতে রয়েছি, যাবো জার্ভোসে। হিটলারের জার্মানীর সাথে মরণপণ যুদ্ধ চলছে আমাদের। মজার ব্যাপার হলো গ্রীকরা যুদ্ধ করছে ইটালীর সাথে, জার্মানীর সাথে নয়, তাই তিন তিনজন জার্মানের সাথে আমরা থাকতে পারছি। ওরা বা আমরা, একদলের সাথে যদি আরেক দলের দেখা হয়ে যায় করিডোরে, পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাওয়া চলবে না। এই ট্রিপের কথা ভুলবো না, স্মৃতিকথা লেখার সময় কাজে লাগবে।'

'কিন্তু স্যার...'

কথা শেষ করতে পারলো না গ্রীণ, পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে নিঃশব্দে হজম করলো ব্যথাটা।

'গ্রীণ,' নিচু গলায় বললো ম্যালোরি, 'গ্রীসে না ফেরা পর্যন্ত ভুলে যাও আমি একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আর তুমি একজন স্টাফ সার্জেন্ট। মনে করো, আমরা সিভিলিয়ান। তুমি যদি স্যার স্যার করতে থাকো, লোকের মনে সন্দেহ দেখা দেবে।'

সবে কমিশন পেয়ে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হয়েছে তো, নিয়ম কানুন একটু বেশি বেশিই মানবে তাতে আর আশ্চর্য কি!— মনে মনে ভাবলো গ্রীণ। মুখে বললো, 'ইয়েস, স্যা···ইয়েস, মিঃ ম্যালোরি।'

'আর মনে রেখো, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাদের,' বললো ম্যালোরি। 'এই মুহূর্তে আমরা দু'জন যুদ্ধে নেই বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিপদ হতে পারে না। ওদের তরফ থেকে বিপদ আসবে, শুধু এই কথা বোঝাতে চাইছি না, আমাদের তরফ থেকে ওদের বিপদ হতে পারে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে।'

'মিঃ ম্যালোরি?' হতভম্ব দেখালো গ্রীণকে।

'চোখ কান খোলা রাখো,' কঠিন সুরে স্মরণ করিয়ে দিল ম্যালোরি।

গ্রীণ লক্ষ্য করলো সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের চেহারায় চাপা উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। সদ্য কমিশন পেলে কি হবে, দায়িত্ব সম্পর্কে এখনও আনাড়ী এবং অজ্ঞ হলে কি হবে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার ঝোঁকটা তার মধ্যে প্রবল।

সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখতে চায়। সুযোগ আছে দেখলে বুদ্ধি খাটিয়ে ফায়দা আদায় করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। না, সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ব্রায়ান ম্যালোরিকে চিনতে ভুল করেনি সে। লোকটা জন্ম-যোদ্ধা। নিজেকে নিয়ে অনেক বড় আশা তার। একদিন হয়তো সত্যি সত্যি বীরত্বের কিছু একটা করে নেপোলিয়নের মতো খ্যাতি পেয়ে যাবে। কিছুই বলা যায় না। লোকটার বুদ্ধি আছে, সমস্যার ভেতরটা পর্যন্ত দেখার চোখ আছে। এ লোকের হবে। পরমুহূর্তে নিজের কথা ভাবলো সে। জানে, তার হবে না। সে-জন্যে তার মনে অবশ্য কোনো খেদও নেই। খুব বড় যোদ্ধা হওয়া তার অ্যামবিশন নয়, কোনোদিনই ছিল না।

স্টুয়ার্ড ওদের পানীয় দিয়ে গেল।

'আপনি তখন বললেন, কিছু একটা ঘটবে,' বললো গ্রীণ। 'ঠিক কি বোঝতে চাইলেন, মিঃ ম্যালোরি ?'

চেহারা একটু লালচে হয়ে উঠলো ম্যালোরির। একটু থেমে বললো, 'না, মানে, কিছু বুঝে বলেছি তা নয়। এমনি, মানে, আমার মন বলছে আর কি।'

হাসি চেপে চেহারাটা গম্ভীর করে তুললো গ্রীণ। বললো, 'মনের কথা অনেক সময় ফলে যায়। কি বলছে আপনার মন ?'

গ্রীণ গাম্ভীর্যের ভান করলেও আসলে যে বিদ্রূপ করছে, সেটা ধরতে পারলো ম্যালোরি। আরও লাল হয়ে উঠলো তার চেহারা। কিন্তু এখন চুপ করে থাকা মানে স্টাফ সার্জেন্টের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া। কাজেই মনের অনুভবটা সহজ সরল ভাষায় বলে গেল সে, 'মনে হচ্ছে এমন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তাতে

করে অন্তত এই এলাকায় যুদ্ধের মোড় হয়তো ঘুরে যাবে। আমি বলতে চাইছি, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু একটা ঘটানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন শুধু কাজটা করা বাকি।'

'এবং আপনার ধারণা,' আবার হাসি চেপে জানতে চাইলো গ্রীণ, 'যা ঘটবে তাতে আমাদের বিরাট কোনো ভূমিকা থাকবে?'

হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ম্যালোরির চেহারা। বললো, 'তোমার কোনো ভূমিকা থাকবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমার যে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকলো গ্রীণ। 'খুবই চিন্তার কথা তাহলে। তা, মিঃ ম্যালোরি, হঠাৎ এই রকম একটা কথা আপনার মনে হলো কেন?'

'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে,' বললো ম্যালোরি। 'মিলিটারী মিশন নিয়ে তুরস্কে এসেছিলাম আমরা, জার্মানী যদি আক্রমণ করে তাহলে আমাদের ভূমিকা কি হবে সে-ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা করতে, তাই না? আমাদের পরামর্শ তুরস্ক সরকার মানলো না, তারমানে মিশন ব্যর্থ। কিন্তু তারমানে এই নয় যে তুরস্কে জার্মান আক্রমণের আশংকা কমেছে। তারমানে এই নয় যে নিরপেক্ষ একটা দেশে রয়েছি বলে সুযোগ পেলেও জার্মানরা আমাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে।'

গোলমালটা দেখা দেয় তুর্কীদের নিয়েই। সম্ভব হলে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে তারা, সেজন্যে অবশ্য

তাদেরকে দোষও দেয়া যায় না। খারাপ কিছু যদি ঘটেই, সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি হবে আলোচনা করার জন্যে তারাই ডেকে পাঠিয়েছিল এই ব্রিটিশ মিলিটারী মিশনকে। কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে জার্মানরা তুরস্ক আক্রমণের একটা অজুহাত পেয়ে যাবে, সে-কথা ভেবে উদ্বেগেরও অন্ত ছিল না তাদের। তাই জেদ ধরে বলেছিল, মিশনের সবাইকে সিভিল ড্রেসে আসতে হবে। সিগন্যাল কোরের সদ্য কমিশন পাওয়া সৈনিক হিসেবে ওদের সাথে অনেক ইন্টারেস্টিং আলোচ্য বিষয় পেয়েছিল ম্যালোরি। জার্মান আক্রমণ ঘটলে কমিউনিকেশন সেটিং কি হবে সে-ব্যাপারে কিছু ঠিক করার আগে তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি-গুলোয় সরেজমিনে তদন্ত করতে যেতে হয়েছিল ওকে। আর স্টাফ সার্জেন্ট একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, তাকে যেতে হয়েছিল একটা ড্যাম উড়িয়ে দেবার নীল-নকশা তৈরি করতে। ওরা যখন ইস্তাম্বুলে ফিরলো, মিশনের বাকি সবাইকে নিয়ে প্লেনটা এথেন্সে ফেরত চলে গেছে।

ব্রিটিশ লিগেশনে গিয়ে পরবর্তী প্লেনের কথা জানতে চায় ম্যালোরি।

লিগেশন অফিশিয়াল ঠাণ্ডা সুরে জানায়, আর কোনো প্লেন নেই। তুরস্ক থেকে এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো টাটরা। কাল সকালে গ্রীসের উদ্দেশে রওনা হবে।

পরে জানতে পারে ম্যালোরি, এথেন্স আর ইস্তাম্বুলের মাঝখানে নিয়মিত একটা সার্ভিস এই দিন কয়েক আগে পর্যন্ত চলাচল করছিল, কিন্তু উত্তর সীমান্তে জার্মান সৈন্য সমাবেশের

গুজব শুনে তুরস্ক সরকার সেটা বাতিল করে দিয়েছে। কাজেই টাটরা ছাড়া তুরস্ক থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার আর কোনো উপায় নেই।

টাটরার গন্তব্য জার্ভোস পেনিনসুলা। গ্রীসের উত্তর এলাকা ওটা, ওখান থেকে এথেন্সের চেয়ে সালোনিকা কাছে পড়ে। তবু যাই হোক, গ্রীক মাটিতে নামতে পারবে ওরা। লিগেশনের লোকজন তো ওদেরকে তক্ষুণি, সেই মুহূর্তে তুরস্ক থেকে বিদায় করে দিতে পারলে বাঁচে। অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোক তো বলেই ফেললেন, সিভিল ড্রেসে থাকলে কি হবে, আপনারা দু'জন ব্রিটিশ আর্মির লোক যদি ইস্তাম্বুলের রাস্তায় রাস্তায় এভাবে ঘুরে বেড়ান, তুরস্ক আক্রমণ করার বিরাট একটা ছুতো পেয়ে যাবে হিটলার।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল ম্যালোরি। অ্যামব্যাসেডরের কথা মনে পড়ে যেতে টাটরায় বসে হাসি পেল তার। 'লিগে-শনের বড়কর্তা, বুঝলে গ্রীণ, আর কোনো জাহাজ না পাওয়া গেলে আমাদেরকে রাশিয়ান জাহাজে তুলে দিতেও দ্বিধা কর-তেন না!'

'আমরা, মিঃ ম্যালোরি, জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম,' বললো গ্রীণ। 'আপনি আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যুদ্ধের মোড়ই নাকি ঘুরে যাবে—মাই গড!'

'এই যে তিনজন জার্মান আমাদের সাথে যাচ্ছে, তুমি বলতে চাও এর পেছনে কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই?' গম্ভীর

স্বরে জানতে চাইলো ম্যালোরি। কাছেপিঠে কোথাও থেকে চেইন টেনে তোলার আওয়াজ পেল সে। বুঝলো, এখন যে-কোনো মুহূর্তে রওনা হয়ে যাবে টাটরা।

'যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র এসব ব্যাপারে আমার মাথা তেমন কাজ করে না,' অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে বললো গ্রীণ। 'অর্ডার পেলে, এবং সামনে জার্মান দেখলে আমি গুলি করতে পারি। অর্ডার পেলে জার্মানদের মধ্যে দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁধে বা বিল্ডিংে বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখে আসতে পারি। কিন্তু অর্ডার করলেই আমি কোনো সমস্যা বা সংকটের তাৎপর্য বুঝতে পারি না। তবে,' বলে নাটকীয় ভাবে কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল গ্রীণ, 'আপনি যখন জানতে চাইছেন, এই তিনজন জার্মান সম্পর্কে আমার কি মনে হচ্ছে সেটা আমি আপনাকে জানাতে পারি।'

'বলো।'

'ওরা তো এমব্যাসীর স্টাফও হতে পারে? হয়তো ইস্তাম্বুল থেকে বদলি করা হয়েছে, যাচ্ছে সলোনিকায়?' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো গ্রীণ, কিন্তু লক্ষ্য করলো তার কথা শুনছে না ম্যালোরি, আগ্রহ হারিয়ে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে।

আবার একবার তীক্ষ্ণ চোখে কামরার চারদিক দেখে নিচ্ছে ম্যালোরি। গ্রীণের দিকে তাকালো না, কিন্তু জানতে চাইলো, 'ওরা যদি এমব্যাসীর স্টাফই হবে, তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে ট্র্যাভেল করছে কেন? বোঝাই যাচ্ছে, পরস্পরকে কেউ চেনে না ওরা।'

তাইতো। তাজ্জব হয়ে ভাবলো গ্রীণ। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অন্তর্দৃষ্টি সবার থাকে না। এত সহজ, নগ্ন একটা অসঙ্গতি, অথচ চোখেই ধরা পড়েনি তার!

গ্রীণকে দোষ দিল না ম্যালোরি। ওকে নিয়ে অসুবিধে হলো, মাথা ঘামাতে রাজি নয়। বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দেবার সময় অনুভব করলো, টাটরা মুভ করছে। সাথে সাথে হাতঘড়ি দেখলো ও। সাড়ে সাতটা। না, এমব্যাসী স্টাফ এরা হতেই পারে না। সালোনিকাই যদি এদের গন্তব্য হবে তাহলে ইস্তাম্বুল থেকে ম্যাসেডোনিয়া হয়ে সালোনিকায় নিয়মিত ট্রেন চলাচল করছে। সেটায় কেন চড়েনি? ওই ট্রেনে ভ্রমণ করা নরক যন্ত্রণা ভোগ করার মতো, পথে যতগুলো গ্রাম পড়বে সবগুলোয় থামবে, পৌঁছুতে লাগবে দু'দিন, কিন্তু তবু ওই ট্রেনই তাদেরকে সরাসরি সালোনিকায় নিয়ে যেতে পারতো। তা না গিয়ে সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে কেন ওরা গ্রীসে পৌঁছুতে চাইছে? কেন, বারবার নিজেকে প্রশ্ন করলো ম্যালোরি, কেন?

দক্ষিণ বুলগেরিয়া। জার্মানদের জেনারেল হেডকোয়ার্টার।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো প্রকাণ্ড চেয়ার, ডেস্কের পিছন থেকে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ফিল্ড-মার্শাল ফন লিস্ট। হাতে এখনও ধরা রয়েছে মিটিওরোলজিক্যাল রিপোর্টটা। ডেস্কের পাশে তাঁর স্টাফ অফিসার কর্নেল গেনকি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছে। দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে আছে ফিল্ড-মার্শালের

মাথা, এটা যে কথা বলার মুহূর্ত নয় সেটা বুঝতে পারলো গেনকি। ডেস্কের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সাড়ে সাতটা।

গম্ভীর, থমথম করছে ফিল্ড-মার্শালের চেহারা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে আরও ভারী হয়ে উঠলো মুখ, চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে। এমনিতেও হাতের কাগজটার কথা ভুলতে পারছেন না, বাইরের দৃশ্য সেটার কথাই আবার তাঁকে মনে করিয়ে দিল। সকাল হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে, পাথরের তৈরি গ্রামের বাড়িঘরের পিছন থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়, উঠে গিয়ে মিশেছে ঘন কালো মেঘের সাথে। গোটা বুলগেরিয়ার আকাশ জুড়ে এই অবস্থা, মেঘে মেঘে ঢাকা। এই মেঘের একটাই অর্থ, আরও তুষার। আবহাওয়ার রিপোর্টও তাই বলছে। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তুষার। মেঘের আদিগন্ত সিলিঙের নিচে ঢালগুলো তুষারে ঢাকা পড়ে আছে।

'জঘন্য, জঘন্য আবহাওয়া!' কর্কশ ফ্যাঁসফেঁসে শোনালো তাঁর গলা। 'এবার অন্তত ওরা ভুল করেছে বলে মনে হয় না। তোমাদের এই আবহাওয়াবিদরা, জানো তো, এর আগে প্রায় প্রতিবার ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে। কিন্তু এবার নয়! নরওয়েতে কি ঘটেছিল মনে করে দেখো।'

খুক্ করে কেশে নিল গেনকি, এর মানে হলো ফিল্ড-মার্শালকে নিজস্ব পন্থায় জানিয়ে দেয়া, সে কথা বলতে যাচ্ছে। 'গোটা ইউরোপেই এবার বসন্ত আসতে দেরি করছে, স্যার। রাশিয়ান স্তেপে এখনও তুষার...'

'এখুনি তোমাকে রাশিয়ার কথা ভাবতে হবে না। আগে এই সমস্যার সমাধান দেখতে চাই আমি।' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন তিনি। বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'কিন্তু, জানো তো, বার্লিন এ-ব্যাপারে ভারি আত্ম-বিশ্বাসী!'

'তার আত্ম-বিশ্বাসের কোনো অভাব থাকার কারণ নেই, কাজটা তো আর তাকে নিজের হাতে করতে হচ্ছে না। তবে, স্যার, আপনার হাতেও অসাধারণ শক্তিশালী ফোর্স রয়েছে।'

কর্নেলের এই কথাটা বিনা তর্কে মেনে নিলেন ফিল্ড-মার্শাল লিস্ট। টুয়েলফথ্ আর্মিতে রয়েছে দুটো মটোরাইজড, তিনটে মাউন্টেন আলপেনকরপস এবং লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, রয়েছে অ্যাডলফ হিটলার ডিভিশনের তিনটে রেজিমেন্ট—সবশেষে, পাঁচটা প্যাঞ্জার ডিভিশন। গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়ায় অভিযান চালানো হবে, সময়ও হয়ে এসেছে। এই বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাঁড়ায় সাধ্যি কার। বলতে গেলে, সম্ভাব্য সব কিছু ধ্বংস করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হলো গ্রীক পাহাড়গুলো ঢাকা পড়ে আছে গভীর, পুরু বরফে। অলিম্পাস আর জার্ভোস, সবখানে এই দশা। কুঁড়ের মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকা এই হারামী শীতটাকে তাঁর বাহিনী কি পোষ মানাতে পারবে? এদিকে, জিরো আওয়ার প্রায় হয়ে এল।

আবার তিনি জানালার দিকে ফিরলেন। হঠাৎ কিছু দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠলো তাঁর। ভাল করে তাকালেন। হ্যাঁ, শুরু হয়েছে তুষারপাত। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে জানালার কাচ। বসন্ত কি তাহলে আর আসবে না? জিরো আওয়ার এসে

গেল বলে। জানালার সামনে কোথাও থেকে ভারি ঘড় ঘড় আওয়াজ ভেসে এল—কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে প্যাঞ্জার ডিভিশনের ট্যাংক এগোচ্ছে। সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ওগুলো, রাত কাবার হবার আগেই পজিশনে পৌঁছে যাবে। টাইম-টেবিল ধরে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে, বার্লিন ছাড়া দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই যে এখন এই তৎপরতা থামায়।

বাড়ির ভেতর কোথাও থেকে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ ভেসে এল। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ থামলো না। শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপালো কর্নেল গেনকি। কথা বলার আগে কেশে নিতে ভুললো না। 'স্যার, গাড়ি পৌঁচেছে।'

গলার কাছে বোতামটা এঁটে নিয়ে কোটটাকে আরও আঁট-সাঁট করে নিলেন ফিল্ড-মার্শাল, ডেস্ক থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে এগোলেন দরজার দিকে। কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথে থামলেন তিনি, তাকালেন দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপটার দিকে। তারা বেরিয়ে গেলেই ম্যাপটা সরিয়ে ফেলবে আর্দালী। এটা দক্ষিণ বলকান আর পুব মেডিটেরেনিয়েন জোনের ম্যাপ।

দরজা খুলে দিল কর্নেল, তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন ফিল্ড-মার্শাল। দরজা দিয়ে বেরুবার আগে ফিল্ড-মার্শাল যে ম্যাপের দিকে তাকিয়েছেন, সেটা লক্ষ্য করেছে গেনকি। স্যারের দৃষ্টি ম্যাপের কোথায় আটকা পড়েছিল, জানে সে। প্রথম তিনি ইস্তাম্বুলের দিকে তাকিয়েছেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে সী-রুটের ওপর। ডারডানেলসের ভেতর দিয়ে, ঈজিয়ান ধরে সী-রুটটাকে অনুসরণ করেন তিনি। ঈজিয়ানেরই এক জায়গায় তিনি একটা

পেনিনসুলা দেখতে পান।

জার্ভোস।

আলেকজান্দ্রিয়া।

'কি নাম বললে? রুপেসকু?' সিনিয়র ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার তার সহকারী লেফটেন্যান্ট-কমাণ্ডারের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো।' ইস্তাম্বুলের লিগেশন থেকে এই জাহাজটার কথাই না বলা হয়েছে? রুমানিয়ার জাহাজ?'

'ইয়েস, স্যার। এর কথা বলেই ইস্তাম্বুল লিগেশন থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। বুলগেরিয়ার পোর্ট ভার্ণা থেকে কাল রওনা হয়ে ঘণ্টা কয়েক আগে গোল্ডেন হর্ণে পৌঁচেছে। জাহাজটা আসলে যে কোথায় যাবে সেটা একটা রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিসের রহস্য?'

'পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না, স্যার। শোনা যাচ্ছে, তার ডেসটিনেশন নাকি বৈরুত। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যে কৃষ্ণ সাগরে এটাই তার প্রথম ট্রিপ। সন্দেহটা এখানে। তাছাড়া, রুমানিয়াকে এখন কন্ট্রোল করছে জার্মানী—এটাই বোধহয় লিগেশনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'আই সি। তারমানে, এটা একটা জটিল ব্যাপার। রুমানিয়ার সাথে এখনও আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। তুমি তাহলে বলছো, রুপেসকুর ওপর একটা চোখ রাখা দরকার? সত্যি লেবাননে যায় কিনা দেখার জন্যে?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো লেফটেন্যান্ট-কমাণ্ডার।

সকালের রোদে ঝলমল করছে সাদা জেটি। নীল রঙের আয়-নার মতো লাগছে সাগরকে। জেটি ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে একটা জাহাজ, গ্রীসে যাবে ওটা। জেটির কাছেপিঠে নোঙর ফেলে রয়েছে ছোট-বড় বেশ কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ। 'ওই এলাকায়, স্যার, ওটাই একমাত্র ভেসেল যার সাথে অ্যাকসিস পাওয়ারের ক্ষীণ একটু যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। রুপেসকু কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাও আমরা জানি না...'

'হয়তো যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে যতটা পারে, যতবার পারে কার্গো আনা-নেয়া করছে, তার বেশি কিছু না। যুদ্ধ শুরু হলে এই পথে আর আসা-যাওয়া চলবে না, জানে। সাগরে আমরা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি, তাই না?'

'আমি, স্যার, ডেরিঙের কথা ভাবছিলাম। তুর্কী উপকূলের বাইরেটায় টহল দিচ্ছে সে, ইচ্ছে করলে অন্ধকার নামার খানিক পরই ইন্টারসেপ্ট করতে পারে রুপেসকুকে। জাহাজটাকে সীজ করতে হবে বা তাতে চড়তে হবে, আমি সে ধরনের কিছু বলছি না। কিন্তু একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার কাছে চলে এলে তার প্রতি-ক্রিয়া কি হয়, সেটা দেখা যেতে পারে।'

'তাহলে উইলফবিকে একটা মেসেজ পাঠাও। ইস্তাম্বুলেও একটা রেডিও করো। ঝগড়াটে ডিপ্লোম্যাটের কাছ থেকে এরই মধ্যে দু'দু'বার অনুরোধ পেয়েছি আমরা।' সিনিয়র ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল সাড়ে সাতটা। হ্যাঁ, উইলফবি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

পাঁচ

ডারডানেল্‌স্ পিছনে ফেলে আরও খোলা ঈজিয়ানে বেরিয়ে এল টাটরা। জাহাজের ভেতর ধীরে ধীরে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠছে পরিবেশ। ইঞ্জিনের সমান তালের একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ পরিস্থিতিটাকে যেন আরও থমথমে করে তুললো। সন্ধ্যের দিকে তুর্কী আর গ্রীক উপকূলের মাঝখানে পৌঁছুলো জাহাজ। ইতিমধ্যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে সাগর, উথালপাথাল ঢেউ আর তীব্রগতি স্রোত ক্ষুদে জাহাজটাকে নিয়ে খেলছে যেন।

উত্তেজনা দেখা দিল ছোটখাট, অর্থহীন ঘটনা থেকে। প্যাসেজ দিয়ে এগোচ্ছিল ম্যালোরি, সেলুনে ঢুকবে, এই সময় সেলুনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফ্র্যাংক, প্রকাণ্ডদেহী জার্মান। দু'জন কেউ কারও দিকে তাকালো না, কিন্তু যে যার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো, কেউ কাউকে পথ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। পরমুহূর্তে দেখা গেল, দু'জনেই এগোতে চায়। সংঘর্ষ যখন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠলো, এই সময় কি মনে করে একপাশে সরে গিয়ে ম্যালোরিকে পথ ছেড়ে দিল ফ্র্যাংক। পরের ঘটনাটা

ঘটলো ডিনারের সময়। কেউ একটা বোতলের ছিপি খোলার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সেটা বোতলের মাথা থেকে পিস্তলের মতো আওয়াজ করে ছিটকে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে বাইরে। ঝাড়া দশ সেকেণ্ড পাথর হয়ে গিয়েছিল সবাই, নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেনি। এরপরের ঘটনাগুলো আরও ছোটখাট। এক জাতের লোক আরেক জাতের লোককে দেখলে রাস্তা বদলে অন্য প্যাসেজে ঢুকে গেল।

ডিনারে বসে ম্যালোরি বললো, 'আমি ভুল করিনি, গ্রীণ। দেখছো না, কিভাবে টেনশন তৈরি হচ্ছে! ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু টের পাচ্ছি না আমরা। এভাবে তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করা দরকার।'

'আপনি বলছেন টেনশন তৈরি হচ্ছে?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইলো গ্রীণ। 'কিন্তু কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মিঃ ম্যালোরি।'

'দেখছো, কিভাবে বসে আছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো ম্যালোরি। 'ঠিক যেন কিছু ঘটবে বলে অপেক্ষা করছে।'

প্রত্যেকে একটা করে আলাদা টেবিল দখল করে বসেছে। রাহাত, মুলার, ফ্র্যাংক আর পাপাগোপালা। একজনের পাশের টে-বিলে আরেকজন বসেনি, মাঝখানে এক বা একাধিক খালি টেবিল পড়ে আছে। কারও চেহারায় কোনোরকম ভাবের লেশমাত্র নেই, যেন কামরার ভেতর সে একাই উপস্থিত রয়েছে, অথবা আর কেউ থাকলেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় সে। কেউ কোনো শব্দ করছে না, মাঝে মধ্যে শুধু কাটলারির মৃদু আওয়াজ শোনা

যাচ্ছে। এমন কি টাটরার ক্যাপ্টেন মোপাস্থও পরিবেশটাকে হালকা করে তুলতে ব্যর্থ হলো। ডিনার শুরু হয়ে যাবার খানিক পর এল সে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে তার অসহায়ত্বটুকু ম্যালো-রির কাছে ব্যাখ্যা করলো। নিজের টেবিলে বসার আগে এক এক করে প্রত্যেকের টেবিলে গেল সে।

'ব্যাপারটা একটু জটিল তো হবেই, মিঃ ম্যালোরি। ব্রিটিশ এবং জার্মান ভদ্রলোক রয়েছেন জাহাজে, বুঝতেই তো পারেন!'

'ভয় করছেন ওরা কোনো গোলমাল বাধায় কিনা?' হালকা স্থরে খোঁজ নিল ম্যালোরি।

'গোলমাল?' কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল ক্যাপ্টেন মোপাস্থ।

'গোলমাল বোঝেন না?' চেহারায় কৌতুক আর গলার স্থরে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বললো গ্রীণ। হাত তুলে বাতাসে ঘুসি মারার ভঙ্গি করলো সে। 'শক্তি পরীক্ষা, মারামারি!'

'সে কি! না-না, তা ওঁরা কেন করতে যাবেন...' তাড়া-তাড়ি শুরু করলো ক্যাপ্টেন।

'আমাদেরকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বললো গ্রীণ। 'কেউ লাগতে না এলে আমরা কারও লেজে পা দেবো না।'

'তবে,' মাঝখান থেকে বললো ম্যালোরি, 'আপনাকে একটু সতর্ক থাকার পরামর্শ দেবো আমি, ক্যাপ্টেন মোপাস্থ। আপনি তো বোঝেনই, ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। যতক্ষণ না ওরা কাটায়রায় নেমে যাচ্ছে ততক্ষণ খারাপ কিছু একটা ঘটার আশংকা থেকেই যাচ্ছে।'

'প্রার্থনা করুন আমরা সবাই যেন ভালয় ভালয় পোর্টে পৌঁছুতে পারি,' বলে আর দাঁড়ালো না মোপাসু, তাড়াতাড়ি এক রকম পালিয়েই গেল বলা যায়।

ডিনার শেষ হলো। ডাইনিংরুম থেকে একজন একজন করে বেরিয়ে গেল সবাই, বাকি থাকলো শুধু রাহাত। ওর টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে স্টুয়ার্ড, অর্ডার পেয়ে কফি ভর্তি একটা পট আর কাপ-পিরিচ দিয়ে গেছে। পট থেকে নিজেই কফি ঢেলে নিয়েছে রাহাত, হাতে রয়েছে জ্বলন্ত চুরুট। সেলুনের মতোই ডাইনিংরুমটাও কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা, পোর্টহো-লের সোনালী পর্দাগুলো সরানো রয়েছে। কাছেরটা দিয়ে মাঝে মধ্যে বাইরে তাকাচ্ছে ও। থালার মতো মস্ত চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা পরিষ্কার দেখা যায়। ডাইনিংরুমটা দোল খেতে শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই, রাত বাড়ার সাথে সাথে দোলের গতিও বাড়ছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে কাঠের পাটাতন। চেয়ারের ওপর নিজেকে স্থির রাখার জন্যে পা দুটো আরও ফাঁক করে রাখতে হলো। পোর্ট-হোল দিয়ে উত্তর-পুবটা দেখা যায়। পাহাড়ের মতো ধেয়ে আসছে এক একটা ঢেউ, দিগন্তরেখা আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। তারপর আবার যখন ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে জাহাজ, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার হয়ে উঠছে সব।

চার নম্বর জার্মানের কথা ভাবছে রাহাত। নিজের কেবিন থেকে এখনও বেরোয়নি ফকার। স্টুয়ার্ডকে প্রশ্ন করে জেনেছে ব্যাপারটা।

'কে জানে, লোকটা হয়তো মরেই গেছে,' ঠাট্টা করে বলেছিল ও। 'চোখের সামনে দেখতে না পেলে কত কিছুই তো মনে হতে পারে।'

'ডিনার তার কেবিনেই দেয়া হয়েছে,' জানিয়েছে স্টুয়ার্ড। 'আর রাতের জন্যে এক ফ্লাস্ক কফি চেয়ে নিয়েছেন তিনি। সাগরে বোধহয় তাঁর ভাল ঘুম-টুম হয় না।'

'হয়তো তা নয়। হয়তো ঘুমাবার ইচ্ছে নেই। কফি খেলে ঘুম ধরে বলে শুনিনি কখনও।'

'সেটাও একটা কথা। তবে হয়তো রাত জেগে পড়াশোনা করার অভ্যেস আছে। মাঝে মধ্যে এই রকম প্যাসেঞ্জারও পাই আমরা। রাত জাগতে ভালবাসে।'

'শুধু রাত জাগতে ভালবাসে? কিন্তু আমি তো দেখছি এর আরও কিছু ব্যারাম আছে,' বলেছিল রাহাত।

'তা, মিশুক নয় এমন প্যাসেঞ্জারও জোটে বৈকি। কারও সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করে না। সবাই যখন ডিনারে বসেছেন, উনি তখন কি মনে করে একবার বাইরে বেরিয়েছিলেন। যদিও দোর-গোড়া ছেড়ে নড়েননি। তারমানে, কেউ তাঁকে দেখুন, সেটা তাঁর পছন্দ নয়।'

'ডিনার দিয়ে আসার সময় কেমন দেখলে তাকে?'

'কিভাবে!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে বলেছিল স্টুয়ার্ড। 'ডিনার দিতে গিয়ে দেখি কেবিনে নেই তিনি, টয়লেটে ঢুকে বসে আছেন। তারমানে, স্টুয়ার্ডকেও দেখা দিতে চান না। ভদ্রলোক বোধহয় অস্ট্রিয়ান।'

'তাই ? কিভাবে বুঝলে ?'

'কেবিন ট্রাঙ্কের গায়ে ভিয়েনার একটা হোটেল, হোটেল স্যাচেয়ারের লেবেল আঁটা রয়েছে। আরও দেখলাম, টেবিলের ওপর রিস্টওয়াচের পাশেই খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক জোড়া ফিল্ড গ্লাস। মনে হলো, পোর্টহোল দিয়ে সাগর দেখেই একা একা সময়টা কাটান তিনি। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন, স্যার।'

স্টুয়ার্ড চলে যাবার পর ছ'কাপ কফি খেল রাহাত। অদৃশ্য ফকারের কথা মাথা থেকে বের করতে পারছে না। রাত দশটার দিকে নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে জাহাজটা আজকের মতো শেষ-বার ঘুরে দেখার জন্যে ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

শীতের রাত। আকাশে, ছুর্যোগের লক্ষণ। ভৌতিক একটা জাহাজের মতো লাগছে টাটরাকে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে সিঁড়িটা। আশপাশে নেই কেউ। যাবে একটা প্যাসেজে, যেখানে প্যাসে-ঞ্জার কেবিনগুলো আছে। এই সিঁড়িটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে ও, তাছাড়া, পায়ে রাবার-সোলের জুতো থাকায় নামার সময় কোনো শব্দ হচ্ছে না। নিচে নেমে খালি কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ভূতের মতো এগোলো ও।

এক নম্বর কেবিনের সামনে থামলো রাহাত। এটার ভেতরে রয়েছে অস্ট্রিয়ান বেন ফকার। ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না। দরজার মাথায় ভেন্টিলেটর, রঙিন ঝাপসা কাচ দিয়ে ঢাকা, সেটা আলোকিত হয়ে আছে, দেখে বোঝা গেল, ভেতরে আলো জেলে রেখেছে ফকার। ইচ্ছে করলে ভেন্টিলেটা-

রের কাচ তুলে ভেতরে তাকাতে পারে রাহাত, কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না ও। লোকটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট একটা ঘরে একা বেশিক্ষণ থাকলে যে-কোনো লোকের শুধু ঘুম পায়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও।

পরের কেবিনটা ওয়ায়েরলেস রুম। এটার সামনে থামলো না রাহাত, তবে পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকালো। চোখের সামনে মেলে ধরে খবরের কাগজ পড়ছে গ্রীক অপারেটর, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্যাণ্ডউইচের দিকে। দেখেশুনে বোঝা গেল সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু তবু কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগলো ওর মন। পরের কেবিনটা অন্ধকার। এটা অটো ফ্র্যাংকের কেবিন। লোকটা প্রকাণ্ড, দেখে মনে হয় ব্যবসায়ী। অথবা, গেস্টাপোর একজন সদস্য। এদেরকে দেখে চেনা কঠিন। তিন নম্বর কেবিনে এখনও আলো জ্বলছে, বন্ধ দরজার ভেতর থেকে মৃত্ন ড্যান্স মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ছুঁচোমুখো মুলার রেডিও দয়েচল্যাণ্ড ধরেছে, হয়তো দেশের কথা মনে পড়ে গেছে বলেই। মাঝ ঈজিয়ানে বোট যদি এই রকম তুলতে থাকে, শুধু দেশ নয়, মা-বাপ, ছেলেবেলা, পরকাল, পাপ-পুণ্য অনেক কথাই মানুষের মনে পড়ে যেতে পারে। এরপরের কেবিনেও আলো জ্বলছে। এটায় রয়েছে তু'জন ব্রিটিশ। দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে থামলো রাহাত। তারপর যেই মৃত্ন কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে থেমে গেল। শান্ত-ভাবে এগোতে শুরু করলো আবার, যেন কিছুই ঘটেনি। পর-মুহূর্তে ওর পিছনের একটা কেবিনের দরজা খুলে গেল। কিন্তু

পিছন ফিরে তাকালো না ও। হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছে ওর—ফ্র্যাংক কি সত্যি তার কেবিনে আছে? নাকি কেবিনের আলো জ্বেলে রেখে অন্য কোথাও গেছে সে?

নিজের অন্ধকার কেবিনটা নিঃশব্দে পেরিয়ে এল রাহাত। কম্প্যানিয়নওয়েের শেষ মাথার অপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওপরে। সিঁড়ির মাথায় দরজা, সেটা খুলতেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করলো ও। কবাট ধরে ফেলে পতনটা ঠেকালো কোনো রকমে। পশ্চিম দিকে ছুটছে টাটরা, ঝড়ো বাতাস সরাসরি আঘাত করছে তাকে। সাবধানে ডেকে পা ফেললো ও। বন্ধ করার জন্যে লড়াই করতে হলো দরজার সাথে। শুধু ধাক্কা নয়, বাতাস যেন বিষাক্ত কামড় বসাচ্ছে গায়ে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে শুরু করলো ওর।

ডেকটা খালি। কোথাও নেই ফ্র্যাংক। কিন্তু জাহাজটা ঠিক জায়গা মতোই আছে, ডাইনিং রুমের পোর্টহোল দিয়ে ঠিক যেখানে দেখেছিল সেটাকে। টাটরার সাথে সমান্তরাল একটা কোর্স ধরে একই সাথে এগোচ্ছে ওটা। স্টারবোর্ডের দিকে তিন কিলোমিটার দূরে। রেলিঙ ধরে সাবধানে এগোলো রাহাত। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে বিকৃত হয়ে উঠলো মুখ। স্টার্নে পৌঁছে ফেলে আসা ডেকের দিকে তাকালো ও। আরও ভাল করে দেখার জন্যে পকেট থেকে মনোকুলার গ্লাস বের করলো। প্রথমেই দেখলো লাইফবোটগুলোকে। দিনের বেলা রোদ পেয়ে তুষারের আবরণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, বাতাসের সাথে ডেভিটের ওপর দুলছে ওগুলো। টাটরার ফানেল থেকে মোটা একটা স্তম্ভের

মতো ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু ফানেল থেকে বেরিয়েই বাতাসের সাথে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। চারদিকে প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই। এরপর দুরের জাহাজটার দিকে তাকালো ও। প্রথমে ঝাপসা, আলোর একটা ঝলকের মতো দেখালো ওটাকে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে নিল ও। পরিষ্কার হয়ে উঠলো আলো, আলাদা ভাবে চেনা গেল পোর্টহোলগুলোকে। ফানেলটা সাদা রঙ করা, লক্ষ্য করলো। মাস্টহেডে একটা পতাকা উড়ছে, কিন্তু চেনা যায় না।

প্রায় মিনিটখানেক অটল দাঁড়িয়ে থাকলো রাহাত। মনের একটা অংশ জাহাজটার দিকে পড়ে রয়েছে, আরেকটা অংশ ক্ষীণ একটু শব্দের আশায় সজাগ, শুনতে পেলেই বুঝতে পারবে আপাতদৃষ্টিতে খালি মনে হলেও ডেকে আসলে একা নয় সে। বুঝতে পারবে, ওর ওপর হামলা আসতে যাচ্ছে।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে বন্ধ করলো সেটা। কোনোদিকে তাকালো না। সম্পূর্ণ কানের ওপর নির্ভর করছে ও। কেউ যদি আসে, বা লুকিয়ে থাকে, চোখে নাও ধরা পড়তে পারে সে। কিন্তু কেউ যদি শব্দ করে, ঠিকই শুনতে পাবে ও। আবার একবার তাকালো রিস্টওয়াচের দিকে। দশটা দশ।

খালি চোখে দুরের জাহাজটার দিকে তাকালো রাহাত। সন্দেহ নেই, এটাই সেই জাহাজ। গোল্ডেন হর্ণে টাটরা যখন রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, রুপেসকুর ফানেল থেকে তখন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।

কাঁধ দুটো বাতাসের বিরুদ্ধে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে টলটলা-

য়মান ডেকের ওপর দিয়ে ফিরে আসতে শুরু করলো রাহাত। নিচে নেমে এসে নিজের কেবিনের সামনে দাঁড়ালো। ঝাড়া এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর চাবি বের করে তালা খুললো ও। ভেতরে ঢুকতেই আরাম লাগলো, কি মজার গরম হয়ে আছে কেবিন। দরজা বন্ধ করলো ও। কোট খুলে ফেলে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালো। নাগালের মধ্যে ল্যুগারটা রেখে একটা চেয়ারে বসলো ও।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। রাহাত জানে, আততায়ীরা কাজ সারার জন্যে রাতটাকেই বেশি পছন্দ করে।

ছয়

'সেই কঠিন চেহারার জার্মানটা,' দরজা বন্ধ করে আবার তালা লাগিয়ে দিয়ে স্টাফ সার্জেন্ট গ্রীণকে বললো সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ম্যালোরি। 'ওদিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে দেখলাম। এখনও কোট আর হ্যাট পরে আছে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'উঁহুঁ, এ আমার একদম ভাল ঠেকছে না।'

'কি ভাল ঠেকছে না, মিঃ ম্যালোরি?' বালিশের নিচে যেখানে ওয়েবলি পয়েন্ট ফোর-ফাইভ-ফাইভ রিভলভার রয়েছে সেখান থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে জানতে চাইলো গ্রীণ। ম্যালো-রিকে হারাবার জেদ নিয়ে দাবা খেলতে বসেছিল সে, পরপর দু'বার বিশ্রীভাবে হেরে এখন একা একা খেলতে বসেছে সে।

কপালে চিন্তার রেখা, হাত দুটো পিছনে বাঁধা, উত্তেজিত ভাবে পায়চারী শুরু করলো ম্যালোরি। 'এই যে, এতগুলো জার্মান রয়েছে বোটে, অথচ কেউ কারও সাথে ভুলেও কথা বলছে না। একই দেশের লোক ওরা, কিন্তু কেউ কারও দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত! উঁহুঁ, এর মধ্যে খারাপ একটা কিছু

না থেকেই পারে না।'

'হতে পারে ওরা হয়তো ব্রিটিশ, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। তা যদি হয়, সমস্যার সমাধান আপনি পেয়ে যাচ্ছেন,' নিজের বিরুদ্ধে মোক্ষম একটা চাল দিল গ্রীণ। 'আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আমরা কি রকম সে তো আপনি জানেনই —পরিচয় করিয়ে না দিলে আমরা যীশুকেও না চেনার ভান করবো।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো ম্যালোরি। নিজের বাঙ্কে বসে কাঠের দেয়ালে পা ঠুকতে শুরু করলো সে। শব্দের উৎস সন্ধানে মুখ তুলে একবার তাকালো গ্রীণ, তারপর আবার মন দিল খেলায়। 'আমি তো জেগেই আছি, মিঃ ম্যালোরি। আপনি বরং ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'পারবো না,' কার ওপর কে জানে, চটে উঠলো ম্যালোরি। 'বিশ্বাস করো, নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে আমার।'

'কেন, মিঃ ম্যালোরি? হঠাৎ…'

'কিছু একটা মতলব আছে ওদের, ওই জার্মানগুলোর,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বললো ম্যালোরি। 'কিন্তু আমি সেটা ধরতে পারছি না কেন? শুতে যাবার সময় অনেক আগেই হয়েছে, অথচ জাহাজের এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করছে ওরা।' বাঙ্ক থেকে নেমে পড়লো সে। দাঁড়ালো গিয়ে খোলা পোর্টহোলের সামনে। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। 'ওই দেখো, জাহাজটাও রয়েছে, সরে অন্য দিকে চলে যাবে, তার কোনো লক্ষণই নেই। ওটা আমাদের এত কাছে কেন বলতে পারো?'

নিজের একটা বড়ো মার দিয়ে মুখ তুলে তাকালো গ্রীণ। শুধু শার্ট পরে আছে সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট, তাকিয়ে আছে পোর্ট-হোল দিয়ে বাইরে। 'আমি যতদূর জানি, সী-লেন বলে একটা কথা আছে, মিঃ ম্যালোরি। ওই সী-লেন ধরেই যেতে হয় সব জাহাজকে। ইংলিশ চ্যানেলে দেখেননি, একটা জাহাজকে কয়েকটা জাহাজ অনুসরণ করে ওখানে।' একটু থেমে আবার বললো, 'কিছু যদি মনে না করেন, আমার একটা সন্দেহের কথা বলতে পারি।'

অন্যমনস্কভাবে বললো ম্যালোরি, 'বলো।'

'আমার সন্দেহ, গ্রীকদের ওই ভয়ংকর খাবারটা আপনার ঠিক হজম হচ্ছে না। তা না হলে। আপনার মধ্যে যা কখনও দেখিনি—এতটা বিচলিত হয়ে উঠলেন কিভাবে?'

সিধে হয়ে দাঁড়ালো ম্যালোরি। পর্দা টেনে দিল পোর্টহোলের। 'আমরা একটা জীবন-মরণ যুদ্ধে রয়েছি, গ্রীণ,' স্টাফ সার্জেন্টকে স্মরণ করিয়ে দেবার সুরে বললো সে। 'জার্মানদের সাথে একই জাহাজে...'

'মাত্র তিনজন জার্মানকে এত ভয় পাবারও কিছু নেই...

'চারজন। মনে নেই আরেকজনের কথা বললো ক্যাপ্টেন? কম্প্যানিওনওয়ের শেষ মাথার কেবিনটায় আছে, বাইরে বেরোয় না।'

'ঠিক আছে, চারজন। কিন্তু চারজন জার্মানকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। এটা একটা গ্রীক ফেরী, আর ঈজিয়ানের মাঝখানে রয়েছি আমরা। আমার জানা মতে, ঈজিয়ানকে রয়্যাল

নেভিই কণ্ট্রোল করছে।’

নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল ম্যালোরির ঠোঁটে। ‘অকারণে ভয় পাচ্ছি, তোমার এই কথা আমি মানতে রাজি নই। ওই ব্যাটা জার্মানদের নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব আছে। তবে, তোমার একটা কথা বোধহয় ঠিক। গ্রীকদের ওই খাবারটা আমার ঠিকমত হজম হয়নি। কি যেন ছিল ওটা?’

‘ফ্রায়েড অকট্রাঙ্গেল।’ দাবায় মন লাগালো গ্রীণ, অন্যমনস্ক-ভাবে আবার বললো, ‘ওটা একটা শিশু অক্টোপাস।’ মুখ তুলে ম্যালোরির দিকে তাকালো না সে। কিন্তু খানিক পর টের পেল, আবার উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করেছে ম্যালোরি।

‘একা বাইরে বেরিয়ো না,’ বললো সে। ‘অন্তত আজকের রাতটা দু’জন একসাথে থাকা দরকার।’

কথাটা মনে মনে গ্রীণও স্বীকার করলো। ম্যালোরির প্রতিটি যুক্তি এবং আশংকা সমর্থন করে সে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললে সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট আরও অস্থির হয়ে উঠবেন ভেবে ব্যাপার-টাকে হালকা করার চেষ্টা করছে সে। জার্মানগুলোর আচরণ তারও ভাল ঠেকছে না। গুপ্তচর হতে পারে ওরা। হতে পারে অন্তর্ঘাতক। কিংবা কমাণ্ডো গ্রুপ।

দিন কয়েক আগের কথা মনে পড়ে গেল ম্যালোরির। এথেন্সে একটা মিলিটারী কনফারেন্স হয়ে গেছে, সেখানে উপ-স্থিত থাকতে হয়েছিল তাকে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কমিউনি-কেশনও ছিল, সেটাই ওর উপস্থিত থাকার কারণ। কর্নেল ক্রস-বির কণ্ঠস্বর এখনও তার কানে বাজছে।

'এর গুরুত্ব আর অস্বীকার করা যায় না,' বলেছিলেন কর্নেল। 'আমাদের কিছু লোককে অবশ্যই মাউন্ট জার্ভোসে পাঠানো দরকার। কিন্তু গ্রীক ওয়র মিনিস্ট্রির সংশ্লিষ্ট অফিসারের কথা হলো, বুলগেরিয়ার সীমান্ত থেকে জার্ভোস সত্তর মাইল দূরে, এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতে পেনিনসুলার কমাণ্ড থাকতে হবে ম্যাসেডোনিয়ায় জড়ো হওয়া গ্রীক আর্মির হাতে। আমাদেরকে ওখানে কোনোমতে যেতে দেবে না সে।'

'ছোট একটা ইউনিট, অবজারভেশন পোস্ট খাড়া করবে—তাতেও তাদের আপত্তি, স্যার?' জানতে চেয়েছিল ম্যালোরি। 'আমি যতদূর জানি, চূড়ার নিচে সন্ন্যাসীদের আশ্রম থেকে গাল্‌ফ বরাবর কোস্ট রোড পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ওই রাস্তাটা দিয়েই তো আমাদের সাপ্লাই যায়, সেই আলকিয়ামন লাইন পর্যন্ত, তাই না?'

'হ্যাঁ,' কর্নেল বলেছেন ওকে। 'কিন্তু মুশকিল হলো, ওখানে সন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে বলে জায়গাটাকে পূত-পবিত্র বলে মনে করা হয়। সন্ন্যাসীরা অনেক দিন ধরে আছে ওখানে, গোটা পেনিনসুলাই এখন তাদের দখলে। এমনকি শুধু ওখানে ল্যাণ্ড করতে হলেও সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। বাইরে থেকে কোনো মেয়েলোক ওখানে যেতে দেয়া হয় না। কিছু জেলের বউ আছে বটে, কিন্তু তারা ওখানেই জন্মেছে, ওখানেই মারা যাবে।'

'কিন্তু গ্রীক সরকার এমন বোকামি করছে কেন? জার্মানরা ওটা গায়ের জোরে দখল করে নিতে পারে, এ-কথা কি তারা

একবারও ভাবছে না ?'

'এই আশংকার কথা ভেবেই তো অস্থির হয়ে উঠেছে আমাদের প্ল্যানিং স্টাফরা,' বলেছেন কর্নেল ক্রসবি। জার্ভোসে জার্মান ট্রুপস ল্যাণ্ড করলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে, আমাদের বিরুদ্ধে। আশ্রমটা পেনিনসুলার দক্ষিণ প্রান্তে, তিন হাজার ফিট ওপরে। ওখান থেকে সবটা না হলেও কোস্ট রোড সহ সাগরের অনেকটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। আরও আছে। কি কারণে কেউ বলতে পারে না, মাউন্ট জার্ভোসের আকাশ প্রায় সব সময় নির্মল থাকে, মেঘ থাকে না বললেই চলে। তার মানে, অন্য কোথাও যখন দৃষ্টি সীমা কয়েক'শো গজের বেশি নয়, মাউন্ট জার্ভোস থেকে তখন মাইলের পর মাইল পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে জার্মানদের একটা অবজার্ভেশন পোস্ট থাকলে আমরা, আক্ষরিক অর্থেই, মারা পড়বো।'

এরপর, রয়্যাল আর্টিলারির একজন মেজর আরও কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছিল ম্যালোরিকে। গাল্ফের মাথা থেকে আরও সামনে পাহাড়ের সারি চমৎকার একটা ন্যাচারাল ডিফেন্স লাইন তৈরি করে রেখেছে, কিন্তু জার্মানরা যদি হামলা চালায়, এবং নিচের দিকের ঢালে তারা যদি ভারি কামান বসিয়ে নেয়, তাহলে এই প্রকৃতির পাহাড়ী আড়াল থেকে কোস্ট রোডের ওপর দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারবে তারা—শুধু যদি মাউন্ট জার্ভোসের ওপর তাদের একটা অবজার্ভেশন পোস্ট থাকে, সেখান থেকে তারা গাইড করতে পারবে বোমা বর্ষণ। মেজরের বিশ্বাস, জার্মানরা যদি কখনও মিত্রপক্ষকে এ রকম বেকায়দায় পায়, তখন

মাথার চুল ছিঁড়তে হবে শুধু, সর্বনাশ ঠেকাবার কোনো উপায়ই থাকবে না।*

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ম্যালোরি। হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো সে। দাবার বোর্ড গুটিয়ে জানতে চাইলো স্টাফ-সার্জেন্ট, 'কি হলো, মিঃ ম্যালোরি?'

'সেই জাহাজটা!' চাপা উত্তেজিত গলায় বললো ম্যালোরি। 'আরও, আরও কাছে চলে এসেছে! সী-প্লেন সম্পর্কে যাই বলো তুমি...'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ম্যালোরির পিছনে চলে এল গ্রীণ। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকালো। সত্যি তাই! মাঝখানে মাত্র সিকি মাইল ফাঁক রেখে অচেনা জাহাজটা এখন সমান্তরাল রেখা ধরে এগোচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, ফাঁকটা আরও যেন ছোট হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। 'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো গ্রীণ। 'খুব কাছে চলে এসেছে।' ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো কেমন যেন সড় সড় করে উঠলো তার। আরও কিছুক্ষণ পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো। না, টাট-রাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার কোনো লক্ষণই নেই জাহাজ-টার।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ম্যালোরি। 'না, আর আমি চুপ করে

---

* আরও পরে এই আশংকাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল মন্টি ক্যাসিনোয়। ওখানে একটা জার্মান অবজার্ভেশন পোস্ট থেকে মিত্রপক্ষের ট্রুপসের গতিবিধি লক্ষ্য করা হতো, তারপর জানিয়ে দেয়া হতো গোলন্দাজ বাহিনীকে।

বসে থাকতে রাজি নই, গ্রীণ।' পোর্টহোলের সামনে থেকে সরে এল সে।

সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্টের মুখের দিকে চিন্তিত ভাবে তাকালো গ্রীণ। 'কি করতে চান?'

'এসো, ক্যাপ্টেন মোপাসুর সাথে কথা বলি। নিশ্চয়ই সে-ও...' কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে জানতে চাইলো সে, 'ওটা কি?'

কান খাড়া হয়ে উঠলো গ্রীণেরও। 'মনে হলো, কেউ যেন আছাড় খেয়ে পড়লো প্যাসেজে। বোধহয় আমাদের দরজায় ধাক্কা খেয়েছে।'

'চলো, দেখি। কিন্তু সাবধানে!' অলস ভঙ্গিতে বাঙ্কের ওপর বসলো ম্যালোরি। ধীরে ধীরে হাতটা ঢুকিয়ে দিল বালিশের তলায়। ওর ওয়েবলিটা ওখানে রয়েছে। আধবোজা চোখে গ্রীণের দিকে তাকালো সে।

তালা দেয়া দরজার কাছে পৌঁছে গেছে গ্রীণ। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো সে, ইতস্তত করলো, পরমুহূর্তে শুনতে পেল একটা গোঙানির আওয়াজ। তালা খুললো সে। তারপর একটু একটু করে কবাট খুলতে শুরু করলো।

দেখেই লোকটাকে চিনলো গ্রীণ। গ্রীক স্টুয়ার্ড, কেবিন-গুলোর দেখাশোনা করে। কম্প্যানিয়নওয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। শরীরটা কাতরভাবে মোচড় খাচ্ছে, নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙানির আওয়াজ। প্যাসেজের এদিক-ওদিক দু'দিকে তাকালো গ্রীণ, কেউ নেই। একের পর

এক মস্ত সব ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে টাটরা, একবার উঠছে, একবার নামছে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লো গ্রীণ, সন্দেহ হলো হাত দিয়ে লোকটা নিজের তলপেট খামচে ধরে আছে। যতটা দেখতে পেল, কোথাও কোনো জখমের চিহ্ন নেই। আন্দাজ করলো, কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নেমে যাবার সময় নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বেচারা। ঘাড় ফিরিয়ে কেবিনের দিকে তাকালো সে। 'একজন স্টুয়ার্ড, মিঃ ম্যালোরি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি বরং একটু এগিয়ে দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা...'

'থামো!' বাধা দিল ম্যালোরি। ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিচ্ছে গ্রীণ, সেটা পছন্দ হয়নি তার। আর কিছু না, সাবধান হতে চায় সে। গ্রীণ সাহায্য নিয়ে আসার জন্যে চলে গেলে দু'জন আলাদা হয়ে যাবে ওরা। কেউ হয়তো ঠিক সেটাই চাইছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এই টেনশনের মধ্যে গ্রীণকে সে একা ছেড়ে দিতে পারে না। 'তারচেয়ে ধরাধরি করে ওকে ভেতরে ঢোকাই এসো। আগে পরীক্ষা করে দেখি।' গ্রীণকে সাহায্য করার জন্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে পা রাখলো সে।

সার্জেন্ট ধরলো স্টুয়ার্ডের পা, ম্যালোরি ধরলো কাঁধ। দু'-জনের হাতই খালি নেই। এই সময় পাশের কেবিনের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, যমদূতের মতো কম্প্যানিয়নওতে বেরিয়ে এল ছুঁচোমুখো মুলার।

মুলারের হাতে, কোমরের কাছে, একটা জার্মান মেশিন-

পিস্তল। গ্রীণের মাথার দিকে সেটা তাক করলো সে। কথা বললো ইংরেজীতে।

'গ্রীকটাকে নামিয়ে রাখো—আস্তে আস্তে। তারপর মাথার ওপর হাত তোলো। যদি গুলি করি, তোমার সাথে স্টুয়ার্ডও মারা যাবে। কাজেই হাঙ্গামা করতে যেয়ো না।'

ধীরে ধীরে স্টুয়ার্ডকে নামিয়ে রাখলো ওরা। নড়েচড়ে উঠলো স্টুয়ার্ড, মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকালো। লক্ষ্য করলো ম্যালোরি, আতংকে বিকৃত হয়ে আছে লোকটার মুখ। মাথার ওপর হাত তুললো ওরা। সিধে হয়ে দাঁড়াবার সময় ইচ্ছে করেই একটু ঘুরে গেল ম্যালোরি, যাতে প্যাসেজটা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমেই নজর পড়লো ওয়্যারলেস রুমের আধ খোলা দরজার দিকে। ভেতরে বসে রয়েছে অপারেটর, হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা। পরমুহূর্তে আড়ালে পড়ে গেল সে, দরজা দিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ডদেহী জার্মান, অটো ফ্র্যাংক। তার হাতে একটা ল্যুগার পিস্তল।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করে উঠে কঠোর সুরে বললো মুলার, 'দেয়ালের দিকে মুখ! জলদি! নড়েছো কি কপালে খারাবী আছে!'

দেয়ালের দিকে মুখ করলো ওরা। শরীরে ফ্র্যাংকের হাত অনুভব করলো ম্যালোরি। ওকে সার্চ করে গ্রীণের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো ফ্র্যাংক। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে ম্যালোরি। জার্মানদের স্পর্ধা কত! যুদ্ধটাকে তারা নির-

পেক্ষ এলাকায় টেনে নিয়ে এসেছে ! এর পরিণতির জন্যে তাদের-কেই দায়ী হতে হবে। বন্দী হবার পরমুহূর্ত থেকে মুক্ত হবার উপায় খুঁজতে শুরু করেছে সে। হুকুম পেয়ে উঠে দাঁড়ালো গ্রীক স্টুয়ার্ড। থরথর করে কাঁপছে সে। মুলারের কণ্ঠস্বর, চেহারার কাঠিন্য এবং মেজাজের বহর দেখে বুঝে নিল ম্যালোরি, কিছু করতে গেলেই গুলি করবে লোকটা। কিন্তু ওদের হাত-পা বেঁধে ফেললে তখন আর কিছু করার থাকবে না। কিছু যদি করতে হয়—এখুনি, চোখের পলকে, কিছু বুঝতে না দিয়ে। প্রথম এবং শেষ ওই একটা সুযোগই পাওয়া যাবে, কাজেই ব্যর্থ হলে চলবে না।

'বারবার সাবধান করে দেবো না,' বললো মুলার। 'কথা না শুনলে মরতে হবে। কেবিনের ভেতর ঢোকো, একজন একজন করে।'

দরজার সবচেয়ে কাছে রয়েছে ম্যালোরি, সাথে সাথে আদেশ-টা মেনে নিল সে। দরজা পেরিয়ে এত দ্রুত ভেতরে ঢুকলো, ব্যালেন্স ঠিক রাখতে পারলো না মুলার। ভেতরে ঢুকেই ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে কবাটের গায়ে ধাক্কা দিল ম্যালোরি। তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল মুলার, কবাটটা ছুটে এসে দড়াম করে বাড়ি খেলো তার মুখে।

কবাটে ধাক্কা দিয়েই বুঝলো ম্যালোরি, বালিশের তলা থেকে রিভলভার বের করার সময় পাবে না সে। স্যাৎ করে এক-পাশে, দরজার আড়ালে সরে গেল সে। পরমুহূর্তে আবার খুলে গেল দরজা, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মুলার। মেঝেতে তার

পা পড়লো, তারপর ম্যালোরির দিকে ফিরতে শুরু করলো সে। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই তার মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল চেপে ধরলো ম্যালোরি, ঝটকা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল মাজল। মুলার আশা করলো মেশিন-পিস্তলটা কেড়ে নেবার জন্যে নিজের দিকে টান দেবে ম্যালোরি, কিন্তু তা না করে সেটা মুলারের দিকে ঠেলে দিল ও।

অনুভব করলো, মুলারের হাত থেকে মেশিন-পিস্তলটা নিজের হাতে চলে এসেছে। পিছিয়ে আসতে যাবে, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে ওর তলপেটে ছুম করে গুঁতো দিল মুলার। সেই সাথে ওর কাঁধে যেন বজ্রপাত হলো—ফ্র্যাংকের একটা লোমশ হাতের ঘুসি। নিজের অজান্তেই হাঁটু দু'টো ভাঁজ হয়ে গেল ম্যালোরির। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা দেখলো ও। পড়ে যাচ্ছে, এই সময় ওর পাঁজরে এসে পড়লো মুলারের বুটের লাথি। ছিটকে দেয়ালে গিয়ে পড়লো ম্যালোরি।

আবার যখন হুঁশ ফিরলো, দেখলো ওর বুকে মেশিন-পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুলার। দোর-গোড়ায় দেখা গেল গ্রীণকে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছছে। তার দিকে ল্যুগার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্র্যাংক।

সাত

'ওঠো!' চাপা গর্জন বেরিয়ে এল মুলারের গলা থেকে। পিছিয়ে যেতে শুরু করলো সে।

কাঁধের ব্যথায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে ম্যালোরি। ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলো সে। অবাক হয়ে ভাবছে, এখনও বেঁচে আছি, কি করে? কাজটা আনাড়ির মতো হয়ে গেছে। প্রথমেই গ্রীণকে একটা সংকেত দেয়া উচিত ছিল। ফ্র্যাংক যতক্ষণ পাহারায় ছিল ততক্ষণ কিছু করতে পারেনি বেচারী। দু'জন যদি একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো, মুলারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারতো না ফ্র্যাংক। কাঁধের হাড় কি ভেঙে গেছে? শংকিত হয়ে উঠলো ম্যালোরি। মুহূর্তের জন্যে ব্যথা, বিপদ সব ভুলে গেল সে। কাঁধ ভেঙে গেলে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে তাকে। সামরিক ক্যারিয়ার গড়ে তোলার স্বপ্ন গোড়াতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। মুলারের ওপর প্রতিহিংসায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল তার। কিন্তু ধৈর্যের সাথে মাথাটাকে শান্ত রাখলো সে। প্রতিশোধ নেবার আরও অনেক সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় বার কোনো সুযোগ দেবে না মুলার, এবার সে গুলি করবে।

হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে দাঁড়ালো ম্যালোরি।

'ঘোরো! দেয়ালের দিকে ফেরো!'

দেয়ালের গায়ে একটা হাত রেখে তার ওপর মাথা ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগলো ম্যালোরি। পাশে এসে দাঁড়ালো গ্রীণ। কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ফ্র্যাংক, বন্ধ করে দিল দরজা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আসলে চায় কি এরা?—ভাবলো ম্যালোরি। হাতের ওপর থেকে মাথা তুলে গ্রীণের দিকে তাকালো সে। ঠাণ্ডা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে, এক চুল নড়ছে না সে, আসলে মুলারকে বোঝাতে চাইছে তার কাছ থেকে বিপদের কোনো ভয় নেই। ওকে চেনে ম্যালোরি, সামান্যতম সুযোগ পেলেও মুলারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। কিন্তু, কিছু করে বসার আগে সাফল্যের সম্ভাবনাটুকু হিসেব করে নেবে। নব্বুই ভাগ আশা না থাকলে ঝুঁকি নেবার বান্দা গ্রীণ নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে মুলারের দিকে তাকালো ম্যালোরি। একবার ভুল করে আরও বেশি সতর্ক হয়ে গেছে লোকটা। ওদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে গেছে সে। ওদের নড়াচড়ার আভাস পাবার পর অনেক সময় পাবে গুলি করার। না, ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না।

'ফেরো,' বললো মুলার।

ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে পিছন ফিরলো ওরা।

'এই জাহাজে কেন উঠেছো তোমরা, সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ব্রায়ান ম্যালোরি ?' জানতে চাইলো মুলার।

টেবিলের দিকে তাকালো ম্যালোরি। ওদের সব কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অস্ত্রের জন্যে তল্লাশী চালাতে গিয়ে ওগুলো ওদের পকেট থেকে উদ্ধার করেছে ফ্র্যাংক। এরই মধ্যে সব নেড়েচেড়ে দেখা হয়ে গেছে মুলারের।

উত্তর দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করছে ম্যালোরি। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে ও, সময়ের খুব অভাব মুলারের। প্রশ্নের মধ্যে উদ্বেগের সুর, সেটাও টের পেয়ে গেছে ও।

'কি, জবাব দেবে না ?'

আরও কিছু সময় নষ্ট করে বললো ম্যালোরি, 'জাহাজে কেন উঠেছি ? কেন, ইস্তাম্বুল থেকে জার্ভোসে যাবো, তাই।'

কোনো তথ্য পেল না মুলার। ম্যালোরির মনে হলো, ভয়ংকর ভুল করে বসেছে সে। ট্রিগারে চেপে বসলো মুলারের আঙ্গুল, সাদা হয়ে গেল নখ। বুলেটের ধাক্কা লাগবে, নিজের অজান্তেই খিঁচ পড়লো ম্যালোরির পেশীতে।

নিজেকে সামলে নিল মুলার, ঠোঁটের দু'কোণ বাঁকা করে কুৎসিত হাসলো সে। 'সে তো আমি বুঝতেই পারছি। এবার, সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ম্যালোরি, সার্জেন্ট গ্রীণের নাভিতে গুলি করার আগে প্রশ্নটা আরও একবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবো আমি। তোমরা এই জাহাজে, ঠিক আজকের রাতে ট্র্যাভেল করছো কেন ? প্রশ্নটা পরিষ্কার ? গুড।'

বগলের তলা আর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে ম্যালো-

রির। মুলার কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু সেটা মুলারকে বিশ্বাস করানো যাবে না। দ্রুত, মরিয়া হয়ে ভাবছে ও, এমন একটা উত্তর দিতে হবে অন্তত খানিকটা হলেও মুলার যেন সন্তুষ্ট হয়। কি বললে সেটা সম্ভব, বুঝতে পারলো না। অগত্যা, বুদ্ধি করে প্রথমে একটু হাসলো সে। আশা, পরিবেশটাকে যদি হালকা করে তোলা যায়। উত্তর না দিয়ে যথাসম্ভব সহজ সুরে জানতে চাইলো সে, 'নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি, জার্মান আর্মিতে আছো তোমরা?' এই প্রথম মুলারের চেহারায় ক্ষীণ একটু অনিশ্চিত ভাব লক্ষ্য করা গেল। সুযোগটা সাথে সাথে নিল ম্যালোরি। 'তাহলে তুমি জানো, জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অনুসারে আমরা শুধু তোমাকে নাম, র‍্যাঙ্ক আর নাম্বার বলতে পারি। সেগুলো এরই মধ্যে পেয়ে গেছো তুমি টেবিলে।'

ট্রেনিং পাওয়া লোক মুলার, সময় পেলেই রাগ পড়ে যাবে তার। ম্যালোরির এই অনুমানটাই ঠিক হলো। ধীরে ধীরে মেশিন-পিস্তলের মাজল গ্রীণ আর ম্যালোরির মাঝখানে তাক করলো সে, যাতে সহজেই যে-কোনো দিকে গুলি করা যায়। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, নিজেকে সামলে নিয়েছে মুলার। ম্যালোরি যে স্বস্তিবোধ করলো, তা নয়। বুঝলো, মুলারের ট্রেনিং অত্যন্ত উঁচু দরের। ভাবাবেগ দমন করার দুর্লভ গুণ অর্জন করেছে সে। কিন্তু সেই সাথে এ-ও বোঝা গেল, হঠাৎ করে লোকটার ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রতিপক্ষের জন্যে সেটা একটা ভয়ংকর মুহূর্ত।

'টার্কিতে কি করছিলে তোমরা ?' হঠাৎ জানতে চাইলো মুলার।

'এথেন্সে ফেরার জন্যে জাহাজের একটা বার্থ খুঁজছিলাম,' উত্তর দিতে দেরি করলো না ম্যালোরি। 'আমাদের এই সাদা পোশাক তুর্কীদের কাছ থেকে ধার করা।'

'টার্কিতে এলে কিভাবে ?'

'দু'দিন আগে উপকুল থেকে কিছু দুরে মাইন বিস্ফোরণে ডুবে যায় আমাদের জাহাজ,' গড়গড় করে বলে গেল ম্যালোরি। 'মরেই গিয়েছিলাম, জ্ঞান ফিরতে দেখি আমাদেরকে উদ্ধার করে তীরে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। এই দু'জনই বেঁচে গেছি আমরা।' কিছু বলতে যাচ্ছিলো মুলার, তাকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললো সে, 'জাহাজের নাম, কতজন ছিলাম আমরা, এসব জিজ্ঞেস করো না। আমি যদি পিস্তল ধরতাম, তুমিও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না। আর, তুর্কীরা আমাদেরকে আটক করেনি কেন, সে-কথাও জানতে চেয়ো না। শুধু বলতে পারি, ওরা আমাদেরকে বিদায় করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল। রেগুলার ইস্তাম্বুল-এথেন্স সার্ভিসে পাঠাতে চেয়েছিল আমাদেরকে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সার্ভিসটা বাতিল করা হয়। তাই এই ফেরীতে দেখতে পাচ্ছো আমাদের। ওরা বললো, এটাই একমাত্র জাহাজ।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে শুরু করলো ম্যালোরি। ডান কাঁধটা এখন আর ব্যথা করছে না, কিন্তু ভয়ের কারণ হলো, ওটা থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছে না সে। লক্ষ্য করলো সহজ হয়ে এসেছে মুলারের চেহারা। বোধহয় ওর কথা বিশ্বাস

করেছে সে। নিজেকে আরও বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যে আবার মুখ খুললো ও, ভুলে গেল, অতি কোনো কিছুই ভাল নয়।

'আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে,' বললো ম্যালোরি। 'এই ফেরীতে চড়তে না হলে তোমাদের হাতে বন্দী হতে হতো না। কিন্তু ভুলো না, রয়্যাল নেভিই কন্ট্রোল করছে ঈজিয়ানকে। কাছে-পিঠে যদি কোনো ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার থাকে, তোমার ওই মেশিন-পিস্তল আমার হাতে চলে আসতে দেরি হবে না। কাজেই, হুমকি দেখাতে এসো না।'

শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল মুলারের। 'কাছেপিঠে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার আছে?' সোজা ম্যালোরির বুকে মেশিন-পিস্তল তাক করলো সে। 'তুমি জানো?' ঠাণ্ডা, অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করলো। তার চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল পেশী। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুলার, মেশিন-পিস্তল ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে। বিপদটা টের পেতে অসুবিধে হলো না ওদের। যে-কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে মুলার। ভুলটা যে কোথায় করেছে, বুঝতে পারলো না ম্যালোরি। সাবধানে, দ্রুত কথা বললো সে, চোখ রাখলো মুলারের মুখে, যাতে সাথে সাথে তার কথার প্রতিক্রিয়া ধরতে পারে।

'আমি নির্দিষ্ট কোনো ডেস্ট্রয়ারের কথা ভাবছি না। আমি আর্মির লোক, নেভির নই—তুমি জানো। কিন্তু এদিকের পানিতে সব সময় টহল দেয় রয়্যাল নেভি—তার মানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের—তোমাদের, নয়তো আমাদের।' অনুভব করলো, পিঠ

বেয়ে সড় সড় করে ঘামের ধারা নেমে আসছে। সাহস করে গ্রীণের দিকে তাকালো না সে, মুলার যদি ভেবে বসে কোনো সংকেত দেবার চেষ্টা করছে। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে এখন দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে।

'ঘোরো। শুয়ে পড়ো মেঝেতে। হাত দু'টো যতদূর যায় মেলে দাও।'

হুকুমটা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লো ম্যালোরি। এত ঘন ঘন মুড বদলায় মুলারের, কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব। তবু, খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো সে। অন্তত পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে ধাঁধার উত্তর দিতে হবে না আর। হাঁটু ভাঁজ করে মেঝেতে রেখেছে, এই সময় হুকুমটার অর্থ ধরতে পারলো সে। চোখের কোণ দিয়ে দেখলো, গ্রীণের মাথার দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে মেশিন-পিস্তলের বাঁট। খুলিতে এসে লাগলো সেটা, সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো গ্রীণ। ঝট্ করে মাথা ফিরিয়ে মুলারকে কিছু বলতে গেল ম্যালোরি, দেখলো, মাজলটা ওর দু'চোখের মাঝখানে তাক করে ধরেছে মুলার। ম্যালোরির মুখের ভেতর জমে গেল আওয়াজ, একটা শব্দও বেরুলো না।

'সামনে তাকাও।' বলেই ম্যালোরির মাথার পাশে মেসিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি বসিয়ে দিল মুলার। চোখের সামনে আলোর একটা বিস্ফোরণ দেখলো ম্যালোরি। তারপরই অন্ধকার হয়ে গেল সব।

দরজা খুললো রাহাত। সাথে সাথে ওর নাকের পাশে চেপে

বসলো রাইফেলের মাজল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে হুমকি দেয়া হলো ওকে। 'দুঃখিত, হের মেয়র। পরবর্তী অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত আপনি এই কেবিন ছেড়ে কোথাও বেরুবেন না।'

'কার অর্ডার?' হাত দু'টো পিছনে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রাহাত, চেহারায় ভয় বা বিস্ময়ের লেশ মাত্র নেই। আগের মতোই উগ্র, মেজাজী, থমথমে দেখালো তাকে। রাইফেলের ট্রিগার টিপে দিলে মগজ উড়ে যাবে, কিন্তু সে ব্যাপারে তার যেন কোনো হুঁশই নেই। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো হাতের একটা ঝাপটা দিয়ে রাইফেলের ব্যারেল সরিয়ে দিতে যাচ্ছে সে, সোজা এগোতে শুরু করে পথ থেকে ঠেলে ফেলে দেবে ফ্র্যাংককে।

প্রশ্ন শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল প্রকাণ্ড ফ্র্যাংক। বদ-মেজাজী মেয়রকে কিভাবে সামলাবে, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু তার পাশে দাঁড়ানো মুলার রাহাতের এই আচরণ দেখে একটুও অবাক হয়নি।

'জার্মান সেনাবাহিনীর অর্ডারে,' জবাব দিল ফ্র্যাংক।

ফ্র্যাংককে ছাড়িয়ে সামনে, মুলারের ওপর চোখ পড়লো রাহাতের। ঠাণ্ডা দৃষ্টি, অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। মুলারের মনে হলো, ফ্র্যাংককে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে মেয়র। নিজের অজান্তেই হাতের মেশিন-পিস্তলটা তুললো সে।

'গাধা!' ফ্র্যাংককে সম্বোধন করলো রাহাত। 'ওটা কোনো উত্তর হলো না।' মুলারের চোখ থেকে দৃষ্টি সরালো না, আবার বললো, 'শুধু গাধা নও, অসভ্যও! কোটের তিন নম্বর বোতামটা লাগাতে ভুলে গেছো!' ঝট্ করে কোটের বোতামের দিকে

তাকালো ফ্র্যাংক। বিস্ময়ের ধাক্কাটা তাকে কাটিয়ে উঠতে দিল না রাহাত, আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'অফিসারের নাম বলো।' সুর শুনে মনে হতে পারে একজন কর্নেল তাঁর অধীনস্থ সৈনিককে জেরা করছে।

'লেফটেন্যান্ট ডাইস মুলার, অ্যালপেনকর্প্স,' সাথে সাথে জবাব দিল ফ্র্যাংক। পেশীতে টান পড়লো, নিজের অজান্তেই আরেকটু হলে স্যালুট করতে যাচ্ছিলো রাহাতকে। উত্তরটা দিয়ে ফেলে নিজের ওপরই রাগ হলো তার, কিন্তু সেই সাথে অনুভব করলো সামনে দাঁড়ানো লোকটার মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্বের ভাব আছে, এড়ানো কঠিন। 'আপনি কেবিন থেকে বেরুতে পারবেন না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? অনুমতি ছাড়া যাকেই দেখা যাবে বাইরে, সাথে সাথে গুলি করা হবে।' বলেই বুঝলো, তার একটা কথাও হয় বিশ্বাস করেনি লোকটা, নয়তো আমল দেয়নি। চেহারায় সেই আগের উগ্রভাব অটুট থাকলো, নিঃশ্বাসের পতনও অনিয়মিত হলো না। কে হতে পারে লোকটা?

'লেফটেন্যান্ট মুলার?' আস্তে করে বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইলো রাহাত। তারপর বললো, 'বেশ, বেশ। পরে, যখন সময় হবে, নামটা আমার অবশ্যই মনে পড়বে।'

মুলারের চেহারায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। রাহাতের কথা যেন শুনতেই পায়নি সে। ঠাণ্ডা সুরে বললো, 'কেবিনের চাবিটা সার্জেন্টকে দিন, প্লিজ। বাইরে থেকে দরজায় তালা দেবে ও।'

চেহারায় চিন্তার ভাব নিয়ে ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড মুলারের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাহাত, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো সে। এগুতে গেল, কিন্তু এগোলো না। এখনও যেন মনস্থির করতে পারেনি এই রকম একটা ভঙ্গি করে এক পাশে সরে গেল, তাতে ওর শরীরের একটা অংশ দরজার আড়ালে পড়লো। এই সুযোগে ল্যুগারটা কোটের পকেটে ভরে রাখলো ও। আবার ঘুরলো। বুঝিয়ে দিল, নিজের হাতে চাবি দেবার ইচ্ছে নেই ওর।

সার্জেণ্ট ফ্র্যাংককে সামলানো কঠিন কিছু নয়, জানে রাহাত। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট মুলার অন্য জিনিস। ঠাণ্ডা মাথার লোক, উত্তেজিত হলেও অস্থির হতে জানে না। তাছাড়া, তার হাতে ওটা একটা মেশিন-পিস্তল। 'হুম' করে একটা আওয়াজ ছেড়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলো মুলার, রাহাতকে পাশ কাটিয়ে এগোলো কেবিনের ভেতর। হুক থেকে চাবি নিয়ে একটু পরই আবার কম্প্যা-নিয়নওয়েতে বেরিয়ে এল সে। রাহাতের দিকে তাকালো না, বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ধীরে ধীরে। তারপর তালা লাগালো।

চিন্তিতভাবে পায়চারি শুরু করলো রাহাত। থমথমে হয়ে আছে চেহারা। যতটা আশংকা করেছিল ও তারচেয়ে সিরিয়াস ব্যাপার—গোটা জাহাজ হাইজ্যাক করছে ওরা।

নক শুনে দরজা খোলার সময় ধরে নিয়েছিল, খুন করার জন্যে আততায়ী এসেছে। কিন্তু ওদের কথা শুনে পরিষ্কার হয়ে গেছে, বিশেষভাবে তার ব্যাপারে ওদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। জার্মান সেনাবাহিনীর বড় ধরনের কোনো অপারেশনের অংশ

এটা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা একপাশে কাত করলো রাহাত। হ্যাঁ, যা ভেবেছে—টাটরার ইঞ্জিন মন্থর হয়ে আসছে। নিশ্চয়ই মাঝ-সাগরে কিছু একটা ঘটবে। হয়তো আরও একটা জাহাজ আসবে। ইঞ্জিন রুম আগেই দখল করে নিয়েছে ওরা। ইতিমধ্যে হয়তো ব্রিজের দায়িত্বও চলে এসেছে হাতে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করছে ওরা, করণীয় খুঁটিনাটি সব আগে থেকেই স্থির করা আছে। মস্ত ট্রাঙ্ক নিয়ে কেবিনের ভেতর লুকিয়ে আছে বেন ফকার, কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ট্রাঙ্কে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র আছে।

অ্যাশট্রে থেকে নিভে যাওয়া চুরুট তুলে ধরালো সেটা। আলো নিভিয়ে দিয়ে টর্চ জেলে এগোলো পোর্টহোলের দিকে। প্রায় থেমে গেছে টাটরার ইঞ্জিন। রুপেসকু এত কাছে চলে এসেছে, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। নিজেকে আড়াল করার কোনো চেষ্টা করলো না রাহাত, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে রুমানিয়ান জাহাজ থেকে জার্মান ট্রুপসের অবতরণ দেখতে লাগলো। গ্রীক ফেরী টাটরার ডেক ভরে উঠলো লাইফ-জ্যাকেট পরা সৈনিকদের ভিড়ে। সাগর যদি আগের মতো উত্তাল থাকতো, এই অবতরণ সম্ভব হতো না। একেই বলে জার্মান ভাগ্য, ঠিক সময় মতো প্রকৃতিও ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফ্রান্সের কথা মনে পড়লো ওর। উনিশশো চল্লিশ সালেও আবহাওয়া ওদেরকে ফেভার করেছিল। ভাগ্যের সহায়তা ছাড়া খুব বেশি দূর কেউ যেতে পারে না, ভাবলো রাহাত। রুপেসকু

থেকে বোটে নামলো আরও কিছু জার্মান সৈন্য। বোট এগিয়ে আসতে শুরু করলো টাটরার দিকে। অন্তত বিশ বাইশ জন লোক রয়েছে। এখন উল্টে গেলে বড় ভাল হয়! পরমুহূর্তে মনে হলো, ওর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নামার সময় কিভাবে যেন বাঁকা হয়ে গেল বোট, ঢেউয়ের ঢালে থাকতেই চরকির মতো আধপাক ঘুরে গেল। কারণটা হঠাৎ টের পেল রাহাত। রপেসকু থেকে রশি খুলে দেয়া হয়নি। উল্টেই যাচ্ছিলো বোট, কিন্তু রুমানিয়ান জাহাজ থেকে একজন নাবিক তাড়াহুড়ো করে খুলে দিল রশিটা। আবার সাবলীল-ভাবে ঢেউয়ের গা থেকে নামাতে শুরু করলো বোট।

সৈনিকদের মাথায় নরম, চোখা মুকুট লাগানো ক্যাপ রয়েছে। প্রতিটি সৈনিক অস্ত্রের ভারি বোঝা বইছে। অ্যালপেনকর্প্স্। মাউন্টেন ট্রুপসের একটা ইউনিট, এরাই নরওয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করার ট্রেনিং রয়েছে এদের। জার্ভোস পেনিনস্যুলায় এদের কোনো অসুবিধে হবে না।

পোর্টহোলের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রাহাত। এ পর্যন্ত দু'শো মাথা গুণেছে ও। জার্ভোস দখল করার জন্যে যথেষ্ট, তবে দখল বজায় রাখার জন্যে হেভী রিইনফোর্সমেন্টের দরকার হবে। খুব তাড়াতাড়িই দরকার হবে।

জার্ভোস দখল করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না ওদে-রকে। পেনিনস্যুলায় মিত্রপক্ষ যদি ট্রুপস না পাঠায়, ওদের সামনে পড়বে আশ্রমের কিছু নির্বিরোধী সন্ন্যাসী আর কাটায়রার

জনা কয়েক জ্বেলে। কাজেই কিছু অসুবিধে নেই। সৈনিকরা সবাই টাটরায় চলে এসেছে। এমন কি ক্রুদেরকেও জাহাজ ছেড়ে চলে আসতে দেখলো রাহাত। খানিক পরই আবার প্রাণ সঞ্চার হলো টাটরার ইঞ্জিনে।

ভুরু কুঁচকে উঠলো রাহাতের। টাটরা এগোতে শুরু করেছে আবার। সব আলো নিভিয়ে দিয়ে সাগরে একা ভাসছে রুপেসকু। কি রকম হলো ব্যাপারটা? ক্রু ছাড়া রুপেসকু ফিরবে কিভাবে? কাচের ঢাকনি সরিয়ে পোর্টহোল দিয়ে বাইরে মাথা বের করে দিল ও। বাতাস তো নয়, চোখে মুখে যেন মৌমাছির হুল বিঁধলো। যা ভেবেছিল তাই। রুপেসকুর সী-কক খুলে দেয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে মাঝ- সাগরে ডুবে যাচ্ছে রুমানিয়ান জাহাজ। যতক্ষণ দেখা গেল, তাকিয়ে থাকলো রাহাত। এক সময় রুপেসকুর সুপারস্ট্রাকচার তলিয়ে গেল পানির নীচে।

মাথা টেনে নিয়ে পোর্টহোলটা বন্ধ করে দিল রাহাত। আলো জ্বেলে হাত দিয়ে শরীরের ছ'পাশ চাপড়াতে লাগলো। গা একটু গরম হয়ে উঠতে বাঙ্কের ওপর বসলো ও। শুয়ে পড়ার প্রচণ্ড ঝোঁকটাকে দমাবার জন্যে নতুন আরেকটা চুরুট ধরালো। সমস্যাটা পরিষ্কার নয় এখনও, কিন্তু ইতিকর্তব্য স্থির করতে কোনো বাধা নেই ওর। নির্দিষ্ট একটা টাইম-টেবল ধরে কাজ করছে ওরা। এটা জার্মানদের একটা গুণ, কিছু করার আগে প্ল্যান তৈরি করে। কিন্তু ওদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, কাজে লাগাতে গিয়ে যদি দেখে প্ল্যানটা ঠিকমত কাজ করছে না, ঘাবড়ে যায় ওরা, নিয়মের বাইরে এক পা ফেলতে ভয় পায়।

মনে মনে ঠিক করলো রাহাত, ওদের এই দুর্বলতার সুযোগ নেবে সে। কিন্তু তার আগে বিনা বাধায় জাহাজে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দরকার তার। অনুমতি পাওয়া যাবে না, আদায় করে নিতে হবে। নিজের ছদ্ম-পরিচয়টা ব্যবহার করতে হবে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ ঘষে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করলো রাহাত। উঠে দাঁড়ালো। টেবিল থেকে নিয়ে মাথায় পরলো হ্যাট। আরও জার্মান জার্মান ভাব এসে গেল চেহারায়। ওয়াশবেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকালো। মুখটাকে গম্ভীর করে তোলার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই ফুটে আছে গাম্ভীর্য। তুমি রিচার্ড মেয়র, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, খেয়াল রেখো কথাটা।

ওদেরকে এখন রেডিও সাইলেন্স মেইন্টেইন করতে হবে, কাজেই ওর পরিচয় চেক করে নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। পরিচয় দেবার সময় ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেটার ওপর নির্ভর করছে সব।

কেবিনের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে দরজার দিকে মুখ করে বসলো রাহাত। মুখোমুখি হবার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে ও।

মাঝরাতে এল ওরা।

আট

লেফটেন্যাণ্ট মুলারের পরনে এখন অ্যালপেনকর্‌প্‌স্‌ ইউনিফর্ম। হাতে নয়, মেশিন-পিস্তলটা শোলডার হোলস্টারে। রাহাতের কেবিনের সামনে দাঁড়ালো সে। চাবি দিয়ে তালা খুললো। তারপর পায়ের ধাক্কায় খুলে ফেললো কবাট।

চেয়ারে বসে আছে রাহাত। পা দু'টো সামনের দিকে লম্বা করা। এক পায়ের আঙুলের ওপর আরেক পায়ের গোড়ালি তুলে দিয়েছে। এখনও পরে আছে হ্যাট আর কোট। নতুন একটা চুরুট জ্বলছে তার ঠোঁটে। কেবিনের দরজা দড়াম করে খুলে যেতে তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটালো না। আগের মতো শরীর ঢিল হয়ে আছে, চোখ ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত দৃষ্টি। অলস ভঙ্গিতে হাত দু'টো বুকের ওপর ভাঁজ করলো সে। মুখ তুলে এমন দৃষ্টি হানলো, যেন লেফটেন্যাণ্ট মুলারের দিকে তো নয়, কোনো পচা অখাদ্যের দিকে তাকালো। তারপরই তার মনোযোগ পড়লো চৌকো, গরিলাসদৃশ্য একটা মুখের ওপর। এত বড় মুখ জার্মান-দের মধ্যেও দুর্লভ। লোকটার বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, চোখ

দুটো স্বচ্ছ নীল, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা খাড়া তলোয়ারের মতো। চেয়ারে বসা রাহাতের দিকে শান্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গায়ে একটা বোতাম খোলা সিভিলিয়ান কোট চড়ানো থাকলেও, অ্যালপেনকরপ্সের বুট আর ইউনিফর্ম দেখতে পেল রাহাত।

'ইনি কর্নেল ব্রিজেলবার্ড,' কর্কশ সুরে জানালো মুলার। কথাটা বলে একটু বিরতি নিল সে, নিশ্চয়ই দ্রুত কোনো প্রতিক্রিয়া হবে বলে আশা করলো। তারপর চেহারায় রাগের ভাব এনে কঠিন সুরে বললো, 'একজন কর্নেলের সামনে লোকেরা সাধারণত উঠে দাঁড়ায়।'

'এই লোকটাকে বিদায় করে দিলে আমরা কথা বলতে পারি,' চেহারায় আগ্রহ এবং বিস্ময় নিয়ে রাহাতকে লক্ষ্য করছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, কথাটা তাকেই উদ্দেশ্য করে বললো রাহাত।

স্পর্ধা কিনা কে জানে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে, ভাবলো কর্নেল। কেবিনে একজন কর্নেলের উপস্থিতিও তাকে ব্যস্ত করে তোলেনি। অবাক কাণ্ড! 'আমাদের দু'জনের সাথেই কথা বলতে পারেন আপনি,' কর্তৃত্বের সুরে বললো কর্নেল। 'আমার সাথে একা কথা বলা দরকার আপনার, তার কোনো কারণ দেখছি না আমি।' বলেই বুঝলো কর্নেল, ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে চায়নি সে। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট একটা ভাব এসে গেছে তার মধ্যে। উচিত ছিল কড়া ধমকের সাথে জানিয়ে দেয়, কিছু বলতে চাইলে দু'জনের সামনেই বলতে হবে।

'আমি যা বলবো তা শোনার অধিকার জুনিয়ার অফিসারদের

নেই,' রাহাতের চেহারা থেকে উদ্বেগহীন ঢিলেঢালা ভাবটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ফুটে উঠছে গাম্ভীর্য। 'আমার বিশ্বাস, আপনার হাতে সময় খুব কম। কাজেই যা বলছি করুন।'

অর্ডার করে! এবার শুধু বিস্মিত বা আগ্রহী নয়, সতর্ক হয়ে গেল কর্নেল। সময় কম, লোকটা জানলো কিভাবে? সময় যে কম সেটা সে নিজেই বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে পিছনে ফেলে লোকটাই আগেভাগে বলে ফেললো কথাটা। রাহাতকে আরও তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করতে শুরু করলো কর্নেল। লোকটার উগ্রভাব তাকে আরও আড়ষ্ট করে তুললো।

মনে মনে যাই ভাবুক কর্নেল, চেহারায় কোনো ভাবের প্রকাশ ঘটলো না। লেফটেন্যান্ট মুলারের দিকে ফিরলো সে, বললো, 'অনেক কাজ তোমার, সেগুলো দেখো। তোমাকে আমি ডেকে পাঠাবো।'

প্রতিবাদের সুরে বললো মুলার, 'ওর কাছে আর্মস থাকতে পারে!'

'থাকতে পারে নয়, আছে,' কেবিনের ভেতর গমগম করে উঠলো রাহাতের ভারি গলা। আর্মস আছে শুনলে অন্য কোনো অফিসার হয়তো চমকে উঠতো, সিভিল ড্রেস পরা একজন লোকের কাছে আর্মস থাকাটাকে মারাত্মক একটা অপরাধ বলে ধরে নিত। কিন্তু জার্মান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ, এক কথায় চৌকস একটা শাখাকে কমাণ্ড করার জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ডকে, স্বাধীনচেতা আচরণ দেখে অভ্যস্ত সে, শেষটা না দেখে বিচলিত হবার পাত্র নয়। 'আমি একটা ল্যুগার

পিস্তল বের করতে যাচ্ছি,' মুলারের দিকে চোখ রেখে বললো রাহাত। 'কাজেই, নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করো—সেই সাথে তোমার মেশিন-পিস্তলটাকে।' কোটের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে পাশের টেবিলে রাখলো ও। 'কথা প্রসঙ্গে বলছি, পিস্তলটা লোড করা আছে। প্রয়োজনে আর্মস ব্যবহার করি আমি, ব্যবহার করার ভান করি না। অবশ্য ব্যবহার করার সুযোগ খুব কম হয়।'

কর্নেল লক্ষ্য করলো, ওটা একটা রেগুলেশন পিস্তল। ডঃ রিচার্ড মেয়র তাকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুললো।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো মুলার। ইচ্ছে হলো, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নেয় পিস্তলটা। কিন্তু রাহাতের সম্পূর্ণ মনোযোগ কর্নেলের দিকে রয়েছে বলে ভেতর থেকে কোনো-রকম চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো না সে। মেয়র লোকটা যেন তার অস্তিত্বের কথা মনেই রাখেনি। সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে বুদ্ধির জন্যে কর্নেলের দিকে তাকালো সে।

'তুমি যাও,' সংক্ষেপে বললো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। 'দরকার হলে ডেকে পাঠাবো, নাহয় ব্রিজে আসছি আমি।'

কেবিনের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রাহাত। তারপর চেয়ার ছেড়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো ও। আচরণে কোনো রকম আড়ষ্ট ভাব নেই। মাথা উঁচু করে কি যেন ভাবছে। হাত দু'টো কোটের পকেটে ঢোকানো। পা দু'টো জার্মান সেনানায়কদের ভঙ্গিতে বড় বেশি ফাঁক করা। এইভাবে ঝাড়া পনেরো সেকেণ্ড কাটার পর হঠাৎ ঘুরলো ও। একটা হাত

বেরিয়ে এল পকেট থেকে। টেবিলের ওপর কি যেন ফেলে তাকালো কর্নেলের চোখে। 'আমার কাগজ, কর্নেল।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে টেবিল থেকে কার্ডটা তুলে নিল কর্নেল। সাথে সাথে খেয়াল হলো তার, বড় বেশি অস্থিরতা প্রকাশ করা হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে, খুঁটিয়ে কার্ডটা পরীক্ষা করলো সে। মুখ তুলতেই দেখলো, তার দিকে তাকিয়ে আছে ডঃ রিচার্ড মেয়র, চেহারায় বিশেষ কোনো ভাব নেই। 'আপনি একজন আর্কিওলজিস্ট, ডঃ মেয়র?' গলার সুর শুনে মনে হলো, কর্নেল বলতে চাইলো—ও, তুমি এই? মনে মনে ধরে নিয়েছিল, নিশ্চয়ই বার্লিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক লোককে পাঠানো হয়েছে। রাহাতের উগ্র আচরণের আর কোনো কারণ খুঁজে পায়নি সে।

'আরও ভাল করে লক্ষ্য করুন ওটা,' প্রায় ধমকে উঠলো রাহাত। 'কোথাও কোনো ভুল-ভাল আছে কিনা দেখুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার মুখ তুললো কর্নেল। 'না!'

'গুড!' অত্যন্ত মানানসই ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কার্ডটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে ভরলো রাহাত। 'আমি এমন একটা গ্রীক ফেরীতে ট্রাভেল করছি যেটাকে যে-কোনো মুহূর্তে থামিয়ে সার্চ করতে পারে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার। এই পরিস্থিতিতে, নিশ্চয়ই আপনি আশা করবেন না, ওদেরকে যে কার্ডটা দেখাবো তাতে লেখা থাকবে আমি একজন অ্যাবওয়েরের অফিসার?'

ছ্যাঁৎ করে উঠলো কর্নেলের বুক। অ্যাবওয়ের? সর্বনাশ! অ্যাডমিরাল ক্যানারিসের ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন অ্যাবওয়ের। জার্মান সেনাবাহিনীতে এমন কোনো অফিসার নেই যে

এই অ্যাডমিরাল আর তাঁর অর্গানাইজেশনের কথা শোনেনি। কতটুকু প্রভাব তাঁর, কেউ তা আন্দাজ পর্যন্ত করতে পারে না। কোথায় কি করতে যাচ্ছে, কখনও তা কারও কাছে প্রকাশ করে না অ্যাবওয়েরে, কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অ্যাবওয়েরের একজন এজেন্ট আরেকজন এজেন্টের কাছে নিজের অ্যাসাইনমেন্টের কথা গোপন করে রাখে। এজেন্টদের গতিবিধি সম্পর্কে শুধুমাত্র খবর রাখেন অ্যাডমিরাল একা। এজেন্টরা কেউ কাউকে রিপোর্ট করে না, রিপোর্ট করতে হলে তাকে প্রথমে পৌঁছুতে হবে বার্লিনে। অ্যাডমিরাল ক্যানারিস ছাড়া আর কারও কাছে দায়ী নয় তারা। অ্যাডমিরাল ক্যানারিস তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে, এবং স্বয়ং ফুয়েরার ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। অ্যাবওয়েরকে কেউ পছন্দ করে না···বলা উচিত, কেউ ভয় না করে পারে না। বিশেষ করে রেগুলার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো অ্যাবওয়েরের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকে। তার কারণ, অ্যাবওয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাউকে জমা খরচ দিয়ে চলতে হয় না তাকে। তাছাড়া, সেনাবাহিনীর ভেতর যখনই তুষের আগুনের মতো অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, সেটা মাথাচাড়া দেবার আগেই ফুয়েরারের কানে খবরটা পৌঁছে দেয় তারা। আরও আছে। কেউ বলতে পারে না কি এক অলৌকিক উপায়ে শত্রুপক্ষের মতলব আগে থাকতেই ঠিক ঠিক টের পেয়ে যান অ্যাডমিরাল ক্যানারিস, তাঁর কথা প্রতিবার ফলে যায় অক্ষরে অক্ষরে।

অ্যাবওয়ের যে কি জিনিস, জানে কর্নেল, কিন্তু এই প্রথম

তার মুখোমুখি পড়লো সে। অবশ্য, লোকটা যদি সত্যি একজন অ্যাবওয়ের অফিসার হয়…। আবার কি যেন পড়লো টেবিলে, সাথে সাথে সন্দিগ্ধ চোখে সেদিকে তাকালো সে। এটাও একটা কার্ড।

'আমাদের থামানো হলে ল্যুগার আর এই কার্ড পোর্টহোল দিয়ে ফেলে দেবো,' বললো রাহাত।

ঝুঁকে পড়ে কার্ডটা তুলে পরীক্ষা করতে শুরু করলো কর্নেল। আবার যখন মুখ তুললো, দেখলো, পোর্টহোলের সামনে গিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

'আমি যে মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছি না সেটা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে আপনাকে,' বললো রাহাত। কর্নেলের দিকে পিছন ফিরেই আছে সে। 'বার্লিনে ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়ে খবর নিতে হবে আপনাকে। আমি আপনাকে সিগন্যাল কোড দিতে পারি।'

'সাগরে থাকতে তা সম্ভব নয়,' নিজের গাম্ভীর্য অটুট রেখে বললো কর্ণেল। 'যে-কোনো মূল্যে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখতে হবে আমাদের।'

'জানি। আমি বলতে চেয়েছি, ল্যাণ্ড করার পর আপনাকে খবর নিতে হবে।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করলো রাহাত, 'জানতে পারি, ইংরেজ তু'জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?'

'হ্যাঁ। সবদিক সুন্দর সামলেছে লেফটেন্যান্ট মুলার। জুনিয়র র‍্যাঙ্কের লোক ওরা। একজন সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট, আরেকজন স্টাফ-সার্জেন্ট। টার্কি থেকে দেশে ফিরছে…'

'আপনি তাহলে আগে থেকেই জানতেন ওদেরকে জাহাজে

তুলে দেয়া হয়েছে ?'

থতমত খেয়ে গেল কর্নেল। রাহাতের পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। পোর্টহোল দিয়ে এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে রাহাত। তার প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা জেরা করার সুর বেজে উঠলো, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো কর্নেল। ব্রিজে যাবার তাগাদা অনুভব করছে সে, কিন্তু অনিশ্চিত একটা ভাব নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতেও মন চাইছে না। কথাটা ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইলো কেন ? তবে কি কোথাও ভুল করে বসেছে সে ? 'আগে থেকেই জানতাম ?'

'হ্যাঁ, সেটাই জানতে চেয়েছি আমি!' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়লো রাহাত। 'জানতেন ?' মুখে চুরুট নিয়ে কথা বলছে ও।

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলো কর্নেল। 'প্রথম যখন ওদের কথা শুনলাম, চিন্তা হয়েছিল, কিন্তু ওরা খুবই ছোট র‍্যাঙ্কের…'

'ঠিক জানেন ? কাগজ জাল করা যায়, সে খবর রাখেন না ? যতটা মনে হচ্ছে, তারচেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ওরা, একবারও এই সন্দেহ হয়নি ? মিত্রপক্ষ হয়তো এই অপারেশ-নের গন্ধ পেয়ে ওদেরকে পাঠিয়েছে, সম্ভাবনাটা একবারও জাগেনি মনে ? ওরা ওয়্যারলেস রূমে ঢোকার সুযোগ পায়নি, সেটা নিতান্তই আপনার ভাগ্য। নাকি ঢুকেছিল ?'

'না, কিভাবে ঢুকবে! তাহলে তো আমাকে মুলার…'

'আর্মির কোন্ শাখার লোক, জানা আছে কিছু ?' কর্নেলকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো রাহাত।

হঠাৎ শীত শীত করলো কর্নেলের। এই জেরার মুখে পড়ার

আগে পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, টাটরায় ইংরেজ দু'জনের উপস্থিতি একটা কাকতালীয় ঘটনা মাত্র। কিন্তু অ্যাবওয়েরের অফিসার যা বলছে তাতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এত সহজ সরল না-ও হতে পারে। 'একজন স্টাফ-সার্জেন্ট, তার নাম গ্রীণ। সে এক-জন অ্যামুনিশন এগজামিনার,' ধীরে ধীরে বললো সে।

'আরেকজন? তথাকথিত লেফটেন্যান্ট ব্রায়ান ম্যালোরি?' কড়া সুরে আবার জানতে চাইলো রাহাত। 'তার কথা চেপে যাচ্ছেন কি মনে করে?'

'সে সিগন্যাল কোরে আছে।'

'বুঝুন! তারমানে, নিঃসন্দেহে সে একজন এক্সপার্ট ওয়্যার-লেস অপারেটর...' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো রাহাত। কয়েক সেকেণ্ড আর কিছু না বলে চুরুটে টান দিল। তারপর কর্নেলকে আরও কোণঠাসা করার জন্যে বললো, 'আমরা জানি, বেশ কয়েক হপ্তা টার্কিতে ছিল ওরা। এতদিন থাকতে আজকেই, এত জাহাজ থাকতে এই ফেরীটাই বা কেন বেছে নিল গ্রীসে ফেরার জন্যে?'

'কয়েক হপ্তা? বলেন কি!' আসলেই আকাশ থেকে পড়লো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। 'আপনি ঠিক জানেন? সেজন্যেই কি আপনি এই জাহাজে রয়েছেন?' ব্যগ্রতার সাথে রাহাতের দিকে এক পা এগোলো সে। কোনো উত্তর না দিয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে তার অস্থিরতা উপভোগ করছে রাহাত। 'কিন্তু ওরা বলছে, ওদের জাহাজ নাকি দিন কয়েক আগে ডুবে গেছে...'

'কোন্ জাহাজ?' ধমকের সুরে জানতে চাইলো রাহাত।

'আশ্চর্য! ওরা বললো, আর আপনি সেটা বিশ্বাস করে ফেললেন?'

'আমি না!' তাড়াতাড়ি বললো কর্নেল। 'ওদের সাথে কথা বলেছে মুলার…'

'ইন্টেলিজেন্স ট্রেনিং আছে আপনার মুলারের?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো রাহাত।

'তা নেই, কিন্তু মুলার বেশ চালাক-চতুর। বললো, ওদের কথা তার বিশ্বাস্য মনে হয়েছে…'

'সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ম্যালোরিকে আমি দেখেছি,' ধীরে ধীরে বললো রাহাত খান। 'তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনার মুলারের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর সে। প্রয়োজনে বিশ্বাস্য গল্প বানাবার ক্যাপাসিটি তার আছে।' পায়চারি শুরু করলো সে। 'উঁহুঁ, গোটা ব্যাপারটাই আমার খারাপ লাগছে। আপনি দেখছি সমস্তটাই লেজে-গোবরে করে ছাড়বেন। কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, আমি চাই আপনি নিজে ইংরেজ দু'জনকে আবার জেরা করুন।'

অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে জানে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। রাহাতের ব্যাপারে এখনও সে মনস্থির করতে পারেনি। সত্যিই কি লোকটা অ্যাবওয়েরের একজন সিনিয়র অফিসার? ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছে সে, মূল আলোচনা থেকে সরে এসেছে তারা। মেয়রের আইডেন্টিটির কথা বাদ দিয়ে এখন তারা আলোচনা করছে দু'জন ইংরেজ বন্দীর আইডেন্টিটি নিয়ে। নিজের পজিশন নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে সে। এই অপারেশন কিভাবে সে

পরিচালনা করে সেটা দেখার জন্যেই কি মেয়রকে পাঠানো হয়েছে ? অসম্ভব নয়। অ্যাবওয়েরের চীফ একজন অ্যাডমিরাল, অ্যাবওয়ের ন্যাভাল অপারেশন সম্পর্কে বরাবর উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে—এই অপারেশনের সাথেও একটা সম্পর্ক আছে সাগরের।

রয়ে সয়ে, ভেবেচিন্তে জবাব দিল কর্নেল, 'ঠিক আছে, মুলারকে ডেকে বলে দিচ্ছি, আরেকবার যেন ওদেরকে জেরা করা হয়।'

'এই ম্যালোরি তাহলে জার্মান ভাষা জানে ?' আবার কর্নেলের দিকে পিছন ফিরে পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রাহাত।

'বোধহয় জানে না—কিন্তু মুলার ভাল ইংরেজী বলতে পারে। ব্রিজে যাচ্ছি আমি।'

কর্নেলের চলে যাওয়া নিয়ে কোনো মন্তব্য করলো না রাহাত, কিন্তু এত সহজে যে তাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে নেই ওর, সেটা বেশ বোঝা গেল। কর্নেল থামতেই আবার প্রশ্ন করলো ও, 'ওদেরকে জেরা করার সময় মুলার আর কিছু জানতে পেরেছে ?' পোর্টহোলের দিকে দ্রুত এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লো রাহাত, কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করলো কর্নেল।

'হ্যাঁ। একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের কথা বলেছে ওরা। কিন্তু মুলারের ধারণা, আসলে ওটা একটা ব্লাফ...'

'ব্লাফ ?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রাহাতের।' পোর্টহোলের দিকে পিছন ফিরলো সে। 'প্রথমে আপনি বললেন জাহাজে

ওদের উপস্থিতি একটা কাকতালীয় ব্যাপার, আবার এখন বলছেন ওরা নাকি ধোঁকা দিচ্ছে। এইসব উল্টোপাল্টা কথার মানে কি?' পোর্টহোলের দিকে আঙ্গুল তুললো সে। 'ডেস্ট্রয়ারের কথা বলে ওরা আপনাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে, আমি তা মনে করি না। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি এতক্ষণ ধরে একটা জাহাজকে দেখছিলাম, কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। উত্তর-পুব থেকে বেশ তাড়াহুড়ো করেই ছুটে আসছে। আমার যদি সাংঘাতিক ভুল হয়ে না থাকে, ওটা একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার।'

ঝট্ করে ঘুরেই দরজার দিকে এগোলো কর্নেল। কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরিয়ে গিয়ে এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করলো সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো কেবিনের ভেতর দাঁড়ানো রাহাতের দিকে, তারপর ছুটলো।

কেবিনের দরজা খোলাই রইলো। কেবিনের ভেতর টেবিলে ল্যুগারটাও পড়ে থাকলো। বোঝা গেল স্বাধীনভাবে জাহাজে ঘুরে বেড়াবার অধিকার পেয়ে গেছে ডঃ রিচার্ড মেয়র।

নয়

কমপ্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটে আসছিল লেফটেন্যান্ট মুলার, আরেকটু হলে কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের সাথে তার ধাক্কা লেগে যেত। হঠাৎ থেমে ঠকাস করে স্যালুট করলো সে, এক নিঃশ্বাসে বললো, 'ইমার্জেন্সী, স্যার ! লেফটেন্যান্ট ফকার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ব্রিজে। অত্যন্ত সিরিয়াস...'

'জানি !' মুলারকে পাশ কাটাতে শুরু করে বললো ব্রিজেলবার্ড। হন হন করে সিঁড়ির দিকে এগোলো সে। কঠোর চেহারার অ্যালপেনকর্‌প্‌স্‌ সৈনিকরা তাদের কর্নেলকে পথ করে দেবার জন্যে কম্প্যানিয়নওয়ের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো, প্রত্যেকের শরীরের পাশে একটা করে রাইফেল। একজন লোক বুটের নিচে চাপা দিল তার সিগারেট।

তিনটে কেবিন দখল করেছে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকরা, সবগুলোর দরজা খোলা। ভেতরে চোখ পড়লো কর্নেলের। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসে আছে কিছু লোক, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে মুখের পেশী। বোঝা গেল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে

দুঃসংবাদ। একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার ছুটে আসছে, কারও আর জানতে বাকি নেই। সেই সাথে গ্রীক ফেরীর পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। প্যাসেজে পাহাড় হয়ে আছে ব্যাগ-ব্যাগেজ, লাফ দিয়ে সেগুলো টপকাবার সময় নিজেকে মনে করিয়ে দিল কর্নেল, ওগুলো এখান থেকে সরাবার অর্ডার দিতে হবে। আরেকটা লাফ দিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলো সে। তারপর তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যেতে শুরু করলো।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঝটকা দিয়ে দরজা খুললো ব্রিজেল-বার্ড। বাতাসের সাথে চোখেমুখে ছুঁচের মতো বিঁধলো তুষার কণা, মুখের সামনে হাত তুলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলো সে। পরমুহূর্তে হাত নামিয়ে নিয়ে চোখ পিট পিট করে খালি ডেকের দিকে তাকালো। ঢেউয়ের ডগাগুলো সাদা ফেনাসহ রেলিঙ টপকে উঠে আসছে ডেকে, পানিতে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে খালি ডেক। প্রতিটি সৈনিককে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন ভুলেও খোলা ডেকে না আসে। হুকুমটা পালন করা হচ্ছে দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো কর্নেল। অন্য কোনো জাহাজ থেকে কেউ তাকালে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাবে না। সাগরের এই রুদ্রমূর্তি নিচে থেকে ঠিক ঠাহর করা যায় না, ভেবে একটু অবাক হলো কর্নেল। হুইলহাউসে ঢোকার সময় অস্থিরতা দুর করার জন্যে হাত দু'টো পরস্পরের সাথে জোরে ঘষতে শুরু করলো সে।

কাচ ঘেরা হুইলহাউসের ভেতর কিছুই অশান্ত নয়, সব স্বাভা-বিক এবং সুশৃংখল। তবু পরিবেশটা যে উত্তেজনায় টান টান হয়ে

রয়েছে সেটা অনুভব করতে পারলো কর্নেল। বাইরে তাকাতে মনে হলো, সাগর নয়, ফেরী বোট টাটরা পাহাড় সারির চূড়া টপকাচ্ছে।

জাহাজের হুইল ধরে রয়েছে জার্মান নৌবাহিনীর লেফটেন্যাণ্ট বেন ফকার। পরনে কালো শার্ট, কালো ট্রাউজার, শার্টের ওপর কালো উলেন সোয়েটার। তার কয়েক ফিট সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেরীর ক্যাপটেন মোপাস্থ, হাতে একটা সিগন্যালিং ল্যাম্প। তার ঠিক পিছনে, ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে কঠোর চেহারার একজন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক। তার হাতের মেশিন পিস্তলটা তাক করা রয়েছে ক্যাপটেন মোপাস্থর শিরদাঁড়ার ওপর।

'স্টারবোর্ডের দিকে!' নিস্তব্ধতা ভাঙলো হেলমস্ম্যান, উত্তর-পুব দিক মাথা ঝাঁকালো সে। গোলগাল চেহারা ন্যাভাল অফিসার ফকারের, চোখে শিশুসুলভ একটা সারল্য আছে। কারও বুক লক্ষ্য করে গুলি করার সময়ও মনে হয় চোখ জোড়ায় নির্মল হাসি হাসি ভাব থাকে। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কিন্তু খুব ছোট করে ছাঁটা। বয়েস ত্রিশের কোঠায়।

এক নজরে পরিবেশটা বুঝে নিয়ে একজন সৈনিকের দিকে নিঃশব্দে হাত বাড়ালো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। ইউনিফর্মের ওপর রেনকোট পরে আছে লোকটা, কর্নেলের হাতে একটা ফিল্ড-গ্লাস ধরিয়ে দিল সে।

স্টারবোর্ডের দিক থেকে এগিয়ে আসছে বিশাল একটা কাঠামোর ছায়া। তার মাস্টহেডে আলো জ্বলছে। ফোকাস অ্যাড-

জাস্ট করে আবার তাকালো কর্নেল। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে গেল। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, ওটা একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার। কোর্সটা বিপজ্জনক। সোজা টাটরার দিকে এগিয়ে আসছে। আর বড়জোর মাইল দেড়েক দুরে রয়েছে ওটা। ফিল্ড-গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো কর্নেল, ডেস্ট্রয়ারের ব্রিজ থেকে কেউ যদি চোখে গ্লাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে, আলোয় থাকলে দেখতে পাবে তাকে। এখুনি হয়তো একজন একজন করে ওদেরকে চিনতে বা দেখতে পারবে না, কিন্তু বর্তমান কোর্স বজায় রাখলে খানিক পরই পারবে।

ফকারকে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল, 'সিগন্যালিং ল্যাম্প নিয়ে কি করছে মোপাস্থ ?'

'একটু পরই ওটা তাকে ব্যবহার করতে হবে...

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।'

'আর কোনো বিকল্প নেই আমাদের।' শরীর একটু ঘুরিয়ে যুদ্ধ-জাহাজের দিকে তাকালো ফকার। 'ওটার কাছ থেকে সিগ-ন্যাল আমরা পাবোই। মোপাস্থকে জানিয়ে দিন, সিগন্যালের অর্থ আমি বুঝি।'

ঝড় বয়ে যাচ্ছে কর্নেলের মাথার ভেতর। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে ফাঁদ বলে মনে হলো। অভিযানের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে সামান্য একটা সিগন্যালিং ল্যাম্পের ওপর। সেটা আবার এমন একজন লোকের হাতে রয়েছে, যার হাত থেকে এইমাত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তার ফেরী বোট।

টাটরার কোর্স ঠিক রাখার জন্যে শক্তভাবে চেপে ধরে হুইল

ঘোরাচ্ছে ফকার, ওভারহেড লাইটের আলোয় তার হাতের নখ সাদা হয়ে উঠতে দেখলো কর্নেল। ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সৈনিকটা জাহাজের সাথে কাত হচ্ছে, দুলছে, মাঝে মধ্যে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিচ্ছে কর্নেলকে। হাতের মেশিন-পিস্তল আগের মতো ক্যাপ্টেন মোপাস্থর শিরদাঁড়া বরাবর তাক করা। চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে আছে সে।

মুখে শান্ত আত্মবিশ্বাসের মুখোশ এঁটে নিয়ে সব লক্ষ্য করলো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। হাত দু'টো কোটের পকেটে ভরলো সে। টান করলো বুক। অথচ মনে মনে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে সে-ও। এই বিপদ থেকে তাদের মুক্তি আছে কিনা জানা নেই তার।

ঠাণ্ডা সুরে জার্মান ভাষায় শুরু করলো সে। 'মোপাস্থ!'

ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেলের দিকে তাকালো না ক্যাপ্টেন। বললো 'বলুন।'

'ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার থেকে যে-কোনো মুহূর্তে সিগন্যাল দেয়া হতে পারে। দিলেও, আমার অনুমতি ছাড়া ল্যাম্পটা ব্যবহার করতে পারবে না তুমি। আমার নির্দেশ বুঝতে না পারলে বলো।'

'পারছি।'

'গুড। হুইলে যে লোকটাকে দেখছো তুমি,' বলে চললো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, 'ও একজন ন্যাভাল অফিসার। সিগন্যালিং প্রসিডিউর সমস্তই জানা আছে ওর। তোমার ওপর কড়া নজর

রাখবে ও। তুমি যদি কোনো রকম ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবার চেষ্টা করো, আমরা জানতে পারবো। যদি কোনো ইমার্জেন্সী দেখি, ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারকে আমরা ব্যতিব্যস্ত করে তুলবো—যদিও শেষ পর্যন্ত টাটরা ডুবে যাবে। টাটরা ডুবলে আমরা কেউ বাঁচবো না। তুমিও মরবে, সে-কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি। সাগরের কি অবস্থা সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো, ওখানে একবার পড়লে কেউ বাঁচবে না! তাছাড়া, নিজের ক্রুদের কথাও ভাবতে হবে তোমাকে...' টাটরার ক্রুরা জিম্মি হিসেবে থাকছে, কথাটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল কর্নেল। চুপ করেছে, এই সময় চাঁদের আলোয় ডেস্ট্রয়ারের দু'পাশে সাদা ফেনা দেখতে পেল সে।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ফিরলো কর্নেল। ভেতরে ঢুকলো রাহাত খান, কর্নেলের অস্থির প্রতিক্রিয়া গ্রাহ্যই করলো না ও। চট করে চোখ তুলে ডেস্ট্রয়ারটাকে একবার দেখে নিয়ে কর্নেলের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'আতংকিত হবার মতো এখনও কিছু ঘটেনি,' বললো ও। 'এটা স্রেফ একটা রুটিন চেকও হতে পারে। এখন, নিচে থেকে ওদের বন্ধুরা কেউ সিগন্যাল না দিলেই হয়। হয়তো সিগন্যাল পাবার আশাতেই আসছে ওরা।'

ব্রিজেলবার্ডের ঘাড়ের পাশের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে দু'বার লাফিয়ে উঠলো। ব্রিজে ঢুকেই চারদিকে আতংক ছড়াতে শুরু করেছে লোকটা। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে নিয়ে এসেছে কর্নেল, এই সময় দড়াম করে আবার খুলে গেল

দরজা। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ আর অনিশ্চিত ভাব নিয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলো মুলার। রাহাতকে ব্রিজে উঠতে দেখে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাধা দিতে সাহসে কুলায়নি তার। কিন্তু তার মনে হয়েছে, লোকটাকে অন্ততঃ চোখে চোখে রাখা দরকার। সেজন্যেই তার এই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা।

আবার ঝট্ করে দরজার দিকে ফিরলো কর্নেল। মুলারকে দেখে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠলো তার। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললো, 'ল্যুগারটা লুকাও, ব্লাডি ফুল! ওরা হয়তো ব্রিজের ওপর নজর রাখছে। আর হ্যাঁ, এসেই যখন পড়েছো, বলো, ব্রিটিশ সোলজারদের কারও কাছে সিগন্যাল দেবার মতো কোনো ইকুইপমেন্ট দেখেছো নাকি?'

'না। ওদেরকে সার্চ করে কোনো সিগন্যালিং ল্যাম্প পাইনি,' কর্নেলকে তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করলো মুলার। 'সিগন্যাল দেয়া যেতে পারে এমন কোনো ইকুইপমেন্টও ওদের কাছে ছিল না। দু'জনের কাছ থেকে শুধু একটা করে পিস্তল পাওয়া গেছে।'

ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে রাহাতের দিকে তাকালো কর্নেল, কিন্তু রাহাত তখনও স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মুলারের দিকে। মুলার চোখ পিট পিট করছে। 'টর্চ?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করলো রাহাত। 'কোনো টর্চ আছে কিনা দেখেছো? এই ধরো, ছোট একটা পকেট টর্চ? সহজেই কোথাও লুকিয়ে রাখা যায়?'

ঘাবড়ে গেল মুলার। সরাসরি রাহাতকেই জবাব দিতে যাচ্ছিলো সে, পরমুহূর্তে টান পড়লো মুখের পেশীতে, ফিরলো কর্নেলের দিকে, জবাবটা তাকেই দিল, 'ইয়েস, স্যার। ওদের

একজনের কাছে একটা টর্চ আছে। দরজার পিছনে হুকের সাথে একটা কোট ঝুলছিল, সেটার পকেটে দেখেছি…'

রাহাতের দিকে তাকালো কর্নেল, উত্তরে অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালো রাহাত। চোখের কোণ দিয়ে কর্নেল দেখলো ওদের দিকে ফিরছে ফকার, সাথে সাথে তার দিকে তাকালো সে।

'ওই শুরু হলো, স্যার। ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে,' ডেস্ট্রয়ারের দিকে চোখ রেখে বললো ফকার।

উথালপাতাল সাগরে, ঢেউয়ের মাথা যেখানে আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে, সেখানে একটা আলো মিট মিট করতে দেখলো ওরা। স্টারবোর্ডের দিকে শরীরটা অর্ধেক ঘুরিয়ে নিয়েছে ফকার, ক্ষুদে বিস্ফোরণের মতো আলোক-সংকেতের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে সে। ব্রিজের ভেতর এক চুল নড়লো না কেউ। সবাইকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে দূরের ওই মিটমিটে আলোটা। মনে মনে নিজের সাথে কথা কাটাকাটি করছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। যাই ঘটুক, আত্মসমর্পণ করবো না। কিন্তু…! কোনো কিন্তু নয়! জানি, চার ইঞ্চি কামান আছে ডেস্ট্রয়ারে! দু'চারটে গোলা এসে পড়লেই আগুনের কুণ্ডে পরিণত হবে টাটরা। এক-জনও বাঁচবে না। চিন্তায় বাধা পড়লো। ডেস্ট্রয়ার থেকে সিগ-ন্যাল পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমাদের পরিচয় জানতে চাইছে ওরা।'

শিরদাঁড়া খাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো কর্নেল, এত-ক্ষণ প্রায় কুঁজো হয়ে ছিল সে। না তাকিয়েও বুঝতে পারলো,

অ্যাবওয়ের অফিসার তাকে লক্ষ্য করছে—চেহারাটা লাল হয়ে উঠলো তার। জার্মান ভাষায় ক্যাপ্টেন মোপাস্থকে নির্দেশ দিতে শুরু করলো সে।

'সিগন্যাল দাও, মোপাস্থ। বলো, আমরা গ্রীক জাহাজ টাটরা। ব্যস, আর কিছু না। মনে রেখো, লেফটেন্যান্ট ফকার একজন ন্যাভাল অফিসার। আর জানোই তো, তোমার পিঠে তাক করা রয়েছে মেশিন-পিস্তল।'

ব্রিজের ভেতর উত্তেজনা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠলো। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো ক্যাপ্টেন মোপাস্থ, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অ্যালপেন-করপ্‌স্‌ সৈনিকের সাথে চোখাচোখি হলো তার। তারপর কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের দিকে তাকালো সে। লক্ষ্য করলো, কর্নেলের চেহারায় আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব নেই। মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের কাজ শেষ করার ইঙ্গিত দিল কর্নেল। ডেস্ট্রয়ারের দিকে ফিরে মাথার ক্যাপ অ্যাডজাস্ট করে নিল ক্যাপ্টেন। তারপর সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করলো। হাত দু'টো হুইলে, কিন্তু ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফকার।

ছোট্ট মেসেজ, কিন্তু কর্নেলের মনে হলো, সেটা পাঠাতে এক যুগেরও বেশি সময় নিচ্ছে মোপাস্থ। মেরিন সিগন্যালটা জটিল? ফকারের চোখে ধুলো দিয়ে মোপাস্থ ডেস্ট্রয়ারকে কোনো এস. ও. এস. পাঠাচ্ছে না তো? আরও অনেক আশংকা জাগলো মনে, কিন্তু সেই সাথে অনুভব করলো, এই মুহূর্তে কিছুই তার করার নেই। গ্রীক ক্যাপ্টেন মোপাস্থর হাতে এখন তারা সবাই

অসহায় পুতুল মাত্র। সিগন্যাল দেয়া শেষ করলো ক্যাপ্টেন। রঙিন একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো সে।

ডেস্ট্রয়ারের দিকে চোখ রেখে পিছনে দাঁড়ানো কর্নেলকে বললো ফকার, 'ও শুধু টাটরা বলে পরিচয় দিয়েছে আমাদের, ফেরীর মালিক গ্রীক। আর কিছু না।'

কাঁধের পেশীতে ঢিল পড়তে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে মনের জোর খাটিয়ে সেটাকে ঠেকালো কর্নেল। দু'জন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক তাকিয়ে আছে তার দিকে, অনুভব করলো সে। ওরা তার কাছ থেকে আশ্বাস পেতে চায়। ব্রিজেলবার্ড আগেও লক্ষ্য করেছে, জার্মান সোলজাররা পানিতে মোটেও স্বস্তিবোধ করে না। ব্রিটিশ নেভির অস্তিত্বই বোধহয় তাদের এই অস্বস্তির কারণ। ডেস্ট্রয়ারের দিকে তাকালো সে। এখনও সোজাসুজি কোর্স ধরে টাটরার দিকে এগিয়ে আসছে। যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন কি উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়নি? স্রেফ একটা রুটিন চেক, বললো ডঃ রিচার্ড মেয়র। কিন্তু তারপরই একটা কথা বলে মনের ভেতর আতংক ছড়িয়ে দিল সে। আচ্ছা, ইংরেজ বন্দীদের কাছে টর্চ থাকার অর্থটাই বা কি? সত্যি কি ওরা জানে, একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার আসবে? ওটাকে সিগন্যাল দিয়ে নিজেদের উপস্থিতির কথা জানাবার জন্যেই কি টর্চটা? মাথা গরম হয়ে উঠলো কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের। ধ্যেত্তেরি ছাই অ্যাবওয়ের!

'আবার ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে!' জানালো ফকার।

তাড়াতাড়ি তাকাতেই মিটমিটে আলো দেখতে পেল কর্নেল। অনেক কাছে চলে এসেছে ডেস্ট্রয়ার, দূরত্ব এখন সিকি মাইলও

বোধহয় হবে না। পায়চারি শুরু করার ঝোঁকটাকে দমন করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সে। অন্ততঃ বাইরে থেকে তাকে শান্ত দেখানো দরকার, এই মুহূর্তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। অনুভব করলো, তার পা দু'টো কেউ যেন পেরেক মেরে আটকে দিয়েছে ডেকের সাথে। ব্রিজের ভেতর কিভাবে উত্তেজনা বাড়ছে, উপলব্ধি করতে পারলো সে। ক্যাপ্টেন মোপাসুর হাতে ধরা ল্যাম্পটা থরথর করে কাঁপছে। সিগন্যাল দেয়া-নেয়ার এই ঘটনা বেশিক্ষণ চলতে থাকলে নার্ভাস লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। তার পিছনে বসে থাকা সৈনিকটা ঘামতে শুরু করেছে, ওভারহেড লাইটের আলো লেগে চকচক করছে তার কপাল। মেশিনপিস্তলের গায়ে আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে মুলার। কর্নেলের ইচ্ছে হলো, হুংকার ছেড়ে থামতে বলে তাকে। ফকার, অত্যন্ত যোগ্য এবং দক্ষ একজন ন্যাভাল অফিসার, তাকেও মাঝে মধ্যে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে দেখা গেল। কর্নেল যখন এই সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে, ওদিকে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার থেকে অনবরত সিগন্যাল আসছে। শুধু একজনের চেহারায় উদ্বেগ বা নার্ভাসনেসের কোনো ছাপ নেই। নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে রাহাত খান। যখন চোখ নামালো, দেখলো, তার দিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল।

'জাহাজে পাপাগোপালা নামে একজন গ্রীক আছে,' বললো রাহাত। 'নজর না রাখা হলে লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'আমি নিজে তার ব্যবস্থা করেছি,' সহজ, মৃদু গলায় বললো মুলার। 'তার কোনো কেবিন ছিল না, ঘুমাচ্ছিল সেলুনে। আমাকে দেখতে পায়নি, তার আগেই তাকে আমি অজ্ঞান করে ফেলি। একটা হোল্ডে বেঁধে রাখা হয়েছে।' অনেকক্ষণ ধরে রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করতে করতে রাহাতের ওপর থেকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভাবটা কখন যেন দুর হয়ে গেছে, নিজেও সেটা টের পায়নি সে। রাহাত লক্ষ্য করলো, লোকটার দৃষ্টিতে আগের সেই বৈরী ভাব নেই।

'ফেরী সম্পূর্ণ আমার কন্ট্রোলে আছে,' বললো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। ঠাণ্ডা সুরে, কথাটা যেন রাহাতকে খুশি করার জন্যেই বলা হলো।

'নিচেটা বোধহয় আমার নিজেরই একবার ঘুরেফিরে দেখা দরকার,' চিন্তিত সুরে বললো রাহাত। এমন ভান করলো, যেন কারও ওপর ভরসা করতে পারছে না ও। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলো, ঢেউয়ের একটা মাথা টাটরার ডেকে আছড়ে পড়তে শুরু করতেই ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে ফিরলো মুলার।

মুলার বেরিয়ে যেতে ব্রিজের ভেতর আবার অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল। ডেস্ট্রয়ার থেকে এখনও সিগন্যাল আসছে। ভারি আওয়াজ উঠে আসছে ফেরীর ইঞ্জিন থেকে। ওদের নিচে এবং চারপাশে উদভ্রান্তের মতো আলোড়িত হচ্ছে সাগর। ডেস্ট্রয়ার থেকে সিগন্যাল পাঠানো বন্ধ হতেই খুক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ফকার।

'ওরা জানতে চাইছে, কোত্থেকে আসছি আমরা, কোথায় যাবো, এবং কখন পৌঁছাবো ?'

সাথে সাথে ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিতে শুরু করলো কর্নেল।

'মোপাস্থ ! ওদেরকে বলো, ইস্তাম্বুল থেকে আসছি আমরা, যাবো কাটায়রা, জার্ভোস, এবং আমাদের পৌঁছুবার আনুমানিক সময় জিরো-ফাইভ ঃ থ্রি-ও আওয়ার্স।'

চোখ পিট পিট করলো মোপাস্থ। আবার একবার পিছনে তাকালো। তারপর ল্যাম্পটা শক্ত হাতে তুলে নিয়ে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করলো।

চাঁদের আলোয় ডেস্ট্রয়ারের গান মাজল পরিষ্কার দেখা গেল। আগের মতোই একরোখা ভঙ্গিতে সোজা টাটরার বো লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে যুদ্ধ-জাহাজ, এক ডিগ্রীও বদল করেনি কোর্স। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগলো কর্নেলের। মান্ধাতা আমলের একটা গ্রীক ফেরী, সারা জীবন ইস্তাম্বুল আর নির্জন জার্ভোসের মাঝখানে যাওয়া-আসা করছে, এর ওপর এত কেন মনোযোগ একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের ?

তার মনের কথা যেন পড়তে পেরেই মুখ খুললো রাহাত। 'ভাবছি, ওদের এই সিগন্যাল পাঠানো, এটা আসলে স্মোক-স্ক্রিন নয় তো ? হয়তো কাছে না আসা পর্যন্ত চেকিঙের ভান করছে ওরা। নিচের বন্দীদের কাছ থেকে সিগন্যাল আশা করছে, এটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই বিদঘুটে কোর্সের একটা অর্থ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের বো লক্ষ্য করে প্রথম গোলা না ছোঁড়া পর্যন্ত এই কোর্স বজায় রাখবে ওরা।' একটু বিরতি

নিল রাহাত, তাকালো কর্নেলের দিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে ব্রিজেলবার্ড। তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল রাহাত। তারপর বললো, 'দশ মিনিটের মধ্যেই ভাল-মন্দ কিছু একটা জানা যাবে।'

শেষ বিষাক্ত তীরটা ছুঁড়ে ঘুরে দাঁড়ালো রাহাত, দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে। স্বস্তির পরম নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে কর্নেল, এই সময় দরজা খুলে আবার ভেতরে ঢুকলো রাহাত। কর্নেলের দিকে এমন চোখে তাকালো, যেন তিরস্কার করছে। কর্নেলের চেহারায় কিছু ফুটলো না, কিন্তু মনে মনে উদ্বেগ বোধ করলো সে।

'ইউনিফর্ম পরা সৈনিকদের ডেকে বেরুতে নিষেধ করেছেন?' সরাসরি জানতে চাইলো রাহাত।

'কেউ বেরুবে না,' গম্ভীর সুরে জবাব দিল ব্রিজেলবার্ড। 'সবাইকে বারণ করা আছে।'

'এইমাত্র একজন সৈনিককে ডেকে দেখলাম,' বলে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাহাত।

'ঠিক আছে, আমি জানার চেষ্টা করবো···

'হুম!' বলে আবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাহাত।

এবার একটু একটু করে নিঃশ্বাস ছাড়লো ব্রিজেলবার্ড। মুলার-রের ওপর রাগে পিত্তি জ্বলে উঠলো তার। খোলা ডেকে ইউনি-ফর্ম পরা সৈনিক! এদিকে কাছে চলে এসেছে ডেস্ট্রয়ার। কিন্তু প্রসঙ্গটা একটু পরই ভুলে গেল সে। দ্রুত আরও কাছে চলে আসছে ডেস্ট্রয়ার, সেটার দিক থেকে চোখ বা মন সরাতে

পারলো না সে। মনে মনে সমর্থন করলো রাহাতকে, হ্যাঁ, দশ মিনিটের মধ্যেই ভাল-মন্দ কিছু একটা জানা যাবে।

দশ

বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘেমে গোসল হয়ে গেল ম্যালোরি। কেবিনের আলো নিভিয়ে রেখে গেছে জার্মান গার্ড। সরু, ইস্পাতের মতো মজবুত রশি দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে রেখে গেছে ওকে, শুধু যে দেখতে পাচ্ছে না তাই নয়, গিঁটটা নাগালের মধ্যেই আসছে না। রশির একটা টুকরো দিয়ে বাঁধা হয়েছে পায়ের গোড়ালি জোড়া। আরেক টুকরো দিয়ে হাতের কব্জি দু'টো এক করা হয়েছে। তারপর লম্বা এক প্রস্থ রশি দিয়ে হাত আর পা বাঁধা হয়েছে। হাত দু'টো শরীরের সামনে নয়, পিছনে।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল ম্যালোরি। এই রশি ছেঁড়া সম্ভব নয়, গিঁট নাগালের মধ্যে নেই বলে খোলাও অসম্ভব। কাত হয়ে বাঙ্কের ওপর শুয়ে হাঁপাতে লাগলো সে। খানিক পর বিকল্প একটা উপায় এল মাথায়। শরীরের তুলনায় হাত-পা সরু তার, চেষ্টা করলে হয়তো লুপের ভেতর থেকে বের করে আনা যেতে পারে কব্জি দু'টো। বাঙ্কের ওপর বাঁ দিকে কাত হয়ে, কেবিনের ভেতর দিকে মুখ করে পড়ে আছে ও। টেবিলে

পড়ে থাকা রেডিয়াম লাগানো ঘড়িটার ওপর চোখ পড়লো। বারোটা দশ। তারমানে, একটু পরই চেক করতে আসবে গার্ড। প্রতি পনেরো মিনিটে একবার করে আসছে সে।

পায়ের আওয়াজের জন্যে কান পেতে আছে ম্যালোরি, এই সময় গলার শব্দ পেল ও। মাথাটা ঘুরিয়ে জানতে চাইলো, 'কেমন আছো, গ্রীণ ?'

পাশের বাঙ্কে একইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে গ্রীণকে। খানিক আগে জ্ঞান ফিরেছে তার, কিন্তু মাথার আঘাতটা দপ দপ করছে সারাক্ষণ। সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্টের গলার আওয়াজ শুনে বুঝে নিল সে, ভদ্রলোক বহাল তবিয়তেই আছেন। 'আপনি ভাল থাকলেই আমার ভাল থাকা, স্যার। তবে জাহাজ থেকে নামার সময় একটা কথা যেন ভুলবেন না। ট্র্যাভেল করার সময় যথেষ্ট আরাম পাইনি, এই অভিযোগে টাটরার মালিকের নামে আমরা কেস করবো।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসলো ম্যালোরি। 'তোমার মনে থাকলেই হবে। শোনো, গার্ড আসার সময় হয়ে এসেছে। এমনভাবে পড়ে থাকো, তোমার যেন জ্ঞান ফেরেনি।'

'ইয়েস, স্যার,' বললো গ্রীণ। 'আপনি কি…?'

'হ্যাঁ।'

'কাজ হবে বলে মনে হয় ?'

'চেষ্টা তো করছি, দেখা যাক।'

কিছুক্ষণ আর কিছু কথা হলো না ওদের মধ্যে। আবার ঘড়ি দেখলো ম্যালোরি। সোয়া বারোটা। গার্ড কি এবার দেরি করে

আসবে? পোর্টহোলের পর্দাগুলো টেনে দেয়া রয়েছে, কাজেই আলো ঢুকছে না ভেতরে। কেবিনের দরজা খোলা রেখে গেছে গার্ড, ভিড়ানো দরজা একটু ফাঁক হয়ে আছে। খানিক পর পর এসে দেখে যেতে হচ্ছে বলেই তালা দেয়ার ঝামেলায় যায়নি লোকটা।

আওয়াজ পেল ম্যালোরি। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ভারি একটা পায়ের আওয়াজ নামলো। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করলো কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে। ঠিক ওদের দরজার সামনে থামলো শব্দটা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে কবাট খুললো গার্ড। কেবিনে না ঢুকে ভেতর দিকের দেয়াল হাতড়ে সুইচ অন করলো। উজ্জ্বল আলোয় দেখলো, বাঙ্কের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে ইংরেজ বন্দীরা। কেবিনের চারদিকে তাকালো সে। আর কেউ নেই। সবশেষে আরেকবার তাকালো বন্দীদের দিকে। ওদের জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ দেখলো না। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুইচ অফ করলো সে। তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। এবার এমনভাবে বন্ধ করলো, কবাট দু'টো পরস্পরের সাথে নিখুঁতভাবে সেঁটে গেল। এর আগে লোকটার চলে যাবার আওয়াজ পেয়েছে ম্যালোরি, এবার পেল না। আবার যখন আসবে, তখনও তার পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না ওরা।

লুপ থেকে কব্জি বের করার কাজে মন দিল ম্যালোরি। গ্রীণের অনিয়মিত ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনে বুঝলো, সে-ও নিজের বাঁধন খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচ-

ছয়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলো ম্যালোরি। ক্ষতটা এমন টন টন করতে শুরু করলো, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। মাথার ভেতর কেউ যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। কেবিনের ভেতর গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে এক ঝলক আলো দেখতে পেল ও। ঠোঁট কামড়ে প্রার্থনা করলো ম্যালোরি। কব্জিতে এঁটে বসা লুপটা ঢিল করে ফেলেছে ও, এই সময় জ্ঞান হারানো উচিত হবে না। এক সেকেণ্ড পর স্থির পাথর হয়ে গেল শরীর। বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ধড়াস ধড়াস করছে। আলো···ওটা দৃষ্টি-ভ্রম নয়! কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে জ্বেলেছিল কেউ, নিঃশব্দে দর-জার কবাট খুলে ফেলেছে সে। তার মানে, কেবিনের ভেতর কেউ একজন ঢুকেছে।

শক্ত কাঠ হয়ে গেল সারা শরীর। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত। কে? কেন? কান পেতে আছে ম্যালোরি, কোনো শব্দ পেল না। গ্রীণও দেখেছে আলোটা, সে-ও নিঃসাড় পড়ে আছে। কেবিনে কি সত্যি কেউ ঢুকেছে? এখনও কোনো প্রমাণ পায়নি, কিন্তু অনুভূতি বলছে কেবিনে ঢুকেছে তৃতীয় কেউ। কিন্তু এই রকম চুপিসারে ভেতরে ঢোকার অর্থ কি? ওদেরকে খুন করার জন্যে পাঠানো হয়েছে কাউকে? ঘ্যাঁচ করে বুকে ছোরা গাঁথবে, তারপর রেলিঙের ওপর দিয়ে ফেলে দেবে ক্ষুব্ধ ঈজিয়ানে? জার্মান কমাণ্ডার হয়তো ব্যাপারটা গোপনে সারতে চায়, সাধারণ সৈনিকদের জানতে দিতে চায় না। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অস্পষ্ট একটা ছায়া। ঘড়ির রেডিয়াম আড়ালে পড়ে গেল। অন্ধকার

কেবিনে আরও গাঢ় খানিকটা অন্ধকার, খুনী! চিৎকার করে উঠতে চাইলো ম্যালোরি, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুলো না। ওর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওকে। মুখে কিসের যেন স্পর্শ পেল ও, নিজের অজান্তেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সারা শরীর।

'আওয়াজ করো না।'

হতভম্ব হয়ে পড়লো ম্যালোরি। ধমকের সুরে নয়, ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে নয়, যেন তার মঙ্গলের জন্যেই বলা হলো কথাটা। তবে কি লোকটা জার্মান নয়? জার্মান হলে ইংরেজীতে কথা বললো কেন? বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুরে কোনোরকম টান নেই, তবে কি লোকটা ইংরেজ? কিন্তু টাটরায় আর কোনো ইংরেজ নেই বলেই জানে সে। 'কে আপনি?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আগন্তুক বললো, 'নড়ো না। ছুরি দিয়ে আমি তোমার হাতের রশি কেটে দিচ্ছি...একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার কাছে চলে এসেছে।'

ছুরির ব্লেড দিয়ে রশি কাটতে শুরু করলো লোকটা। তারপর ভারি, নিচু গলায় বললো, 'জাহাজের পিছনে একটা ভেলা আছে। ছুরিটা রেখে যাবো, রশি কেটে ওটা খুলে নেবে তোমরা। ভেলা নিয়ে তাড়াতাড়ি টাটরার কাছ থেকে সরে যাবে। তারপর ডিসট্রেস সিগন্যাল দেবে ডেস্ট্রয়ারকে...' দ্রুত হাত চালাচ্ছে লোকটা। ঢিল পড়লো ম্যালোরির বাঁধনে। 'এখুনি চলে যাবো আমি। গ্রীণের বাঁধন তুমিই খুলে দেবে...'

'কে আপনি ? আপনার পরিচয় জানা দরকার আমার। পরে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো...'

'শাট আপ!' চাপা গলায় ধমক দিল রহস্যময় আগন্তুক। 'ডিসট্রেস লাইট হয়তো টাটরা থেকেও দেখা যাবে। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ডেস্ট্রয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, কাজেই গুলি করার হুকুম দেবে না ব্রিজেলবার্ড। আর...' কম্প্যানিয়নওয়েতে ভারি বুটের আওয়াজ, এদিকেই এগিয়ে আসছে, শুনতে পেয়ে থেমে গেল আগন্তুক।

গার্ড আসছে! শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো ম্যালোরি। নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবে! হাত দু'টো মুক্ত হয়ে গেছে ওর, তাড়াতাড়ি শরীরের নিচে লুকিয়ে ফেললো। দরজার দিকে তাকাতে দেখলো, ক্ষীণ একটু আলোর রেখা। তার মানে কবাট একটু ফাঁক হয়ে আছে। ওটা চোখে পড়লেই কেবিনের ভেতর ঢুকবে গার্ড। আরেকটা মস্ত ঢেউ আঘাত করলো টাটরাকে, মনে হলো জাহাজ ভেদ করতে চাইলো সেটা। কাত হয়ে গেল টাটরা। তারপর আবার সোজা হলো। আরেকটু হলে বাঙ্ক থেকে পড়ে যাচ্ছিলো ম্যালোরি।

বাইরে ধপাস করে কি যেন পড়লো। কম্প্যানিয়নওয়েতে বোধহয় আছাড় খেয়েছে গার্ড। পরমুহূর্তে জার্মান ভাষায় কে যেন বিড় বিড় করে উঠলো।

ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে ম্যালোরি। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য লাগছে ওর। সাগরের ফোঁসফোঁসানি ছাড়া আর কোনো শব্দ পেল না ও। তারপর হঠাৎ ধাতব একটা আওয়াজ ঢুকলো

কানে—ক্লিক! মেশিন-পিস্তল কক করলো গার্ড? শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটাকে সাবধান করে দিতে চাইলো ও। আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ঝোঁকটা। পায়ের আওয়াজ শোনা গেল আবার। ঠিক কেবিনের বাইরে। দরজার সামনে থামলো সেটা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ম্যালোরি। এই সময় আরও এক জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। ঠিক কেবিনের কাছে নয়, একটু দূরে। কিন্তু দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারলো ম্যালোরি। দরজা ফাঁক দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গার্ড, এই সময় নিজেদের একজন লোককে প্যাসেজ ধরে যেতে দেখে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। এখন দরজা খুলে ছু'জনেই ভেতরে ঢুকবে। তারপর সবশেষ।

দ্রুত এগিয়ে এসে পায়ের আওয়াজটা কেবিনের সামনে থামলো। জার্মান ভাষায় কথা বলছে ছু'জন। কিছুই বুঝতে পারলো না ম্যালোরি। একটু পর স্বস্তির সাথে শুনতে পেল, ছু'জোড়া বুটের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। একটু পরই একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ ভেসে এল।

'পায়ের রশি নিজেই খোলো,' অন্ধকার থেকে ভেসে এল আগন্তুকের গলা। 'মেঝেতে একটা কোট আর ক্যাপ রেখে গেলাম। কেবিন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে বাঁক নেবে—তাড়াতাড়ি করো!'

পায়ের ওপর ছুরির ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলো ম্যালোরি। রশি কাটতে শুরু করেছে ও, এই সময় মুহূর্তের জন্যে এক ঝলক

আলো দেখা গেল। উন্মুক্ত হয়েই সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দ্রুত মুখ তুলে তাকালো বটে, কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেল না। শুধু একটা ছায়া মতো চোখে পড়লো।

'কে উনি ?' অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলো গ্রীণ।

'যীশুই বলতে পারে,' নিচু গলায় বললো ম্যালোরি। 'তবে, জার্মান নয়—জার্মানদের ইংরেজী উচ্চারণ এত শুদ্ধ হয় না।' নিজের বাঁধন কেটে আলো জ্বাললো ম্যালোরি। ঝুঁকিটা নিতেই হলো ওকে। অন্ধকারে কাজ করতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে। চোখে আলো সয়ে আসার আগেই গ্রীণের পাশে পৌঁছে গেল ও।

বাঁধনমুক্ত গ্রীণ হাত-পা ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে, ওদিকে মেঝেতে পড়ে থাকা কোটটা গায়ে চড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ম্যালোরি। এটা একটা অ্যালপেনকরপ্‌স্ গ্রেট-কোট, লম্বায় একটু বেশি হলো, কাঁধের কাছেও একটু ঢিলে-ঢালা হলো, তবে কাজ চলবে। নরম ক্যাপটাও ঠিক ফিট করলো না।

'চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে, স্যার!' সকৌতুকে বললো গ্রীণ। 'একেবারে মেড ইন জার্মানী মনে হচ্ছে!'

'ধন্যবাদ…' পকেটে ছুরিটা লুকিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো ম্যালোরি। 'বাঁ দিক ঘেঁষে হাঁটবো আমি, তুমি আমার, ডান দিকে থাকবে। কোনো কেবিনের দরজা খোলা থাকলে, তাতে তোমাকে কাভার দিতে সুবিধে হবে আমার।' আলো নিভিয়ে দিয়ে কবাটে কান ঠেকালো ও।

এত রাতে জার্মান সৈনিকরা জেগে আছে কেন, এখন তা

জানা হয়ে গেছে ম্যালোরির। কাছেপিঠে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার দেখে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার অবস্থা হয়েছে ওদের। সেই সাথে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরুনো একশো গুণ বেশি বিপজ্জনক। ফিস-ফিস করে গ্রীণকে বললো ও, 'রওনা হলাম। কেউ যদি ডাকে, না শোনার ভান করে এগোতে থাকবো। এসো।'

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল ম্যালোরি। প্যাসেজটা দু'দি-কেই নির্জন। বেরিয়ে এসে গ্রীণকে পথ ছেড়ে দিল ও, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করলো দরজা। গ্রীণকে ডান পাশে নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

প্রথম কেবিনের দরজা আধ-খোলা দেখলো ওরা। সেটার সামনে পৌঁছুবার আগেই জার্মান শব্দ এবং উচ্চারণ শুনতে পেল। খুব আস্তে নয়, আবার খুব দ্রুতও নয়, স্বাভাবিক গতিতে এগোলো ওরা। তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। দরজা-টাকে পাশ কাটাবার সময় চোখের কোণ দিয়ে ভেতরে তাকালো ম্যালোরি। ঝাপসা লাগলো ভেতরটা, ধোঁয়ায় ভরে আছে। আবছাভাবে অ্যালপেনকরপ্‌স্ ইউনিফর্মও দেখতে পেল। দরজা-টাকে পাশ কাটিয়ে চলে এল ওরা।

হাঁটার গতি আগের মতো রেখে সিঁড়ির দিকে তাকালো ম্যালোরি। প্রথম ধাপের নিচে গাদা হয়ে আছে ব্যাগ-ব্যাগেজ। পরবর্তী কেবিনের দরজাও খোলা, একেবারে হা-হা করছে। ভেতর থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ একটু বেশি রকম দোলা খেলো জাহাজ, তাল সামলাবার জন্যে

রেলিঙ ধরে ফেললো গ্রীণ। হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যে কমাতে হলো ম্যালোরিকে। পিছিয়ে পড়েছিল গ্রীণ, আবার ম্যালোরির পাশে চলে এল সে। ভাগ্যিস খোলা দরজার সামনে ঘটনাটা ঘটেনি, মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালো ওরা। সিভিল ড্রেস পরা গ্রীণকে নির্ঘাৎ দেখে ফেলতো জার্মান সৈনিকরা।

খোলা দরজাকে পাশ কাটাবার সময় আড়চোখে তাকালো ম্যালোরি। ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। এক-জন সৈনিক দরজার কবাটে পিঠ দিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় মজার কোনো গল্প বলছে সে, সেটাই হাসির কারণ। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করলো ম্যালোরি—সৈনিকদের মনোবল অটুট রাখার জন্যে হাসির গল্প শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৌশলটা কাজেও লাগছে, ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের কথা ভুলে গেছে সাধারণ সৈনিক।

আর একটা কেবিনকে পাশ কাটাতে হবে। সেটার দরজা বন্ধ।

বন্ধ দরজাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কয়েক গজ সামনেই সিঁড়ি। ব্যাগগুলোকে টপকে গেল দু'জন। একটা ব্যাগের মুখ খোলা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলো গ্রীণ। উঁকি দিতেই দেখলো, ভেতরে টাইমিং মেকানিজমসহ ডিমোলিশন চার্জ রয়েছে। গ্রীণ দাঁড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে খপ্ করে তার হাত ধরে টান দিল ম্যালোরি। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিঃশব্দে উপরে উঠতে শুরু করলো ওরা।

দরজা খুলে ডেকে বেরিয়ে আসতেই প্রচণ্ড বাতাসে ম্যালো-

রির মাথা থেকে ক্যাপটা উড়ে গেল। বাতাসের ধাক্কা খেয়ে নিজেও তাল হারিয়ে ফেললো, কিন্তু পিছন থেকে তাকে ধরে ফেললো গ্রীণ। বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো ওরা। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখলো না। সবশেষে আরেকবার তাকালো স্টারবোর্ডের দিকে। ডেস্ট্রয়ারকে এত কাছে দেখে মনে মনে সাহস পেল ওরা। সিগন্যালিং ল্যাম্পের আলোক-সংকেত দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠলো ম্যালোরির। ওরা কি টাটরাকে থামার নির্দেশ দিচ্ছে? মাথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে স্টার্ণের দিকে তাকাতেই ভেলাটা দেখতে পেল ও। ভেলার গা থেকে ক্যানভাসের কাভার সরিয়ে রাখা হয়েছে। চাঁদের আলোয় রেসকিউ লুপগুলোকে ভেলার পাশে ঝুলতে দেখলো, টাটরার সাথে সমান তালে দুলছে।

এর আগে এদিকে এসেছিল বটে ম্যালোরি, কিন্তু ক্যানভাসে ঢাকা ছিল বলে ভেলাগুলো চোখে পড়েনি। ওগুলোয় সত্যি যদি ডিসট্রেস লাইট থাকে, এ-যাত্রা হয়তো বেঁচে যাবে ওরা। ভাগ্য বিরূপ না হলে ডেস্ট্রয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, আর একবার ওদের চোখে পড়ে গেলে উদ্ধার পাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু এই উন্মত্ত সাগরে অতটুকুন একটা ভেলা নিয়ে নামা, ভয়ে শিউরে উঠলো ও। ঈজিয়ানের এখন অন্যরকম চেহারা। অসংখ্য, অগুণতি পানির পাহাড় একের পর এক ফেরী বোটের দিকে ছুটে আসছে, ঠিক যেন ছুটেও আসছে না, মনে হচ্ছে উড়ে আসছে—জাহাজটাকে বুঝি ঢেকে ফেলবে। ভেলার দিকে পা বাড়াতে যাবে ম্যালোরি, এই সময় স্টারবোর্ডের দিকে,

ফানেলের সামনে একটা ক্ষুদে ছায়ার দ্রুত কাঁপন লক্ষ্য করলো। সেদিকে ভাল করে তাকাতেই মাঝারি আকৃতির জার্মান লোক-টাকে দেখতে পেল ও। নরম হ্যাট পরে আছে লোকটা। দোল খাচ্ছে লাইফবোট, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। খপ্ করে গ্রীণের আস্তিন ধরে ফেলে তাকে থামিয়ে দিল ম্যালোরি। এই লোকটাই ইস্তাম্বুল থেকে সাধারণ একজন আরোহী হিসেবে টাটরায় উঠেছিল। স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে শোনা নামটা সহজে মনে পড়তে চাইলো না। তারপর মনে পড়লো। ডঃ রিচার্ড মেয়র।

দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি এবং হাবভাব দেখে মনে হলো ব্রিজের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ানো কারও সাথে বোধহয় কথা বলছে মেয়র। ভাগ্ ব্যাটা, মনে মনে বললো ম্যালোরি।—কেটে পড়!

কিন্তু, যেন তার মনের কথা শুনতে পেয়েই, ধীরে ধীরে ওদের দিকে ফিরতে শুরু করলো জার্মান লোকটা।

এগারো

ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের কাছ থেকে এইমাত্র তাজা একটা নতুন খবর পাওয়া গেল, 'গালফ্ অব জার্ভোসে ইটালিয়ান মাইন ছড়ানো হয়েছে।' খবরটা কর্নেল ব্রিজেলবার্ডকে আশ্বস্ত করার কথা, কিন্তু তা না করে সাংঘাতিক ভাবে বিচলিত করে তুললো।

আশ্বস্ত হবার কথা এই জন্যে যে ডেস্ট্রয়ারের কমাণ্ডার টাট-রার ক্যাপ্টেনকে বন্ধু বলে ধরে নিয়ে বিপদ থেকে দূরে সরে থাকার সৎ পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু ব্রিজেলবার্ড জানে, সরু প্রবেশ-পথ থেকে কাটায়রা, গালফের মাথা পর্যন্ত দূরত্ব হলো বিশ মাইল, এবং রাতের অন্ধকারে মাইন ছড়ানো এই বিশ মাইল পাড়ি দেয়া ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও ভয়ংকর বিপজ্জনক। বন্ধু দেশ ইটালিকে বাপ-মা তুলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করলো সে, অবশ্য মনে মনে। মুখে ক্যাপ্টেন মোপাস্থকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ডেস্ট্রয়ারকে ধন্যবাদ দাও।'

সিকিউরিটির কারণে এই জার্ভোস অপারেশনের কথা ইটা-লিয়ান হাই কমাণ্ডকে জানানো হয়নি। কিন্তু কেই-বা জানতো

এত রাত থাকতে আজকের রাতেই হঠাৎ করে আকাশ থেকে গালফে মাইন ছড়াবার সিদ্ধান্ত নেবে তারা ? হ্যাঁ, বাবা, একটা অভিযান বটে ! মনে রাখার মতো হচ্ছে !

'যাও,' একজন সৈনিককে নির্দেশ দিল সে, 'নিচে গিয়ে আমার কেবিনে নিয়ে এসো ইংরেজ বন্দীদের।' তাকিয়ে আছে ডেস্ট্রয়ারের দিকে, কিন্তু সৈনিকের চলে যাওয়াটা টের পেল। অলক্ষুণে অ্যাবওয়েরের অফিসারের ইঙ্গিতটা তিক্ত লাগলেও, ব্যাপারটা চেক করে দেখা দরকার। ক্যাপ্টেন মোপাস্থ সিগন্যাল পাঠানো শেষ করতে তার চিন্তায় বাধা পড়লো। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো মোপাস্থ। অলস চোখে ডেস্ট্রয়ার থেকে পাঠানো সিগন্যাল দেখছে। হ্যাঁ, ব্রিজেলবার্ডের মাথার ভেতর আবার চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন, ব্রিটিশ সেকেণ্ড-লেফটেন্যাণ্ট আর স্টাফ-সার্জেন্টকে আরেকবার জেরা করা দরকার। কিন্তু এবার আর মুলারকে দিয়ে নয়, জেরা করাবে সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড মেজর হেফনারকে দিয়ে। হেফনারও ভাল ইংরেজী জানে।

কথা বলার সময় স্বস্তি আর আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না বেন ফকার। 'ওরা আমাদের শুভ-যাত্রা কামনা করছে!'

সুখবরটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এল, বিশ্বাসই হতে চাইলো না ব্রিজেলবার্ডের। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো না সে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধান হবার নির্দেশ দিল ফকারকে, 'কোর্স বদলাবে না। স্পীড ঠিক রাখো। আমাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে এটা ওদের একটা চালও হতে পারে।' ফিরলো ক্যাপ্টেন মোপাস্থর দিকে। 'ক্যাপ্টেন মোপাস্থ! আমি

অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত, প্লিজ, ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।' কোনো সন্দেহ নেই, ডেস্ট্রয়ার থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা টাটরার ব্রিজ। আর কমাণ্ডার যদি ধুরন্ধর প্রকৃতির হয়, নিশ্চয়ই তার গ্লাস এই মুহূর্তে ফেরী বোটের ব্রিজের দিকে ফোকাস করা আছে। নিজেকে খুব একটা আশান্বিত হতে দিল না ব্রিজেলবার্ড, সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ্য করতে লাগলো ডেস্ট্রয়ারের কোর্স। কোটের পকেটে তার হাত দু'টো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে। সত্যিই কি বিপদ কাটিয়ে উঠছে তারা?

'সেই আগের কোর্সেই ছুটে আসছে ডেস্ট্রয়ার।' আনন্দ নয়, ফকারের গলার সুরে আতংক প্রকাশ পেল।

কোনো দিকে ফিরলো না ব্রিজেলবার্ড, ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসা ডেস্ট্রয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকলো একদৃষ্টে। এক দুই করে কেটে গেল আরও কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঘটনাটা ঘটতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে কোর্স বদল করছে ডেস্ট্রয়ার। উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে যাচ্ছে সেটা। সংক্ষেপে ফকারকে অভিনন্দন জানালো ব্রিজেলবার্ড, বেরিয়ে এল ব্রিজ থেকে। ডেক পেরিয়ে এসে দরজা খুললো, ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালো সিঁড়ির মাথায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ, আর কেউ নয়, অ্যাবওয়ের অফিসার ডঃ রিচার্ড মেয়র।

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটে আসছে মেজর হেফনার, তার পিছনে হেঁটে আসতে দেখা গেল রাহাত খানকে। রাহাতের অনেকটা পিছনে রয়েছে মুলার, সে-ও ছুটে আসছে।

সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ালো মেজর হেফনার। মুখ তুলে

তাকালো সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো কর্নেলের দিকে।

'কি হয়েছে ?' দ্রুত জানতে চাইলো ব্রিজেলবার্ড।

'ইংরেজ বন্দীরা···ওরা পালিয়েছে, স্যার !'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ব্রিজেলবার্ড। 'কিন্তু ওদেরকে তো বেঁধে রাখা হয়েছিল !'

'তল্লাশির কাজ শুরু হয়ে গেছে, স্যার,' বললো হেফনার। তার চেহারায় তেমন কোনো অস্থিরতা দেখা গেল না। 'ব্রিজে আরও দু'জন লোক রাখো,' মুলারকে বললো সে। সাথে সাথে অর্ডার ইস্যু করলো মুলার। পাশের কেবিন থেকে দু'জন সৈনিককে ডেকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে। 'এইমাত্র হের মেয়রের সাথে পরিচয় হলো আমার,' ব্রিজেলবার্ড কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই মুখ খুললো হেফনার। 'আমরা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের কথা আলোচনা করছিলাম···'

'ডেস্ট্রয়ার ফিরে যাচ্ছে···' শুরু করলো ব্রিজেলবার্ড।

'আপনি ঠিক জানেন ?' এবার তাকে বাধা দিল রাহাত খান।

চোখে কৌতূহল নিয়ে রাহাতের দিকে তাকিয়ে আছে হেফনার। ব্রিজেলবার্ডও তাকিয়ে আছে, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো এইমাত্র যেন তার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। খোলা কেবিনের দরজা দিয়ে আরও ট্রুপস বেরিয়ে আসছে। ফ্র্যাংকের নির্দেশে কিছু লোক ইঞ্জিনরুম সার্চ করতে যাচ্ছে। একজন সৈনিককে অতিরিক্ত গার্ড হিসেবে পাঠানো হলো ওয়্যারলেস রুমে। কিন্তু এখুনি কাউকে খোলা ডেকে পাঠানো হলো না।

ডেকের ছোট একটা অংশে ফ্র্যাংক নিজেই তল্লাশি চালাবে।

তীক্ষ্ণ চোখে ব্রিজেলবার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে রাহাত, কর্নেলের প্রতিক্রিয়া তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটায়নি। 'ঠিক এই ধরনের একটা ঘটনার কথা শুনেছি আমি,' গম্ভীর সুরে বললো ও। 'নরওয়ের কাছাকাছি। একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারকে আসতে দেখে আমাদের একটা মার্চেন্টশিপ আর্জেন্টিনিয়ান ফ্ল্যাগ ওড়ায়। কাছাকাছি এসে সেটা দেখতে পেয়ে নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে শুরু করে ডেস্ট্রয়ার, ঠিক আপনার এই ডেস্ট্রয়ারের মতো। কিন্তু পুরো একটা চক্কর দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে স্টার্নের দিক থেকে একেবারে জাহাজের গায়ের কাছে চলে আসে সেই ডেস্ট্রয়ার, সী-কক খুলে দেবার আগেই ব্রিটিশ সৈনিকরা আমাদের জাহাজে উঠে পড়ে। আপনার ডেস্ট্রয়ারও হয়তো ঠিক তাই করতে যাচ্ছে। আমি বলতে চাইছি, বিপদ কেটে গেছে বলে মনে করা করা উচিত হবে না। হতে পারে বিপদ মাত্র শুরু হতে যাচ্ছে।'

স্তব্ধ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ব্রিজেলবার্ড। অ্যাবওয়েরের অফিসার তার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। লোকটা বানানো গল্প শোনায়নি, জানে সে। ঘটনাটার কথা সে-ও শুনেছে বটে।

ব্রিজেলবার্ডের কাছ থেকে কোনো উত্তরের আশায় না থেকে হেফনারের দিকে ফিরলো রাহাত। 'আমার সাথে ডেকে আসুন, দেখি কি করছে জাহাজটা।'

কিছু না বলে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে নিজের কেবিনের দিকে এগোলো ব্রিজেলবার্ড। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে

যাচ্ছে অ্যাবওয়ের অফিসার, বিশ্বস্ত কুকুরের মতো তাকে অনুসরণ করছে মেজর হেফনার।

ডেকে বেরিয়ে এসে কোটের কলার তুলে দিল রাহাত। ব্রিজের বাইরে, দরজার পাশে, পাহারা বসানো হয়েছে। হেফনারকে দেখে স্যালুট ঠুকলো লোকটা। ভেতরে ঢুকে লক্ষ্য করলো হেফনার, পিছন দিকে, ছায়ার মধ্যে আরও দু'জন সৈনিককে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে মুলার।

তীক্ষ্ণ চোখে ডেস্ট্রয়ারের দিকে তাকালো হেফনার। এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো রাহাত।

'সত্যি চলে যাচ্ছে কিনা জানতে হলে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' হেফনারের দিকে তাকিয়ে বললো ও। মেজরের চেহারায় হাঙ্গেরিয়ান একটা ছাপ আছে, লক্ষ্য করলো। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যটা খুব ভাল। সন্দেহ নেই, এর শরীরে বলকান রক্ত আছে। চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি আর আভিজাত্যের ছাপ থাকার সেটাই বোধহয় কারণ।

'কেবিন থেকে বন্দীদের এই পালিয়ে যাওয়াটা, মেজাজ একেবারে খারাপ করে দিয়েছে আমার,' সিগারেট কেস খুলে রাহাতের সামনে ধরলো হেফনার। অলস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলো রাহাত, তারপর পকেট থেকে নিজের কেস বের করে একটা চুরুট বেছে নিল। তাতে আগুন ধরিয়ে দিল হেফনার। 'তবে, পালিয়ে যাবে কোথায়! যাই, ডেকে বেরিয়ে সার্চটা সুপারভাইজ করিগে।'

'পালানোর চেয়ে পালাবার ভঙ্গিটা আমাকে চিন্তায় ফেলে

দিয়েছে,' বললো রাহাত।

ঝট্ করে রাহাতের দিকে মুখ তুলে তাকালো হেফনার। তারপর, কোনো মন্তব্য না করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল খোলা ডেকে। একটু পর তার পিছু নিল রাহাত। ঠিক সেই মুহূর্তে মস্ত একটা ঢেউয়ের মাথা আছাড় খেলো রেলিঙের ওপর, পানির ছাঁট লেগে ভিজে গেল দু'জনেই। ছুটে গিয়ে ফানেলের স্টার-বোর্ড সাইডে আড়াল নিল হেফনার, সিল্কের একটা রুমাল বের করে মুখ মুছলো। তাকে ছাড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়ে গেল রাহাত, দাঁড়ালো লাইফবোটের কাছে।

'আপনার চেহারা···আমার যদি ভুল না হয়, আপনার শরীরে বলকান রক্ত বইছে। ভুল বললাম?' হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে এল রাহাত।

'একশো বছর আগে আমার গ্র্যাণ্ডফাদার বুদাপেস্ট থেকে মিউনিকে চলে আসেন,' একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললো হেফনার। 'সেই থেকে আমাদের পরিবার সম্পূর্ণ জার্মান পরিবার হয়ে গেছে।' নিজেকে খাঁটি জার্মান প্রমাণ করার জন্যে আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করলো তার, কিন্তু বেশি কথা বললে অ্যাবওয়ের অফিসারের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেয়া হবে মনে করে অনেক কষ্টে চুপ করে থাকলো সে। লোকটা কি সত্যি অ্যাবওয়ের অফিসার? নাকি, গেস্টাপোর এজেন্ট? কে জার্মান, কে জার্মান নয় এসব ব্যাপারে নাক গলাবার অভ্যেস গেস্টা-পোরই আছে বলে শুনেছে সে। সন্দেহের কথাটা ব্রিজেলবার্ডকে বলতে হবে। হঠাৎ পোর্ট সাইডে দু'জন অ্যালপেনকরপ্স্

সৈনিককে দেখলো সে। স্টার্ণের দিকে যাচ্ছে তারা, মাথা নিচু করে রেখেছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। স্টার্ণের দিকে তাকিয়ে আছে রাহাতও, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন ওখানে কিছু দেখতে পেয়েছে ও। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর আবার সে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে হেফনারের দিকে তাকালো। এরপর তিন সেকেণ্ডও পেরোয়নি, হঠাৎ অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের একজন চেঁচিয়ে উঠলো।

ছুটে গেল হেফনার। দুর থেকে দেখলো, ভেলার কাছে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বাঘের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সৈনিক দু'জন।

ধাক্কা খেয়ে রেলিঙের গায়ে পড়লো ম্যালোরি। নাক বরাবর ঘুসি ছুটে আসছে দেখে মাথাটা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো ও, চোয়ালে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল মুঠোটা। দম নিয়ে একটা হাঁটু ভাঁজ করলো সে, পেটে গুঁতো খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো একজন সৈনিক, তার ঘাড়ে কনুই দিয়ে সজোরে আঘাত করলো ম্যালোরি। পড়ে গেল লোকটা। ঝুঁকে তার গলা চেপে ধরতে গেল ম্যালোরি। কিন্তু ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করতে পেরে মাথাটা বুকের ওপর নামিয়ে রেখেছিল জার্মান সৈনিক, ফলে ম্যালোরির হাত তার গলা খুঁজে পেল না। চোখে দেখছে না, আন্দাজের ওপর নির্ভর করে লোকটা ম্যালোরির মাথার চুল ধরার চেষ্টা করলো। এইভাবে কিছুক্ষণ যুঝলো ওরা, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট্ লাগালো ম্যালোরি, যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে।

দৃঢ় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো জার্মান সৈনিক, ছুটলো ম্যালোরির পিছু পিছু। হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছন দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল ম্যালোরি। তার চোখা বুটের ডগা ঘ্যাচ করে বিঁধে গেল লোকটার হাঁটুতে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা, সাথে সাথে তার ওপর ডাইভ দিয়ে পড়লো ম্যালোরি। ডেকের ওপর কিছু-ক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর আবার উঠে দাঁড়ালো দু'জন। জার্মান সৈনিকটাকে খেদিয়ে রেলিঙের ওপর নিয়ে ফেললো ম্যালোরি। এমনই দুর্ভাগ্য লোকটার, ঠিক এই সময় রেলিঙের দিকে কাত হয়ে পড়লো টাটরা। কিছু করতে হলো না ম্যালোরিকে, লোক-টাকে শুধু ছেড়ে দিল ও। রেলিঙের ওপর দিয়ে ওদিকে পড়ে যেতে শুরু করলো লোকটা। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হেফনার। হঠাৎ তার হুঁশ ফিরলো। পিস্তলটা উল্টো করে ধরে ম্যালোরির দিকে ছুটলো সে, উদ্দেশ্য পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারবে। ডেস্ট্রয়ার থেকে আওয়াজ শোনা যাবে বলে সে নিজেই আদেশ দিয়ে রেখেছে কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। এখন গুলি-হলে ডেস্ট্রয়ার থেকে শুনতে পাবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা, কারণ যুদ্ধ-জাহাজটা এই মুহূর্তে টাটরার দিকে তার স্টার্ণ দিয়ে রয়েছে। হেফনার একেবারে ম্যালোরির কাছে পৌঁছে পা পিছলে দড়াম্ করে ডেকের ওপর আছাড় খেলো। মাথা তুললো সে, দেখলো, ফানেলের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে লোকজন। 'ফ্র্যাংক!' চেঁচিয়ে উঠলো সে, পরমুহূর্তে ম্যালোরির বুটের চোখা ডগা ছুটে আসছে দেখে ডেকের গায়ে নামিয়ে নিল মাথা।

ফ্র্যাংক আর দু'জন সৈনিক ম্যালোরির দিকে এগিয়ে এল। ওদিকে গ্রীণও একাই কয়েকজন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের সাথে লড়ে চলেছে। উচ্চাভিলাষী না হলেও, দেখা যাচ্ছে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে-ও, ম্যালোরির মতোই।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো হেফনার। রেলিঙের ওপর পেট দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। উত্তাল সাগর আর সাদা ফেনা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের এক গাছি চুল পর্যন্ত চোখে পড়লো না কোথাও।

এক মিনিটও কাটলো না, ম্যালোরি এবং গ্রীণকে আবার বন্দী করা হলো। তাদের পিঠে মেশিন-পিস্তলের মাজল চেপে ধরে খোলা ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ফ্র্যাংককে কাছে ডেকে সাবধান করে দিয়ে বললো হেফনার, বন্দীদের জেরা করার জন্যে প্রয়োজন হবে, কাজেই ওদেরকে সুস্থ, বহাল-তবিয়তে রাখা চাই। একজন বন্ধুকে হারিয়ে অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে, এই মুহূর্তে ম্যালোরি দুর্ঘটনার শিকার হলে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই। সিঁড়ির মাথা থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা যাক ম্যালোরি, হেফনার তা চায় না। আবার যখন ঘুরলো হেফনার, দেখলো, একটা ভেন্টিলেটার ধরে ভারসাম্য রক্ষা করছে অ্যাবওয়ের অফিসার। তাকিয়ে আছে ভেলাটার দিকে, ওটা যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী।

'আরেকটু হলে গিয়েছিল পালিয়ে!' বললো রাহাত।

'কিন্তু পারেনি...' মনে মনে ক্ষেপে উঠলো হেফনার। একজন সৈনিক ডুবে মরলো, অথচ সে ব্যাপারে অ্যাবওয়ের অফিসারের

কোনো মাথাব্যথাই নেই।

'মিনিট দুয়েক সময় পেলে ভেলা নিয়ে সাগরে নেমে যেত ওরা,' গম্ভীর, তিক্ত সুরে বললো রাহাত। 'আর আপনি, ডেস্ট্রয়ার থেকে ওরা শুনতে পাবে ভেবে, গুলি করতে সাহস পেলেন না!'

কনুইয়ের কাছে চামড়া ছড়ে গেছে হেফনারের, সিল্কের রুমাল দিয়ে জায়গাটা মুছে নিল সে। তারপর হেলান দিল ভেন্টিলেটারের গায়ে। অ্যাবওয়েরের অফিসারের মন্তব্যগুলো চিন্তিত করে তুলেছে তাকে। শুনেছে, অ্যাবওয়ের-চীফ ক্যানারিস নাকি সৈনিকদের এত বেশি ঘৃণা করে, ইউনিফর্ম পরা থাকলে নিজের অফিসে কাউকে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। এই ব্যাটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে তার চীফের মতোই, সৈনিকদের জন্যে এর মনেও কোনো রকম সহানুভূতি নেই। ঘটনাটা ঘটার সময় অফিসার বলতে সে একাই উপস্থিত ছিল, মন্দ কপাল আর বলে কাকে! পরিবেশটা হালকা করার জন্যে একটু ব্যঙ্গের সুরে কৌতুক করার চেষ্টা করলো সে। আপনিও অবশ্য খোলা ডেকে ওভাবে বেরিয়ে এসে খুবই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, ডঃ রিচার্ড।

'যতদুর বুঝতে পারছিলাম, ওদের কাছে কোনো পিস্তল ছিল না। আর সাহসের কথা যদি বলেন, ওটা দেখাবার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই, মেজর হেফনার,' গলার সুরে ঝাঁঝ এবং টক মিশিয়ে বলে চললো রাহাত, 'আমার বেঁচে থাকাটাই জরুরী, জ্যান্ত মেয়রই রাইখের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এই ঘটনার পর এখুনি ব্রিজেলবার্ডের সাথে কথা হওয়া দরকার

আমার।' ঈজিয়ানের পশ্চিম দিকে দৃষ্টি হানলো সে। 'গালফ অব জার্ভোসে ঢোকার মুখে পৌঁছুবার আগে কয়েকটা নির্দিষ্ট বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আগে কখনও ওই প্যাসেজ দিয়ে যাবার দুর্ভাগ্য হয়েছে আপনার? হয়নি? তাহলে এটা আপনার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে—ওই সরু এণ্ট্রান্স দিয়ে এই রকম এক রাতে গালফে ঢোকার চেয়ে নরকের গেট পেরুনো অনেক সহজ, মেজর হেফনার।'

বারো

রাত আড়াইটার দিকে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়লো টাটরা। ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতিতে ছুটে এসে ফেরীর গায়ে বাতাস তো নয়, যেন ভারি পাথরের টুকরো পড়তে লাগলো। ঢেউগুলোকে মনে হলো এক একটা আকাশ ছোঁয়া পাঁচিল, ঢালের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত চাকার মতো বন বন করে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে ডগায় উঠে যাচ্ছে জাহাজ, তারপর যেই সাগরে বো ঢুকিয়ে দিয়ে ঢাল থেকে নামতে শুরু করছে অমনি ঢেউয়ের মাথার কাছে বিস্ফোরিত হচ্ছে পানি, জলপ্রপাত নায়াগ্রার মতো ব্রিজের জানালায় নেমে আসছে জলের স্তম্ভ, কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিচ্ছে ওদেরকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে ব্রিজেলবার্ড দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে রেলিঙ। বিস্ময়ে হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে, তাকিয়ে আছে কেপ জার্ভোস থেকে জাহাজের দিকে ছুটে আসা ঢেউয়ের মিছিলের দিকে। পানির পাঁচিল-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, টাটরাকে ধ্বংস করাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য ওগুলোর।

কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের পাশেই দেখা যাচ্ছে তার ছায়া অ্যাবওয়ের অফিসারকে। ক্যাপটা কপালের ওপর নামিয়ে রেখেছে রাহাত, দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে আছে নিভে যাওয়া চুরুট। কয়েক ফিট সামনে হুইল ধরে রয়েছে ফকার, থামের সাথে বাধিয়ে নিয়ে পা দু'টো যথাসম্ভব ফাঁক করে নিয়েছে সে, তা না হলে কখন ছিটকে পড়ে যেত কেউ বলতে পারে না। কাঁধ দু'টো সামনের দিকে ঝুঁকে আছে তার. টান পড়েছে শরীরের প্রতিটি পেশীতে। তার ডান দিকে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে মোপাস্থ, মুখে ফুটে উঠেছে অসংখ্য রেখা আর ভাঁজ, স্থির দৃষ্টিতে সে-ও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ব্রিজেলবার্ডকে উদ্দেশ্য করে মুখ খুললো সে। ভঙ্গিটা এতোই কর্কশ, মনে হতে পারে গ্রীক ক্যাপ্টেন বোধহয় তার জাহাজের দখল ফিরে পেয়েছে।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে টুকরো হয়ে যাবে জাহাজ।'

'তা যাতে না যায়, সে-ব্যবস্থা করো!' কঠোর সুরে নির্দেশ দিল ব্রিজেলবার্ড। 'তুমি একজন নেভিগেটর, জাহাজকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রেনিং আছে তোমার। কি করলে পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লাগবে না সে-পরামর্শ দাও। মনে রেখো, জাহাজ ডুবলে তোমার ক্রুরাও কেউ বাঁচবে না।'

মুখে যাই বলুক মনে মনে ভয়ে একেবারে চুপসে গেছে ব্রিজেলবার্ড। ব্রিজ থেকে গালফে ঢোকার এন্ট্রান্সটা চাঁদের

আলোয় মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা ভয়ংকর।

আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে গভীর কালো ছায়া, একটা নয়, সারি সারি, অনেক। ওগুলো কি তা কাউকে বলে দেবার দরকার করে না—নিরেট পাথুরে পাহাড়। উত্তর-পুব দিকেও তাই, পেনিনসুলার পাথুরে পাঁচিল প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে তিন হাজার ফুট উঁচু চূড়ায়, মাউন্ট জার্ভোসের মাথা পর্যন্ত। নাগরদোলায় চড়ে আরেকটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে এল টাটরা, ক্ষণিকের জন্যে গালফের প্রবেশ-পথ চোখে পড়লো। সারি সারি ছায়ার মাঝখানে ছোট একটা ফাঁক। দূর থেকে এতোই সরু দেখালো, মনে হলো ওই বোতলের গলার ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে গেলে ঘষা খেয়ে জাহাজের দু'পাশেরই ছাল উঠে যাবে। ঢেউয়ের মাথা থেকে নামতে শুরু করলো টাটরা, সেই সাথে হারিয়ে গেল দৃশ্যটা। মনে মনে নিজেকে এই বলে ভরসা দিল ব্রিজেলবার্ড, দূর থেকে সব কিছুই ছোট দেখায়, কাছে পৌঁছুলে দেখা যাবে এন্ট্রান্সটা যথেষ্ট চওড়া।

'কি বললো মোপাস্থ?' জানতে চাইলো বেন ফকার। গ্রীক ভাষা বোঝে না সে।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। আমি বলেছি অসম্ভব।'

লক্ষ্য করলো রাহাত, কথাটা শুনে নিজের কোনো মতামত দিল না ফকার। তারমানে, মনে মনে মোপাস্থকেই সমর্থন করছে সে। কিন্তু কারও সমর্থন ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে ব্রিজেলবার্ড, জানে ও।

ওদিকে ব্রিজেলবার্ড ভাবছে অন্য কথা। ফকারের মনোভাব

বুঝতে পেরেছে সে। সে নিজেও এতগুলো মানুষের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু হেডকোয়ার্টার থেকে যে সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে সেটা বদল করার ক্ষমতা তার নেই। এই অপারেশনের একটা নির্দিষ্ট টাইমটেবল বেধে দেয়া আছে—সকালের মধ্যে কাটায়রায় পৌঁছুতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই পিছিয়ে যাওয়া বা অপেক্ষা করা চলবে না। কারণ, মঞ্চে এরচেয়ে অনেক, অনেক বড় একটা ফোর্সের আগমন ঘটবে এবং তার পথটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই ছোট ফোর্সটাকে। এই ক্ষুদে আপারেশনের ওপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করেছে এখন। ব্যর্থ হবার বা দেরি করে ফেলার কোনোই অবকাশ নেই। বলে দেয়া হয়েছে, হয় সফল হও নয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও।

সিদ্ধান্তে অটল থাকলো ব্রিজেলবার্ড, নিশ্চিহ্ন হবার পথেই এগোবে সে।

ক্যাপ্টেন মোপাস্থর বারবার তাগাদায় কাজ হলো। ব্রিজে যারা আছে তাদের সবাইকে লাইফ-জ্যাকেট পরতে হলো। ডেকের নিচে সৈনিকরাও পরলো। গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর লাগলো রাহাতের। সাগরের যা মতিগতি, লাইফ-জ্যাকেটে কোনো কাজ হবে না। পাহাড়-পাঁচিলের সাথে টাটরা যদি ধাক্কা খায়, টুকরো নয়, গুঁড়ো হয়ে যাবে ফেরী বোট। সাগর যেন টগবগ করে ফুটছে, এই অবস্থায় একজনেরও বাঁচার আশা নেই।

আরেকটা পানির ঢাল বেয়ে ঢেউয়ের মাথায় উঠে এল টাটরা। নিরেট পাথর দিয়ে ঘেরা গালফের প্রবেশ-পথটা দেখতে পেল ও। দিনের উজ্জ্বল আলোয়, শান্ত সাগরে ওই সরু প্যাসেজ দিয়ে পথ

করে নিতে হলে শুধু নাবিকের দক্ষতায় কাজ হবে না, সেই সাথে চাই ভাগ্যের খানিকটা সহায়তা। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ঠিক তার উল্টো। রাত তিনটের অন্ধকার, ঈজিয়ানের রুদ্রমূর্তি, হুইলটা এমন একজন লোকের হাতে রয়েছে এই পথের ভাল-মন্দ কিছুই যার জানা নেই। কিন্তু বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে ফকারের মনে কোনো ভুল ধারণা নেই। জানে, সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে।

রাহাতের কয়েক ফিট বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেজর হেফনার। এমনই চুপচাপ আর স্থির, এখনও সে ওখানে আছে কিনা দেখার জন্যে একবার তাকাতে হলো রাহাতকে। সাগরের উন্মত্ত আচরণ দু'চোখ ভরে দেখছে সে। উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই চেহারায়। মনে হতে পারে, লোকটার মন পাথরের তৈরি। কিন্তু তার কপালে ঘাম চিকচিক করে উঠতে দেখলো রাহাত। ব্রিজেলবার্ড শুনতে পাবে জেনেই মেজরকে কথাটা বললো ও, 'জাহাজ যদি ডুবতে শুরু করে, সবাই যেন ভুলে না যাই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হোল্ডে পড়ে আছে পাপাগোপালা।'

'গার্ডকে বলা আছে,' বললো হেফনার। 'ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ডেকে তুলে নিয়ে আসা হবে তাকে। আমি নিজে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি।'

ব্রিজেলবার্ড এমন ভান করলো, যেন ওদের কথা শুনতে পায়নি, কিন্তু নিজের অজান্তেই টান পড়লো তার তলপেটের পেশীতে। সন্দেহ নেই, অ্যাবওয়েরের অফিসার তাকে শোনাবার জন্যে 'জাহাজ যদি ডুবতে শুরু' শব্দগুলো ব্যবহার করলো। তার-

মানে, ফকারের মতো সে-ও সমর্থন করছে ক্যাপ্টেন মোপাস্সুকে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়।

একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হলেও ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে লক্ষ্য করে বুকে ভয় ধরে গেল ব্রিজেলবার্ডের। পায়ের নিচে টলমল করছে ডেক, নাট-বল্টু, কাঠের পাটাতন আর লোহার পাত সব নড়বড়ে, ঢিলে হয়ে আসছে। ইঞ্জিনের শক্তি ফুরোয়নি, কিন্তু সাগরের তুলনায় সে যে কিছু নয় সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না—ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ প্রায় সবটুকু চাপা পড়ে গেছে সাগরের একটানা গর্জনে। এখন আর শোঁ শোঁ করছে না বাতাস, তীক্ষ্ণ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে তার আওয়াজ। সাবধান না হলে, ভাগ্য সহায়তা না করলে জাহাজের কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবে ওরা। একই ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় তার শোল্ডার ব্লেড ব্যথা করতে শুরু করেছে, কিন্তু তবু সে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলো যেন দৃঢ়তার একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে চায় সে। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এক দৃষ্টিতে সাগরের উত্থান আর পতন দেখছে। হ্যাঁ, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। ব্রিজের সামনে দুনিয়াটা যেন সচল ছায়াদের দুনিয়া। প্রতিটি ছায়া এক একটা পাহাড়, পানির পাহাড়। ঢেউয়ের নিচে নামছে টাটরা, তার মাস্টহেডকে ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে পরবর্তী ঢেউ।

'ক্যাপ্টেন মোপাস্সু হয়তো ঠিকই বলছেন—পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেঙে যেতে পারে জাহাজ।'

রাহাতের কথা শুনে মনের অশান্তি আরও বেড়ে গেল ব্রিজেলবার্ডের। বললো, 'ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হবে। আমি

মনে করি, ফকার আমাদেরকে নিরাপদেই নিয়ে যেতে পারবে।" তারপর রাহাতের দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করলো, 'তারমানে, আপনি গ্রীক ভাষা জানেন ?'

'এতোই ভাল যে অনেককে শেখাতে পারি,' সাথে সাথে জবাব দিল রাহাত, চোখ দু'টো একটু ঢুলুঢুলু হয়ে আছে, কিন্তু চেহারায় গাম্ভীর্য নেই। 'প্রসঙ্গক্রমে, আপনার চেয়ে ভালভাবে বলতেও পারি।' একটু থামলো রাহাত, পরমুহূর্তে চটে ওঠা সুরে আবার বললো, 'একটু বুদ্ধি খেলিয়ে দেখুন না, তা না হলে এই ট্রিপের জন্যে নির্বাচন করা হতো আমাকে ?'

'আর কোনো ভাষা ?' কিছু একটা বলা দরকার তাই বলা, উত্তরটা কি হবে না হবে সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই ব্রিজেলবার্ডের।

'হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ। কিন্তু এই ভয়েজে সেটা আমি কোনো কাজে লাগাতে পারবো বলে মনে হয় না।' চটে ওঠা ভাবটা এখন আর রাহাতের সুরে বা চেহারায় নেই।

অ্যাবওয়ের অফিসারের এই জিনিসটাই সবচেয়ে আশ্চর্য আর বিব্রত করে ব্রিজেলবার্ডকে। মুহূর্তে মুহূর্তে মেজাজ বদলে যায়। আগে থেকে বোঝা যায় না কিছুই, তাই প্রায়ই হতভম্ব হয়ে পড়তে হয় তাকে।

'মন বদলাবার আরও সময় আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনাকে এখনই নিতে হবে,' ব্রিজেলবার্ডের দিকে ফিরে দ্রুত বললো মোপাসু। তার চোখের দৃষ্টিতে আবেদন ফুটে উঠলো।

'গালফে আমরা সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে পৌঁছুতে চাই।

সেটা যাতে নিরাপদে সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা করো। অন্য কোনো কারণে যদি নাও হয়, তোমার ক্রুদের স্বার্থে।'

ক্যাপ্টেন মোপাস্থুর ভাবভঙ্গি বদলে গেল। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠলো। সরাসরি তাকালো জার্মান কর্নেলের চোখে। 'সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোর্স চেঞ্জ করতে হবে। পুব দিক থেকে ডেঞ্জারাস একটা ক্রস-কারেন্ট আছে, পশ্চিমের পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ভাঙতে না চাইলে ওতে গিয়ে পড়তে হবে আমাদের। আপনার হেল্মস্‌ম্যানকে বলুন'

সাথে সাথে জার্মান ভাষায় নির্দেশ দিল ব্রিজেলবার্ড। কিন্তু নির্দেশটা ভাল বুঝলোও না সে, মোপাস্থুর ওপর থেকে তার সন্দেহও দুর হলো না। মোপাস্থুর কথার অর্থ দাঁড়ায়—সোজা জার্ভোস পাহাড়ের খাড়া পাঁচিলের দিকে চলো। ব্রিজেলবার্ডের দুশ্চিন্তায় ভারি মাথায় গ্রীক ক্যাপ্টেন যেন আরও খানিকটা বোঝা চাপিয়ে দিল। খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগে ভয়টাকে দমন করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলো না। গ্রীক ক্যাপ্টেনের বুকে স্বদেশ প্রেমের কমতি নেই, সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছে সে। এখন প্রশ্ন হলো, কার্গো হিসেবে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ট্রুপস থাকায় টাটরাকে সে আদৌ কাটায়রায় নিয়ে যাবে কিনা। পাহাড় পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা খাইয়ে নিজের জাহাজ ধ্বংস করতে পারবে লোকটা? জাহাজে নিজের দেশের ক্রু রয়েছে, কিন্তু জার্মানদের ব্যর্থ করার জন্যে ওদের যদি বলি দেবার সিদ্ধান্ত নেয় সে?

'হ্যাঁ, ক্রস-কারেন্ট একটা আছে বটে,' বললো রাহাত।

সেই সাথে এই প্রথম অনুভব করলো ব্রিজেলবার্ড, স্টারবোর্ড থেকে পোর্টসাইডের দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে টাটরা। গোটা ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগলো তার। চারদিকে উত্তাল সাগর অনবরত ফুঁসছে, নগণ্য খড়কুটোর মতো ভাসছে টাটরা, এরই মধ্যে প্রাণপণে হুইল আঁকড়ে ধরে মোপাসুর নির্দেশ মতো জাহাজের কোর্স বদল করার চেষ্টা করছে ফকার। একটু পরই দেখা গেল, দু'দিকে এগোচ্ছে টাটরা। ইঞ্জিন তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আর শক্তিশালী কারেন্ট তাকে বাঁ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর একসময় দৃষ্টিভ্রমের মতো একটা ব্যাপার ঘটলো। মনে হলো, আগুপিছু বা এদিক ওদিক কোথাও যাচ্ছে না তারা। ভুলটা ভাঙলো ভয়ংকর একটা দৃশ্য চাক্ষুস করার মাধ্যমে। প্রায় কাছেই বলা যায়, পানির বিশাল সব স্তম্ভ আকাশের দিকে ছুটে গিয়ে ভেঙে পড়ছিল, ব্রিজেলবার্ডের ধারণা হলো, মস্ত ঢেউ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে ওখানে। কিন্তু পানির স্প্রে মুহূর্তের জন্যে একটু থিতিয়ে আসতে দেখা গেল, ওখানে বিশাল একটা কালো ছায়া রয়েছে। পরমুহূর্তে বুঝলো, একটা খাড়া পাহাড়ের আকাশ ছোঁয়া পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। সোজা পাঁচিলের দিকেই এগোচ্ছে টাটরা।

পাঁচিলের গোড়ায় বিস্ফোরিত হচ্ছে সাদা ফেনা, সেই সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজেদেরকে বিধ্বস্ত করছে একের পর এক ঢেউ। বিস্ময়ে, আতংকে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো ব্রিজেলবার্ড। ঠিক এই সময় শান্ত, গম্ভীর সুরে বললো রাহাত, 'আমার হিসেবে, ওটার

কাছ থেকে আর মাত্র ছ'শো মিটার দূরে আছি আমরা···।'

সম্বিত ফিরে পেয়ে গর্জে উঠলো ব্রিজেলবার্ড, 'এর মানে কি? আমরা একেবারে কেপ অব জার্ভোসের গায়ে কাছে চলে এলাম কিভাবে?'

পাঁচিলের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ বোমার মতো লাগছে ওদের কানে। ফকার ফিরেও তাকালো না, বোধহয় কর্নেলের কথা শুনতেই পায়নি সে। ছ'পা এগিয়ে হাত তুললো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, মোপাস্যুর কাঁধ খামচে ধরলো সে। 'বুঝেছি! সবাইকে তুমি ডুবিয়ে মারতে চাও! ইচ্ছে করে···'

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ক্যাপ্টেন মোপাস্যু। তারপর কর্নেলের দিকে ফিরতে শুরু করেছে, এই সময় ব্রিজে ঢুকলো লেফটেন্যান্ট মুলার।

শান্ত, গম্ভীর সুরে জানতে চাইলো মোপাস্যু, 'আপনি কি মনে করেন নিজের লোকদের ডুবিয়ে মারবো আমি? আপনি মনে করেন শুধু সোলজারেরই দায়িত্ববোধ আছে, আর কারও থাকতে নেই?' মাথা একটু কাত করে তার কাঁধের ওপর কর্নেলের হাতের দিকে তাকালো সে। 'আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন কর্নেল। এটা আতংকিত হবার সময় নয়। ফকারের হাতে সব ছেড়ে দিন, নয়তো ওকে বলুন আমার হাতে ছেড়ে দিক হুইল।'

মোপাস্যুর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল ব্রিজেলবার্ড, কিন্তু তার মুখ থেকে চোখ সরালো না। লোকটার চেহারায় ব্যঙ্গ, বিজয়ের উল্লাস, বা ষড়যন্ত্রের আভাস, কিছুই দেখলো না। লোকটাকে বরং নির্লিপ্ত বলে মনে হলো তার।

মুলারের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, নিচে সব ঠিক-ঠাকই আছে, তবে অর্ধেকের মতো সৈনিক জাহাজের ঝাঁকি খেয়ে সী-সিকনেসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রিপোর্ট শেষ করেছে মুলার, এই সময় ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো টাটরা—সাগরে ডুবে থাকা ব্যারিয়ারের সাথে ঘষা খেল তার খোল। ভাগ্য ভাল, ঘষার ওপর দিয়েই কেটে গেল বিপদটা। দরজা খুলে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গেল মুলার। পরমুহূর্তে পোর্টসাইডে কাত হয়ে গেল টাটরা, সেই সাথে বিশাল একটা পানির পাঁচিল ভেঙে পড়লো ডেকের ওপর। চোখের পলকে টন টন পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল মুলার। ব্রিজেলবার্ড ধরে নিল, সাগরে পড়ে গেছে লেফটে-ন্যাণ্ট। কিন্তু পানি নেমে যাবার পর দেখা গেল রেলিঙ ধরে ডেকের ওপর তখনও দাঁড়িয়ে আছে সে। ডেকের ওপর আবার একটা ঢেউ ভেঙে পড়ার আগেই ছুটে পালিয়ে গেল মুলার।

খবরটা অপ্রত্যাশিত না হলেও, উদ্বিগ্ন করে তুললো ব্রিজেল-বার্ডকে। তিন ঘণ্টার মধ্যে তীরে নামতে হবে ইউনিটটাকে, নামার সময় বাধাও পড়তে পারে। কাজেই সৈনিকদের সুস্থ-সবল থাকা একান্ত দরকার, অথচ এরই মধ্যে তাদের অর্ধেক এনার্জি নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্ল্যান করার সময় ধরে নেয়া হয়েছিল সাগর পাড়ি দেয়াটা অনায়াসে সারা যাবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো ঠিক উল্টোটা। তীরে পৌঁছুবার আগে আরও কত কি যে ঘটবে, বলা কঠিন। দীর্ঘশ্বাস চেপে পাহাড়-পাঁচিলের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। পানির অনবরত বিস্ফোরণ ছাড়া দেখলো না কিছু। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো জাহাজ, সেই সাথে শোনা

গেল পাথরের সাথে খোলের ঘষা লাগার তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ। সামনে এগোনো বন্ধ করে ঢেউয়ের গায়ে বাড়ি খেলো টাটরা। ঝট করে অ্যাবওয়েয়ের অফিসারের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। নিঃশব্দে শুধু মাথাটা একবার ঝাঁকালো রাহাত। বোঝাতে চাইলো হ্যাঁ, বিপদ গুরুতর বটে।

পরবর্তী ঢেউয়ের সাথে আবার উঠতে শুরু করলো টাটরা। সামনে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। পানির বিস্ফোরণ মুহূর্তের জন্যে বন্ধ আছে, গালফের এন্ট্রান্স পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল। পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের জন্যে জাহাজের কোর্স বদলাবার কাজে উন্মত্তের মতো ব্যস্ত থাকলো ফকার। মাউন্ট জার্ভোসের খাড়া পাঁচিলের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল টাটরা। এন্ট্রান্সের সরু ফাঁক বরাবর এগোলো জাহাজ।

কিন্তু একটু পরই আর এক বিপদ ঘটলো।

তেরো

প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্রস-কারেন্ট পাহাড়-পাঁচিলের কাছ থেকে জাহাজটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বটে, কিন্তু সেই কারেন্টই এবার আরেক নতুন বিপদের দিকে টেনে নিয়ে চললো ওদেরকে। কুখ্যাত কেপে ঢোকার জন্যে মোপাস্যুর বাতলানো এই সরাসরি কোর্স ধরে এগোনো মানে আপাত দৃষ্টিতে আত্মহত্যা করতে যাওয়া, কিন্তু ব্রিজে দাঁড়িয়ে এখন ব্রিজেলবার্ড বুঝতে পারলো কেন সে এই কোর্সের কথা বলছিল। সারি সারি পাহাড়ের মাঝখানে অসংখ্য ফাঁক আছে, কিন্তু একটা ছাড়া বাকিগুলো দিয়ে ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। ওপর থেকে দেখে মনে হয় প্যাসেজ আছে, কিন্তু আসলে পানির ঠিক নিচে রয়েছে ডুবো পাহাড়ের চোখা মাথা। ক্রস-কারেন্ট ধরে ওই ফাঁকগুলোর পাশ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে চায় মোপাস্যু, এবং প্রবেশ-পথের মুখের কাছে এসে হুট করে ভেতরে ঢুকে পড়তে চায়, তীব্র স্রোত টাটরাকে টেনে আরেক দিকে নিয়ে চলে যাবার আগেই।

পশ্চিম দিকে গ্রীক মেইনল্যাণ্ড মাইল কয়েক দূরে, কিন্তু দূর

উপকূল থেকে পাথরের একটা চেইন গালফের এন্ট্রান্স পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, সেজন্যেই গালফে ঢোকার মুখটা বিপদজনক ভাবে সরু হয়ে আছে। পানিতে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা শেষ পাথর আর মাউন্ট জার্ভোসের খাড়া গা, এই দুয়ের মাঝখানে এন্ট্রান্স, সরু ফাঁক। গালফে ঢোকার একমাত্র পথ।

শেষ পাথরটার দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকলো ব্রিজেলবার্ড। আকারে ওটা ছোট একটা দ্বীপের মতো, পানি থেকে মাথা তুলে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে মাথার দিকে। ওটার সাথে ধাক্কা খেলে একটা যুদ্ধ-জাহাজও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আর ফেরী বোট টাটরার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল নৌ যানের কথা না বলাই ভাল। পাহাড় সমান উঁচু ঢেউগুলো পাথরটার গায়ে ভেঙে পড়ছে, মুহূর্তের জন্যে পানির বিস্ফোরণে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে পাথরের অর্ধেকটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্রিজেলবার্ডের মনে হলো, পাথরটা যেন টাটরার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

'খাড়া পাঁচিলের গা পেঁচিয়ে পথ নাকি আছে একটা,' বললো মেজর হেফনার। 'সেটার মাপজোক না নিয়ে ভালোই করেছি আমরা। চেষ্টা করলেও পারা যেত না। পাহাড়ের গোড়ায় ট্রুপস নামানো অসম্ভব ব্যাপার।'

'আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না,' বললো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড অপারেশনের প্ল্যান করার সময় একজন এক্সপার্ট এই পথের কথা বলেছিল বটে। প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে একেঁবেঁকে উঠে গেছে একেবারে চূড়ার কাছাকাছি, সেই আশ্রম পর্যন্ত। এই পথ ব্যবহার করার প্রস্তাবটা লোভনীয় ছিল। গালফের মাথায়

ল্যাণ্ড করে বিশ মাইল পিছু হটে গন্তব্যে পৌঁছবার ঝামেলায় পড়তে হতো না। আশ্রমে অনায়াসে একবার পৌঁছতে পারলে, ওখান থেকে উত্তরে পেট্রল পাঠিয়ে পুরো পেনিনসুলাটা অনায়াসে দখলে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু গ্রীক ফেরী খুব সকালে কেপে পৌঁছায় দেখে প্ল্যানাররা প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করে। ফেরীতে গেলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব, এটা একটা বিরাট লাভ। তাছাড়া, রাতের অন্ধকারে পাহাড়ী পথটার ম্যাপ তৈরি করা, পরে সেটা ব্যবহার করা কঠিন বিবেচিত হওয়ায় প্রস্তাবটা অধিকাংশ প্ল্যানারের সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়।

'পথ আছে,' ব্রিজেলবার্ডকে বললো রাহাত। 'পাঁচিলের ফাটলে সন্ন্যাসীরা কিছু বাড়ি-ঘর তৈরি করেছে, এঁকেবেঁকে সেখান দিয়ে চলে গেছে সেটা। এই সংসার-ত্যাগীরা একটু অন্য টাইপের সাধারণ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেও দূরে থাকে। সেজন্যেই এই রকম দুর্গম জায়গায় বসবাস করে এরা।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'স্বেচ্ছা নির্বাসনে কি যে আনন্দ ওদের, ওরাই বলতে পারবে। আমার খুব আশ্চর্য লাগে।'

'আপনি জানলেন কিভাবে?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করলো ব্রিজেলবার্ড, কিন্তু উত্তরটা জানার জন্যে মনে মনে অস্থিরতা অনুভব করলো সে।

'বছর কয়েক আগে জার্ভোসে একবার আসতে হয়েছিল আমাকে,' কঠিন চোখে ব্রিজেলবার্ডকে দেখলো রাহাত। 'এই অপারেশনে আমাকে পাঠাবার সেটাও একটা কারণ। পেনিনসু-

লার সব জায়গায় গেছি আমি।'

'আশ্রমে? আপনি কি আশ্রমেও গেছেন?' ব্যস্তভাবে জানতে চাওয়ার কারণ আছে ব্রিজেলবার্ডের। দু'শো লোকের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তিগতভাবে জার্ভোসকে চেনে। মুলার। অনেকদিন আগে সে-ও একবার জার্ভোসে এসেছিল, কিন্তু তার স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। অ্যাবওয়েয়ের অফিসারের কাছ থেকে পেনিনসুলা সম্পর্কে নতুন কিছু জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো কর্নেল।

'হ্যাঁ, আশ্রমেও গিয়েছিলাম আমি। কেন?'

'না, এমনি ভাবছিলাম। যতদূর জানি, পেনিনসুলা উপকূল বরাবর, কেপ আর কাটায়রায় গালফ হেডের মাঝখানে কোথাও ল্যাণ্ড করার মতো সুবিধে নেই...'

'মোলোস আছে—কাটায়রা থেকে বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে।'

'জানি। ওটা ছোট একটা জেলে পাড়া। কিন্তু ওখান থেকে ভেতর দিকে যাবার পথ আছে কি?'

'নির্ভর করে পথ বলতে কি বোঝাতে চান আপনি তার ওপর।' নিভে যাওয়া চুরুট এখনও দাঁতে কামড়ে ধরে আছে রাহাত। 'সরু একটা ফুটপাত, পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে গেছে, কিন্তু শীতের সময় বেশির ভাগটাই তুষারে ঢাকা পড়ে থাকে, খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'হুম,' চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো ব্রিজেলবার্ড, এটা যেন তার কাছে একটা নতুন খবর। আসলে প্ল্যানিঙের সময়ই এসব কথা জানা হয়ে গেছে তার। লাভ হলো এইটুকু যে বুঝলো,

পেনিনসুলার জিওগ্রাফি সম্পর্কে সবই জানে অ্যাবওয়ের অফিসার। জানতে চাইলো, 'কাটায়রার দক্ষিণে নিশ্চয়ই রোড আছে, তাই না?'

'আছে যে সেটা আপনি ভাল করেই জানেন, তা না হলে এই অভিযানে আপনাকে পাঠানো হতো না। এটাও একটা সরু পথ, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। সাথে করে খচ্চর নিয়ে আসা উচিত ছিল আপনার।'

'ব্যাপারটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে ছিল, কিন্তু রুপেসকু থেকে ওদেরকে ফেরীতে তোলা কঠিন হবে ভেবে প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে যায়।' মেয়রের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ব্রিজেলবার্ড। কিন্তু শেষ কথাটা তখনও বলা হয়নি রাহাতের।

'এসব সমস্যা দেখা দেবে আরও পরে। তার আগে গালফে ঢুকতে হবে আপনাকে। কি ঘটছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

সামনের দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠলো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। অ্যাবওয়ের অফিসারের সাথে দু'টো কথা বলার জন্যে একটু অমনোযোগী হয়েছিল, এরই মধ্যে ক্রস-কারেন্টের মেইন ফোর্সের মধ্যে পড়ে এন্ট্রান্সের দিকে মোট দূরত্বের চার ভাগের তিন ভাগ এগিয়ে এসেছে টাটরা। এখন তার কানে নতুন আরেকটা আওয়াজ ঢুকছে। কেপের গায়ে সাগর বিধ্বস্ত হবার আওয়াজের চেয়ে এটা অনেক চাপা, কিন্তু রোমহর্ষক। সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগুণতি পাথরগুলোকে কাছ থেকে করাতের ধারালো দাঁতের মতো লাগছে দেখতে, সেগুলোর গোড়ায় ফুলে-

ফেঁপে ওঠা ঈজিয়ান আছড়ে পড়ছে, ভোঁতা বুম বুম আওয়াজ ঠাণ্ডা হিম কাঁপন তুললো রক্তে। এন্ট্রান্সের খুব কাছে চলে এসেছে তারা, এত কাছে যে পরিষ্কার দেখতে পেল সরু ফাঁক-টার ভেতর প্রায় সমতল হয়ে আছে সাগর, যদিও স্রোত বয়ে যাচ্ছে তীব্র গতিতে—কিন্তু সেই সাথে করাতের সারি সারি দাঁতের কাছেও চলে এসেছে তারা। ঘাড় ফিরিয়ে স্টারবোর্ডের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। ওদিক থেকে কেপ জার্ভোসকে ছুঁয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ফুলে ফেঁপে ওঠা আকাশ ছোঁয়া সাগর—পাঁচতালা বাড়ির সমান উঁচু এক একটা ঢেউ। ফুটন্ত কেটলির ভেতর আধখানা দিয়াশলায়ের কাঠির মতো এলো-পাতাড়ি লাফাচ্ছে টাটরা। দানব আকৃতির এই ঢেউগুলো ব্রিজেলবার্ডের জন্যে আরেকটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। করাতের দাঁতগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এন্ট্রান্সের দিকে যাবার সময় এর একটা যদি অসময়ে হাজির হয়…আর কিছু ভাবতে না পেরে শিউরে উঠলো সে। লক্ষ্য করলো, আবার পোর্টের দিকে তাকালো ফকার। ফকার ওদিকে বারবার তাকাচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সে। দক্ষ ন্যাভাল অফিসার বুঝতে পারছে ভয়ংকর এক দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে তারা। দাঁতের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হবার আগেই এন্ট্রান্সের ভেতর ঢুকে পড়তে হবে।

এক বুক আশা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আসলে করার কিছু নেই। প্রকৃতি যেন ওদের সাথে শত্রুতায় মেতে উঠেছে, এখন ভাগ্য যদি সহায় হয় তবেই রক্ষে। ইঞ্জিনের আও-

হাজ এতোই ভোঁতা আর অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রায়ই সন্দেহ হলো ওটা বোধহয় আর চলছে না। ইঞ্জিন জাহাজটাকে যতটা না সামনে নিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি পাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে শক্তিশালী ক্রস-কারেন্ট। ফকারের গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ পেল ব্রিজেলবার্ড, তাড়াতাড়ি আবার পোর্টের দিকে তাকালো সে। ছড়িয়ে থাকা পাথরের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে টাটরা। সামনে এবং দু'পাশে, তিন দিকেই করাতের ধারালো দাঁত। এণ্ট্রান্সে ঢুকতে আরও সময় নেবে জাহাজ। ক্ষীণ একটা নড়াচড়া ধরা পড়লো ব্রিজেলবার্ডের চোখের কোণে। তাকাতেই দেখলো, উল্টোদিকে, কেপের দিকে তাকিয়ে আছে মোপাস্থ। স্তম্ভিত দেখালো তাকে, ঝুলে পড়েছে মুখ।

মোপাস্থর দৃষ্টি অনুসরণ করলো ব্রিজেলবার্ড। পরমুহূর্তে দু'সারি দাঁত পরস্পরের সাথে ঘষা খেল। থরথর করে কেঁপে উঠলো শরীর। আরেকটা ঢেউ আসছে। এত বড়, এত উঁচু ঢেউ এর আগে কখনও দেখেনি সে। একটা বলা ভুল হবে, একটার ওপর একটা, তার ওপর আরেকটা—তিনটে ঢেউ এক হয়ে ছুটে আসছে টাটরার দিকে। মাথার দিকে তাকালো সে। সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে। আরও ওপরে সাপের ফণার মতো বেঁকে গেছে চূড়াটা। এটা কোনো সাধারণ ঢেউ নয়, এমনকি হয়তো শুধু ঢেউও নয়—সাগরের গভীর গহীন থেকে নিশ্চয়ই একটা জলোচ্ছ্বাস ওপর দিকে ঠেলে উঠছে। ব্রিজের সবাই এখন সেদিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি ফকারও তার দৃষ্টি সামনে ফিরিয়ে নেবার আগে সম্মোহিতের মতো সেদিকে তাকিয়ে

থাকলো। দানবটার কোমর টাটরার ফানেল ছাড়িয়ে গেছে এরই মধ্যে। মাথাটার দিকে তাকাবার জন্যে ওপর দিকে চোখ তুলে আছে সবাই। রেলিঙের ওপর ওদের হাতগুলো যেন পেরেক গেঁথে আটকে দেয়া হয়েছে। শক্ত হয়ে ওঠা শরীরের পেশী নিজে থেকেই কাঁপছে থরথর করে। পিছিয়ে গিয়ে অ্যাবওয়ের অফি-সারকে দেয়ালে পিঠ ঠেকাতে দেখে ব্রিজেলবার্ডও তাকে অনুসরণ করলো। কাঠের দেয়ালে শোল্ডার ব্লেড চেপে রেখে দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ঢেউটার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। প্রতি মুহূর্তে উঁচু, আরও উঁচু হয়ে উঠছে সেটা। নিজের আকার বাড়া-বার জন্যে নিঃশ্বাসের সাথে সাগরকে যেন টেনে নিচ্ছে ঢেউটা। রক্ষে নেই, এ-যাত্রা রক্ষে নেই—ভাবলো ব্রিজেলবার্ড। ওটার গায়ে চড়ে টপকে যাওয়া মস্ত কোনো জাহাজের পক্ষেও সম্ভব নয়!

ঢেউটা আর মাত্র দশ মিটার দূরে। দস্তানার ভেতর হাতের তালু ভিজে গেছে ব্রিজেলবার্ডের। ঢেউটা এসে পড়লো। ক্লান্ত ভাবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটার ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা ঢালে চড়তে চেষ্টা করলো টাটরা। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল টাটরা। পরমুহূর্তে ঢেউটা নিজেই তাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল কোলে। তারপর মনে হলো, অসহায় কাগজের নৌকোর মতো ঢেউয়ের উঁচু ঢালে ঝুলছে জাহাজটা। হাত থেকে রেলিঙ ছুটে গেল হেফ-নারের, ছিটকে ব্রিজের আরেক ধারে, একজন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের সাথে ধাক্কা খেল সে। নিজেকে রেলিঙের সাথে প্রায় পেঁচিয়ে নিল ব্রিজেলবার্ড। তারপর আবার যখন পোর্টের

দিকে তাকালো, মুহূর্তের জন্যে পশ্চিম দিকে ধেয়ে যাওয়া বন্যা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। তারপর পানির গায়ে একটা জানালা দেখা গেল। জাহাজের ঠিক সামনেই এন্ট্রান্স, দু'পাশে তার ধারালো করাতের দাঁত। দাঁতগুলো ওদের দিকে মুখ ভেঙচে ছুটে আসছে। ওপর দিকে তাকালো সে। এন্ট্রান্সের দু'-পাশের পাঁচিল দু'টোকে আকাশ ছোঁয়া দুর্গের মতো লাগলো। নিজের অজান্তেই চোখ বুজে ফেললো সে। সংঘর্ষের আওয়াজ শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে কান। ঝাঁকির আশায় টান পড়লো পেশীতে।

স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে গেল টাটরা। আবার চোখ খুললো ব্রিজেলবার্ড। ফেনা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। মাথার ওপর রাতের আকাশ, শেষ রাতের দু'একটা তারা মিট-মিট করছে। তবে কি ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়েছে টাটরা? বিশ্বাস হলো না ব্রিজেলবার্ডের। পরমুহূর্তে সামনের দিকে ঝুঁকলো জাহাজ। ঢেউয়ের পিঠ থেকে ডাইভ দিয়েছে সে। মাথা উঁচু করে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। এন্ট্রান্সের ভেতর দিকটা দেখা গেল, সমতল হয়ে আসছে পানি। ব্রিজের পিছনের জানালা দিয়ে টাটরার পিছন দিকে তাকালো সে। আরেকটা ঢেউ ছুটে আসছে। কিন্তু এটা আগেরটার তুলনায় অনেক ছোট। সেটার তলা থেকে মাথা চাড়া দিল এন্ট্রান্সের দু'পাশের দু'টো দুর্গ। চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে থাকলো ব্রিজেলবার্ড। এই অস-ম্ভব কিভাবে সম্ভব হলো জানে না সে। কিন্তু বুঝলো, এন্ট্রান্সের ভেতর দিয়ে গালফে ঢুকে পড়েছে টাটরা।

তিন মিনিট পর ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল ব্রিজেলবার্ড। মাথায় এখন অন্য চিন্তা। ইটালিয়ান সী-মাইন সারা মন জুড়ে আছে। এই সময় ভগ্নদূতের মতো ছুটে এল একজন। কি খবর? ইউনিটের ওয়্যারলেস সেটটাকে কে যেন ভেঙে রেখেছে

চোদ্দ

'গেস্টাপো? মেয়র গেস্টাপোর লোক? এই উদ্ভট ধারণা তোমার মাথায় ঢুকলো কিভাবে, হেফনার?'

টেবিলের ওদিকের চেয়ারে বসা সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দিকে গম্ভীর মুখে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। এখন এমনিতেই দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, অপারেশনের এই পর্যায়ে নতুন কোনো দুর্ভাবনার শিকার না হলেও চলবে তার। গালফের ভেতর দিয়ে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে টাটরা, তার চেহারা স্বাভাবিক দেখানোর জন্যে জ্বেলে দেয়া হয়েছে সবগুলো আলো। ব্রিজ থেকে শক্তি-শালী একটা সার্চলাইটের আলো ফেলা হয়েছে সামনের দিকে, চোখের চারপাশ কুঁচকে মাইনের দেখা পাবার চেষ্টা করছে ফকার আর মোপাস্।

ওদেরকে ব্রিজে রেখে নিজের কেবিনে ফিরে এসেছে কর্নেল। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলো হেফনার। কেবিনে ওরা শুধু দু'জন রয়েছে, তাই মনের সন্দেহটা প্রকাশ করে বসেছে হেফনার। 'প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু আমার মন বলছে!'

বললো সে। 'খানিক আগে ডেকে দাঁড়িয়ে ওর সাথে কথা বলার সময়ই সন্দেহটা জাগলো মনে…'

'সন্দেহ! মন বলছে!' চটে উঠলো ব্রিজেলবার্ড। 'প্রমাণ নেই? যত্তোসব! বার্লিনে ওদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কি কারণে তারা এই জাহাজে নিজেদের একজন লোককে পাঠাবে? নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে তোমার একটা থিওরি আছে?'

'তা আছে,' শান্ত সুরে বললো হেফনার। কর্নেলের এই মেজাজের সাথে পরিচয় আছে তার, কাজেই ব্যস্ত হলো না। 'আমরা জানি, এই জাহাজে একজন বেঈমান আছে। সেটা হয়তো গেস্টাপো আগে থেকেই জানে। জানে বলেই নিজেদের একজন লোককে তুলে দিয়েছে টাটরায়। আমরা জানি, ইংরেজ দু'জনকে পালাতে দেবার জন্যে কেউ ওদের বাঁধন কেটে দিয়েছে। তার-মানে, আমাদের ভেতর নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে। তাই যদি হয়, মেয়রের উপস্থিতির একটা ব্যাখ্যা মেলে—স্পাই-টাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সে। গেস্টাপো অফিসার কখনও নিজের পরিচয় জানায় না, মেয়রও জানায়নি। ওয়্যার-লেস ভেঙে দেয়ায় বোঝা যাচ্ছে আমাদের ভেতর এমন একজন কেউ আছে যার উদ্দেশ্য অভিযান ব্যর্থ করা…'

'রাইট! আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি!' বললো রাহাত।

চমকে উঠে দু'জনেই দরজার দিক তাকালো। কখন দরজা খুলেছে মেয়র, দু'জনের কেউই টের পায়নি। ভেতরে ঢুকে দর-জাটা আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল ও, এগিয়ে এসে হেফনার

আর ব্রিজেলবার্ডের মাঝখানের একটা চেয়ারে বসলো।

রাহাতকে দেখে ব্রিজেলবার্ড যেন বরফ হয়ে গেল জমে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট্রি, তার বাধা দেয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, তার কাছ থেকে পরে জবাবদিহি চাওয়া যাবে। তবে, এ-থেকে বোঝা যায়, জাহাজের প্রতিটি লোককে কিভাবে মুগ্ধ, সম্মোহিত করে রেখেছে অ্যাবওয়েরের অফিসারের ব্যক্তিত্ব। এই তো খানিক আগে একজন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক তার কেবিন-মেটকে ব্যাখ্যা করে বলছিল, আড়াল থেকে শুনেছে সে—অপা-রেশনের ওপর চোখ রাখার জন্যে স্বয়ং ফুয়েরার ব্যক্তিগতভাবে পাঠিয়েছেন মেয়রকে। ঠিক এই ধারণাটাই তার মাথাতেও যে খেলেনি তা নয়।

'মেজর হেফনার ঠিক বলেছেন,' দাঁতের ফাঁক থেকে জ্বলন্ত চুরুট হাতে নিয়ে কথা বলছে রাহাত। 'আপনাদের অভিযান ব্যর্থ কবার জন্যে এই জাহাজে কেউ একজন তৎপর হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কারও মনে কোনো রকম সন্দেহ না জাগিয়ে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে সে। এতে আপনাদের অযোগ্য-তাই প্রমাণ হয়। ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটা আমার কাছে গুরুতর গাফলতি বলে মনে হয়েছে। মিশনের ওয়্যারলেস সেট স্যাবো-টাজ হয়ে যাবে, এরচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা আর কি হতে পারে?' ব্রিজেলবার্ডের দিকে তাকালো ও। 'আপনাদের বুলগেরিয়া জেনা-রেল হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে বার্লিনে আমি একটা মেসেজ পাঠাতে চেয়েছিলাম।—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। রেডিও-সাইলেন্স কখন ভাঙতে পারবেন আপনি?'

'জাহাজে থাকতে নয়,' ভেবেচিন্তে উত্তর দিল ব্রিজেলবার্ড। 'তবে এখনও আপনি, তীরে পৌঁছে, মেসেজ পাঠাতে পারবেন।'

দেখে মনে হলো পরম স্বস্তি বোধ করলো রাহাত। আয়েশ করে চুরুটে টান দিল সে। 'এতে কোনো ভুল নেই তো?'

'ঠিক কখন সেটা সম্ভব এখুনি আমি তা আপনাকে জানাতে পারছি না,' এইটুকু বলে একটু থামলো ব্রিজেলবার্ড। ভাবলো, অ্যাবওয়েরে অফিসার আসলে কে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা অ্যাডমিরাল ক্যানারিসের ডান হাতও হতে পারে। সব কথা ওর কাছে গোপন করে যাওয়া বোধহয় উচিত হচ্ছে না। 'আরও একটা ওয়্যারলেস সেট আছে আমাদের, পারফেক্ট কণ্ডিশনে,' গম্ভীর স্বরে বললো সে। 'মিলিটারী সিগন্যাল প্রায়োরিটি পাবে, অবশ্যই, কিন্তু ল্যাণ্ড করার খানিক পর বুলগেরিয়ার সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাবেন আপনি।'

'প্রথম সেটটা তাহলে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে?'

'না, তা নয়। কেউ ওটার টিউনিং কয়েল নষ্ট করে দিয়েছে। সময় মতো অপারেটর ওটা মেরামত করে নিতে পারবে।'

'ওটাকে পাহারা দেবার জন্যে কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি?'

'না-না, তা নয়। পাহারা তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু লোকটা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় ল্যাভেটরিতে গিয়েছিল। খানিক পর ফিরে এসে শরীর খারাপ লাগছিল বলে সেটটা তখুনি আর চেক করে দেখেনি।'

'টিউনিং কয়েল কিভাবে নষ্ট করা সম্ভব?' ব্রিজেলবার্ডকে দম ফেলার ফুরসত দিচ্ছে না রাহাত।

'নষ্ট সেটটা মেজর হেফনার দেখেছে। তার কথা হলো, পিস্তলের বাট, রাইফেলের কুঁদো, হাতুড়ি বা এই ধরনের যে-কোনো একটা কিছু দিয়ে কাজটা করা হয়ে থাকতে পারে। এক মিনিটের বেশি লাগেনি।'

'প্রথম দিকে কেবিনের বাইরে মুখ দেখায়নি কেন ফকার?' জিজ্ঞেস করলো রাহাত। প্রসঙ্গের এই আকস্মিক পরিবর্তন মেজর হেফনারকে বিস্মিত করলেও, ব্রিজেলবার্ডের অভ্যেস হয়ে গেছে।

জবাব এল হেফনারের কাছ থেকে, 'দিন পনেরো আগে রুট আর ভেসেল স্টাডি করার জন্যে এই একই ট্রিপে টাটরায় ছিল ফকার। তখন ছদ্মবেশ নিয়ে থাকলেও ক্রুরা কেউ তাকে এবার চিনে ফেলতে পারে মনে করে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায়নি সে।'

'টাটরা দখল করার জন্যে অস্ত্রপাতি যা দরকার সব তার ট্রাঙ্কে ছিল? যে ট্রাঙ্কটা এত গুজবের সৃষ্টি করে?'

'হ্যাঁ,' অপ্রতিভ দেখালো ব্রিজেলবার্ডকে। অ্যাবওয়ের অফিসার যে সন্তুষ্ট হতে পারছে না সেটা তার গলার সুরেই বোঝা গেল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করলো সে, 'আর কোনো স্যাবোটাজ ঘটবে বলে মনে করি না। দু'টো ওয়্যারলেস সেটই এখন হেভি গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে।'

মেজর হেফনার বললো, 'টাটরা দখল করার সময় আমাদের কাজে কোথাও কোনো খুঁত ছিল না।'

'তা ছিল না। ওই কাজটাই একটু যা ভালভাবে সারতে

পেরেছেন আপনারা।' রাহাত বোঝাতে চাইলো, বাকি সব লেজে-গোবরে করে ছেড়েছেন। হঠাৎ আলোচনায় ইতি টেনে চেয়ারে হেলান দিল ও। চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো জার্মান অফিসার দু'জনকে। কেবিনে ঢোকার পর সিভিলিয়ান কোট খুলে ফেলেছে ওরা। ফিল্ড-গ্রে রঙের অ্যালপেনকরপ্স্ ইউনিফর্ম পরে আছে। একটা টিউনিক, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। ট্রাউজারের নিচের অংশে পট্টি বাঁধা, পায়ের সাথে আঁটসাঁট হয়ে আছে। প্রচুর পেরেক লাগানো ভারি বুট। কোমরে পেঁচিয়ে আছে লেদার বেল্ট, সাথে একটা করে হিপ হোলস্টার, বাঁ দিকে ঝুলছে, ভেতরে ল্যুগার পিস্তল, বাঁট বেরিয়ে আছে।

কারও চেহারায় কোনো ভাব নেই। রাহাত তাকিয়ে আছে কখনও ব্রিজেলবার্ডের দিকে, কখনও হেফনারের দিকে। আর ওরা দু'জনেই তাকিয়ে আছে রাহাতের দিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটলো। খুব জোরে নক হলো দরজায়। সবার আগে সেদিকে ঘাড় ফেরালো রাহাত। বাজখাঁই গলায় বললো ব্রিজেলবার্ড, 'কাম ইন!'

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো লেফটেন্যান্ট মুলার।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলো ব্রিজেলবার্ড। দরজায় নক শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু এখন তাকে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে। বিপদের আভাস পেলে নিজেকে শান্ত রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তার।

'দশ-কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জের একটা পাওয়া যাচ্ছে

না—টাইম ফিউজ সহ।'

সবাই যেন পাথর হয়ে গেল। কিন্তু সবার আগে জ্যান্ত হয়ে উঠলো রাহাত। ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে। ছ'পা এগিয়ে দাঁড়ালো মুলারের সমানে। 'শুনে মনে হচ্ছে ওটা একটা বড় বোমা?'

কর্নেল কিছু বলার আগেই উদভ্রান্ত মুলার উত্তর দিয়ে বসলো নিয়মের বাইরে, উত্তরটা সে সরাসরি রাহাতকেই দিল। 'হ্যাঁ! জায়গা মতো ফিট করতে পারলে গোটা জাহাজ উড়িয়ে দিতে পারবে ওটা।'

'একটা গাড়িতে পাঁচ লক্ষ আপেল ছিল। ওদের,' ফিসফিস করে বললো গ্রীণ। 'সেই গাড়িটা কিভাবে যেন হঠাৎ উল্টে গেছে!' পোর্টহোলের ডান দিকে ম্যালোরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীণ। তার কথা শুনে হাসি পেলেও, হাসলো না ম্যালোরি। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে ও। এমন ক্ষ্যাপার মতো কি খুঁজছে ওরা?

অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের একটা দল ওদের কেবিনটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করছে। বেয়োনেট দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে কিছু আর বাকি রাখলো না তারা। কাবার্ডের কপাটের উল্টো পিঠেও সাবধানে হাত বুলালো, যদি কিছু পাওয়া যায়। চেয়ারগুলো না সরিয়ে সতর্কতার সাথে উঁকি দিয়ে দেখলো তলা আর নিচেটা। কেবিনে এমন এক ইঞ্চি জায়গাও নেই যেখানে ওদের আঙ্গুলের স্পর্শ পড়লো না।

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় সায় দিল ম্যালোরি। 'শুধু ব্যস্ত নয়, একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে ওরা।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তল্লাশি পরিচালনা করছে প্রকাণ্ডদেহী সার্জেন্ট ফ্র্যাংক। যদিও, তার আসল কাজ বন্দীদের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখা। এই খানিক আগে কথাটা আবার তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে মেজর হেফনার। সার্চ চলার সময় অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের দু'একজন চোখে খুনের নেশা নিয়ে তাকিয়েছে বন্দীদের দিকে, কিন্তু ফ্র্যাংকের কড়া শাসানিতে শৃংখলা ভাঙতে সাহস পায়নি তারা।

জার্মান ভাষায় কি যেন বললো ফ্র্যাংক ওদেরকে। মাথা নেড়ে না বোঝার ভাব দেখালো ম্যালোরি। পিস্তল নেড়ে ফ্র্যাংক ওদেরকে একপাশে সরে যাবার ইঙ্গিত দিল। একজন সৈনিক, কেবিনে ঢোকার পর থেকে একবারও ওদের দিকে তাকায়নি, পোর্টহোল খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকালো। তারপর হাত দিয়ে বাইরের রিম ঘষলো, যেন ওদিকে কিছু ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে সন্দেহ হয়েছে তার। তল্লাশিতে সন্তুষ্ট হয়ে পোর্টহোল বন্ধ করলো সে। আবার পিস্তল নেড়ে ওদেরকে আগের জায়গায় ফিরে যাবার ইঙ্গিত করলো ফ্র্যাংক।

'এর ছাই কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' ফিসফিস করে বললো গ্রীণ। 'আপনি কিছু বুঝছেন, স্যার?'

'উঁহু,' বললো ম্যালোরি। 'উঠানে শিয়াল পড়লে মুরগীদের যে অবস্থা হয়, ওদেরও যেন তাই হয়েছে।' ফ্র্যাংক হাজির থাকায় পরম স্বস্তি বোধ করেছে সে। জার্মান সৈনিকদের প্রত্যে-কের হাতে একটা করে কারবাইন রয়েছে। এই অস্ত্রের একমাত্র দোষ হলো, মারাত্মক কোনো টার্গেটের দিকে তাক করা থাকলে

হঠাৎ দুর্ঘটনাবশত গুলি বেরিয়ে যায়। যুবা বয়সের কিছু সৈনিকের কঠোর চেহারা দেখে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না, ফ্র্যাংক হাজির না থাকলে ওর দিকে একাধিক কারবাইন তাক করা থাকতো, কিছু গুলিও বেরিয়ে যেত—পরে ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালাতে অসুবিধে হতো না।

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে গ্রীণ। গালফের মেইনল্যাণ্ড সাইডটা দেখতে পাচ্ছে সে। ক্ষুদে আলোর সারি চোখে পড়লো। কোস্টরোড ধরে উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে আলোকবিন্দুগুলো।

'দেখুন, স্যার—কোস্টরোডে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের লোক···'

'দেখেছি,' পোর্টহোলের দিকে না ফিরে বললো ম্যালোরি। মুহূর্তের জন্যেও কেবিনের ভেতর থেকে চোখ সরাতে রাজি নয় ও। কেবিনটা যারা তছনছ করছে তাদের মধ্যে অন্তত এক ডজন লোকের চোখে খুনের নেশা ঝিক্ করে উঠতে দেখলো ও। ওর পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছিল একজন সৈনিক, ইচ্ছে করে ফেলে দিল হাতের কারবাইন। চোখের পলকে পা সরিয়ে নিল ম্যালোরি। ভারি কারবাইনটা পড়লো ঠিক যেখানটায় ওর পা ছিল। পায়ে লাগলে নির্ঘাৎ হাড় ভেঙে যেত। জার্মান ভাষায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিছু বললো ফ্র্যাংক। কারবাইন তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তখনও সমানে ঘেউ ঘেউ করছে সে।

'ব্যাটাকে শায়েস্তা করা হবে বলে মনে হচ্ছে।' খুশি খুশি গলায় বললো গ্রীণ। 'চোখে দেখতে পেলে মজা হতো।'

'রেডি থাকো,' ফিসফিস করে বললো ম্যালোরি। 'সুযোগ

পেলে ছাড়াছাড়ি নেই।' অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কেউ ওর দিকে তাকায় কিনা, লক্ষ্য করছে।

মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলো গ্রীণ, সত্যি, সেকেণ্ড-লেফ-টেন্যাণ্ট যোদ্ধা বটে। এই পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়তে রাজি নন। উপলব্ধি করলো, যে-লোকের এনার্জি, উদ্যোগ আর আশার কোনো অভাব নেই, তার জীবনে এত সহজে ছেদ পড়তে পারে না। ভদ্রলোক অলৌকিকভাবে হলেও এ-যাত্রা বাঁচবেন। ওঁর ভাগ্যে আরও অনেক উন্নতি আছে। কেউ ওঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নিজেকে হাল্কা, দুশ্চিন্তামুক্ত লাগলো তার। সেকেণ্ড-লেফটেন্যাণ্টের সাথে আছে যখন, এ-যাত্রা তারও মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পরিস্থিতি যে গুরতর তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ভাবছে ম্যালোরি। টাটরায় রয়েছে কমপক্ষে এক কোম্পানী হাইলি-ট্রেইণ্ড জার্মান ট্রুপস্, আশা করা হচ্ছে এদের মধ্যে কিছু লোক হাই অলটিচ্যুডে অপারেট করবে—ইন্টারোগেশনের জন্যে নিয়ে যাবার সময় খোলা একটা কেবিনে চোখ পড়তে কয়েক জোড়া স্কি দেখেছে ও। এবং ওদের পিছনে, গালফের কয়েক মাইল ওদিকে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেইনল্যাণ্ড রোড ধরে উত্তর দিকে ট্রাফিক মুভ করতে দেখেছে ওরা, প্রতিটি গাড়ির হেডলাইটে হুড পরানো আছে। ম্যালোরির মনে কোনো সন্দেহ নেই ওগুলো মিত্রপক্ষের কনভয়, অ্যালকিয়ামন লাইনের দিকে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে গ্রীক জাহাজের আলো দেখতে পাচ্ছে ড্রাইভাররা, কিন্তু জানে না এতে রয়েছে জার্মান সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ একটা ইউনিট, অ্যাল-

পেনকরপ্স্। জানে না, অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকরা জার্ভোসে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে। ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ম্যালোরির মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। আসলে মাউন্ট জার্ভোসের আশ্রম দখল করতে যাচ্ছে ওরা। আশ্রমটাকে তারা অবজার্ভেশন পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করবে, যেখান থেকে কোস্ট রোডটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

'বিশাল একটা কনভয়,' পোর্টহোল দিয়ে এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে গ্রীণ। 'কোস্টরোডের যতদূর দেখতে পাচ্ছি, শুধু আলোর মিছিল!'

'কিছু একটা খুঁজছে এরা,' বললো ম্যালোরি। 'কি হতে পারে সেটা? তাছাড়া, আশ্চর্য, এখনও লাইফ জ্যাকেট পরে আছে কেন?' যাই খুঁজুক নিশ্চয়ই সেটার অপরিসীম গুরুত্ব আছে। আজ সকালে বড় হয়নি ওরা যে সহজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো সে। ওদের এই ছুটোছুটি যদি চলতেই থাকে, তীরে পৌঁছবার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে সৈনিকরা। তল্লাশি শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা, এই সময় ফ্র্যাংকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। ইঙ্গিতে নিজের ঠোঁট দেখালো সে, বোঝাতে চাইলো কথা বলতে চায়। তারপর একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, 'ইংলিশ!' মানে, ইংরেজী জানে এমন লোককে ডাকো।

কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল ফ্র্যাংক। ফিরলো পাঁচ মিনিট পর। সাথে মুলার।

'কি?' সংক্ষেপে জানতে চাইলো মুলার। শীতের রাতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখলো ম্যালোরি।

'তোমরা কিছু খুঁজছো,' বললো ও। 'কি খুঁজছো জানতে পারলে আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারতাম।'

ফল হলো উল্টো। এক পা এগিয়ে এসে হিপ হোলস্টারের কাছে হাত নিয়ে গেল মুলার। ভুল হয়ে গেছে, সাথে সাথে বুঝলো ম্যালোরি। যতটুকু মনে করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে জার্মানরা। চেহারাটা ভারি করে তুলে গম্ভীর স্বরে বললো সে, 'আমি ঠাট্টা করছি না। তোমরা যা খুঁজছো সেটা কোথায় আছে তা যদি আমরা জানি, বলতে আপত্তি কিসের? তাতে অন্তত বালিশগুলো বেয়নেটের খোঁচা থেকে বাঁচবে।'

'আমাকে আর ডেকে পাঠাবে না!' বলে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর আবার ফিরলো ওদের দিকে। 'লাইফ-জ্যাকেট পরোনি কেন?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো ম্যালোরি, 'কেন পরবো? বাইরে এখন ঝড় নেই।'

'আমার অর্ডার, এখুনি পরো ওগুলো। তোমাদের নিরাপত্তার জন্যেই অর্ডারটা দেয়া হলো।' বলে আর দাঁড়ালো না মুলার।

কেবিনে শুধু গার্ড রইলো। গ্রীণ বা ম্যালোরি কেউ কারও দিকে তাকালো না, নিঃশব্দে যে যার লাইফ-জ্যাকেট পরে নিল। আগের সেই বয়স্ক গার্ডটাই পাহারা দিচ্ছে ওদেরকে। তার হাতের মেশিন-পিস্তল সারাক্ষণ ওদের দিকে তাক করা। লোকটার চোখে খুনের নেশা নেই বটে, কিন্তু ওদের দিক থেকে দৃষ্টি একবারও সরায় না। একটু নড়লে চড়লে ঝট করে উঠে দাঁড়ায়,

আগের জায়গায় ফিরে যেতে বলে।

'আর কত দেরি?' হঠাৎ জানতে চাইলো গ্রীণ।

'প্রায় এক ঘন্টা, ফেরীর শিডিউল যদি বজায় রাখা হয়।' ম্যালোরির ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে, ডকে টাটরার ভেড়ার কথা সাড়ে পাঁচটায়। ভোর হবার কিছু আগে।

ছেঁড়া বালিশে মাথা দিয়ে বাঙ্কে শুলো গ্রীণ। 'সাথে বাই-বেল থাকলে সময় কাটানো যেত।' বলে চোখ বুজলো সে, সম্ভব হলে ঘুমাতে চায়।

ঘুম তাড়াবার জন্যে পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ম্যালোরি। কোস্টরোডের দিকে তাকাতেই কনভয়ের আলো দেখতে পেল। আরও এক ঘন্টা। মনে মনে আশা করলো ও, এক ঘন্টায় কিই-বা আর ঘটতে পারে!'

পনেরো

দশ-কিলোগ্রামের কমপোজিট ডিমোলিশন চার্জ টেবিলের ওপর রাখা হলো। জিঙ্কের ওপর কালো রঙ করা একটা কন্টেইনারের ভেতর রয়েছে জিনিসটা, আকার এবং আকৃতিতে অ্যাটাচী কেসের মতো দেখতে। ওপরে একটা হাতল আছে, হাতলের পাশেই একজোড়া স্ট্যাণ্ডার্ড ইগনাইটার সকেট।

'এই জিনিস?' অজ্ঞতার ভান করে প্রশ্ন করলো রাহাত। যেন জীবনে এই প্রথম সে দশ-কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জ দেখছে।

'হ্যাঁ। জোড়ার অপরটা এই জাহাজের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটায় আপনি টাইম ফিউজ দেখছেন না, কিন্তু সেটায় নিঃসন্দেহে চালু অবস্থায় ফিট করা আছে। ফিউজটা ওঁকে দেখাও, মুলার।'

আসলে বদলায়নি, কিন্তু ওদের কানে লাগলো টাটরার ইঞ্জি-নের আওয়াজ যেন বদলে গিয়ে টিকটিক টিকটিক করছে, ঠিক টাইম বোমার মতো। ব্রিজেলবার্ড আর রাহাত ছাড়া কর্নেলের

কেবিনে আর কেউ ছিল না, রাহাতের অনুরোধে এইমাত্র ডিমো-লিশন চার্জটা নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে মুলার। অনুরোধ করার সময় রাহাত ঠাট্টার ছলে বলেছিল, 'আপনাদের অযোগ্যতার জন্যে পৈত্রিক প্রাণটা বোধহয় হারাতে হবে—কিন্তু মরার আগে কিসে মরবো সেটা একবার দেখতে চাই।'

'এই যে, ফিউজ,' বললো মুলার।

দেখতে অনেকটা বড় আকারের একটা ডিমের অর্ধেক। মাথাটা ডায়ামিটারে ইঞ্চি দুয়েকের কিছু বেশি, আর গভীরতা ছয় ইঞ্চি। আবরণটা চকলেট-ব্রাউন রঙের। ফিউজটা হাতে তুলে নিল রাহাত। কিভাবে কাজ করে বুঝিয়ে দিল মুলার। মাথায় আঙটাসহ কাচের ঢাকনি আছে, ঘড়ি চালু করতে হলে সেটা তুলতে হবে। ফিউজটা হাতে রেখেই মুখ তুলে তাকালো রাহাত।

'চার্জের সাথে এরও একটা পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক জানেন তো?'

'হ্যাঁ। কম্প্যানিয়নওয়ের সিঁড়ির নিচে একটা রাকস্যাকে ছিল।'

মেকানিজম পরীক্ষা করতে করতে প্রশ্ন করলো রাহাত, 'পাহারা ছিল না?'

চট করে কর্নেলের দিকে তাকালো মুলার, কর্নেল নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো। 'রাকস্যাকগুলো কার, কোন্‌টার ভেতর কি আছে সব গোলমেলিয়ে গিয়েছিল। অর্ধেকের বেশি লোক সী-সিকনেসে আক্রান্ত না হলে এই ঘটনা ঘটতো না। কর্পোরাল

নিউহফের ধারণা ছিল ফিউজসহ চার্জটা তার সাথে কেবিনের র‍্যাকস্যাকে আছে। কিন্তু পরে জানা গেল, ওটা আরেকজনের র‍্যাকস্যাক। তারটা রয়ে গেছে বাইরে।'

ব্যাখ্যাটা গ্রাহ্য করলো না রাহাত। জানতে চাইলো, 'কর্পোরাল নিউহফ নিশ্চয়ই বাইরে অপেক্ষা করছে? গুড! ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরই আবার ফিরে এল মুলার, সাথে বিশ কি একুশ বছরের একজন যুবক। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ভয়ে একেবারে চুপসে আছে সে। তার ওপর, ভেতরে ঢুকেই পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেল চকচকে মসৃণ মেঝেতে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো সে, স্যালুট করলো ব্রিজেলবার্ডকে। ব্রিজেলবার্ড বললো, 'মিঃ মেয়র যা জিজ্ঞেস করেন উত্তর দাও।' কর্পোরালের সাথে আগে একবার কথা হয়েছে তার।

'এই ফিউজ কি বিশ্বস্ত? ঠিক মতো কাজ করে?' জানতে চাইলো রাহাত।

মুলারের দিকে তাকালো কর্পোরাল। মাথা ঝাঁকিয়ে মুলার বললো, 'বলো।'

কিন্তু তবু ইতস্তত করতে লাগলো কর্পোরাল নিউহফ। বাইরের একজন অফিসারকে কতটা বলা উচিত হবে, ভেবে পাচ্ছে না সে। কেবিনের ভেতর নিস্তব্ধতা। সেটা হঠাৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেল কর্নেলের হুংকারে। 'বলো!'

'না, স্যার, সব সময় ঠিক মতো কাজ করে না,' শুরু করলো

নিউহফ। 'কোনো কারণ ছাড়াই চালু ঘড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর তেমনি কোনো কারণ ছাড়াই, আবার নিজে থেকে চালু হয়ে যেতে পারে। আমরা জানি, ঝাঁকি বা কাঁপন লেগে ওটা বন্ধ বা চালু হয়ে যেতে পারে। ওগুলোর নিজস্ব মতি-গতি আছে, স্যার, যার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। আমি একটা ঘটনার কথা জানি। ফিউজ ডিটোনেট করা হয়েছিল, দু'দিন পর বিস্ফোরণ ঘটার কথা। ট্রেনিঙের সময় ওটা একটা ব্রিজের নিচে ফিট করা হয়। কিন্তু যে লোকটা ওটা ফিট করেছিল, সে-দিনই একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায় সে। কেউ জানতো না ওটার কথা, কাজেই কারও মাথাব্যথাও ছিল না।' একটু থামলো নিউহফ, লক্ষ্য করলো, স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন মিঃ মেয়র। 'দু'বছর পর বোমাটা বিস্ফোরিত হয়। হ্যাঁ, স্যার, ঠিক দু'বছর পর।'

'ধন্যবাদ।' মুলারের হাতে ফিউজটা ফিরিয়ে দিল রাহাত। চার্জের হাতল ধরে নিউহফকে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল মুলার।

'কোথায় তাহলে পৌঁছুলাম আমরা?' জানতে চাইলো ব্রিজেলবার্ড।

'নার্ভের ওপর অত্যাচার বরং আরও বাড়লো। কর্পোরাল কি বললো সে তো আপনি শুনলেনই।'

'শুনলাম বৈকি। ঠিক কোন্‌টার কথা বলছেন?'

ডান হাতটা মুঠো পাকিয়ে টেবিলের ওপরে হালকাভাবে ঘুসি মারতে শুরু করলো রাহাত। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে কয়েক

সেকেণ্ড সময় লাগলো ব্রিজেলবার্ডের। দেখলো, টাটরার ইঞ্জি-নের আওয়াজের সাথে তাল রেখে টেবিলে ঘুসি মারছে অ্যাবও-য়ের অফিসার। জিভ বের করে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ব্রিজেলবার্ড। আরও পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে রাহাত বললো, 'ঝাঁকি বা কাঁপন লেগে ওটা চালু হয়ে যেতে পারে।'

'জাহাজে আর বেশিক্ষণ থাকতে হবে না আমাদের,' বললো ব্রিজেলবার্ড। মনে মনে ভাবলো, কিন্তু ইতিমধ্যে এ-ও সবার জানা হয়ে গেছে ঠিক কখন তারা তীরে ভিড়ছে। 'আর বড়জোর একঘণ্টা। ইতিমধ্যে সার্চ চলতে থাকবে। ওটা আমরা পেয়েও যেতে পারি।'

'কর্নেল ব্রিজেলবার্ড,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রাহাত, মাথা থেকে নামিয়ে হাতে নিল হ্যাট। 'আপনার জীবনের সবচেয়ে লম্বা ঘণ্টা হতে পারে এটা। সামান্য সময়? একঘণ্টা সামান্য সময়? আপনার সাথে এ-ব্যাপারেও আমি একমত নই। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে কোনো কারণে এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের এই দুনিয়া ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। সে-তুলনায় আপনি তো নগণ্য মাত্র। যাই, ওদের সাথে হাত লাগাইগে। কে জানে, হয়তো আমিই সেটা খুঁজে বের করতে পারবো। শোনা যায়, হেভেন প্রটেক্টস দি ইনোসেন্ট।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে এগোবার সময় বুক ভরা খুশি নিয়ে লক্ষ্য করলো রাহাত, অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকরা অন্ধের মতো তল্লাশি চালাচ্ছে। ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পিছনে, কবাটের আড়ালে, চেয়ারের তলায়, এবং এই ধরনের অসম্ভব সব জায়গা

হাতড়ানো হচ্ছে। দম ফেলার ফুরসত নেই কারও। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুতে তিনবার তিনজন সৈনিকের সাথে ধাক্কা খেল সে, প্রতিবারই ওর কাছে মাফ চাওয়া হলো। লোয়ার ডেকে নেমে এল ও। পাপাগোপালাকে সেই আগের সৈনিকই পাহারা দিচ্ছে। ইঞ্জিনরুমটাও ঘুরে এল ও। চীফ ইঞ্জিনিয়রকে পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড। ইঞ্জিনরুমের ভেতর আট-দশজন সৈনিককে দেখলো, সবাই পাগলের মতো চার্জ খুঁজছে। টপ ডেকে উঠে এল ও। খোলা ডেকে সৈনিকদের ভিড় নেই, মাত্র কয়েকজন তল্লাশি চালাচ্ছে। ব্রিজেলবার্ড নির্দেশ দিয়েছে শুধু যাদের সিভিলিয়ান কোট আছে তারাই খোলা ডেকে উঠতে পারবে। কর্নেল জানে, হঠাৎ করে কোনো ব্রিটিশ টর্পেডো বোট এসে পড়তে পারে। সার্চলাইটের আলো টাটরার গায়ে পড়লেই যদি অ্যালপেনকরপ্স্ ইউনিফর্ম দেখতে পায়, সর্বনাশ হতে আর কিছু বাকি থাকবে না।

জাহাজের স্টার্ণের দিকে চলে এল রাহাত। রেলিঙে ভর দিয়ে নিচে তাকালো। জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনা হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউগুলো। ফেরার সময় রশির একটা স্তূপের সাথে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলে আছাড় খাচ্ছিলো। ডেক ধরে আলোকিত ব্রিজের দিকে এগোলো ও। ওর ঘড়িতে এখন চারটে পঁয়তাল্লিশ।

রশির শেষ মাথায় দশ-কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জ ঝুলছে। দোলার মাঝপথে ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন ওটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ধাতব আবরণের সাথে নিয়মিত ধাক্কা খাচ্ছে চার্জটা, কিন্তু তাতে তার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খাওয়া থামছে না। শ্যাফ-টের অনেক নিচে পর্যন্ত ঝুলে আছে রশিটা, কিন্তু শ্যাফটের মাথা থেকে নয়। মাথা থেকে ফিট খানেক নিচে একজন অ্যালপেন-করপ্‌স্‌ সৈনিকের বেয়োনেটের খাপ শ্যাফটের গায়ে জোরজার করে সেঁধিয়ে দেয়া আছে, রশিটা ঝুলছে সেটা থেকে। শ্যাফটের ধাতব আবরণের সাথে চার্জটা ধাক্কা খেলে একটা শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ধাক্কাটা যার কারণে সৃষ্টি সেই ইঞ্জিনের আওয়াজেই সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। জাহাজের মাঝখানে এটা একটা ভেন্টিলেটার শ্যাফট। ওখানে খোঁজ করার কথা এখনও মনে পড়েনি কারও।

'গ্রীক পাপাগোপালা পালিয়েছে—সাথে সাথে জাহাজের সবখানে কড়া তল্লাশি চালাবার নির্দেশ দিয়েছি আমি।' ব্রিজে রাহাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, ভেতরে ঢুকেই রিপোর্ট করতে শুরু করলো লেফটেন্যান্ট মুলার। কর্নেল বিস্ফোরিত হবে, সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো সে। কিন্তু হাতে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল কর্নেল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো, শুধু মাথা ঘুরিয়ে তাকালো মুলারের দিকে।

জিজ্ঞেস করলো, 'কিভাবে ঘটলো, মুলার ? হোল্ডের ভেতর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল সে, ওপরে পাহারায় ছিল প্রাইভেট সারফি।'

'যেভাবেই হোক রশি খুলে ফেলে সে,' এইটুকু বলে ইতস্তত করতে লাগলো মুলার। এরপরের খবরটা শুনে নিঃসন্দেহে

বিস্ফোরিত হবে কর্নেল। 'প্রাইভেট সারফি মারা গেছে, স্যার। ঘাড় ভাঙা অবস্থায় তাকে আমি হোল্ডের মেঝেতে আবিষ্কার করেছি।'

'তার রাইফেল?'

মনে মনে হাসলো রাহাত। সংকট এবং উদ্বেগের মধ্যেও নিজেকে শান্ত রেখে গুরুত্বপূর্ণ খবর জেনে নিতে ভুল করছে না কর্নেল। পাপাগোপালা পালিয়ে যাওয়া এক কথা, একজনকে খুন করে পালিয়ে যাওয়া আরেক কথা, আর রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়া—সম্পূর্ণ অন্য কথা।

'লাশের পাশেই মেঝেতে পড়ে ছিল রাইফেল...'

'ভাল। তাকে ঘিরে ফেলা খুব কঠিন হবে না। বললে, কড়া তল্লাশি। কি রকম কড়া? ক'জন লোককে লাগিয়েছ?'

'পঞ্চাশজন, স্যার।'

'পঞ্চাশজন?' যা কখনও হয় না, কর্নেলের চোখ কপালে উঠে গেল। 'তুমি বলতে চাইছো ডিমোলিশন চার্জ খুঁজছিল যারা তাদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজনকে এই কাজে লাগিয়েছ?' হাত দু'টো কোমরে উঠে গেল ব্রিজেলবার্ডের। 'আর কবে আক্কেল হবে তোমার, মুলার? এই জাহাজের কোথাও টাইম ফিউজসহ একটা এক্সপ্লোসিভ ফিট করা হয়েছে, নাকি সে-খবর তুমি রাখো না? ওটা ফাটলে গালফের মাঝখানে আমরা সবাই ডুবে মরবো, সেটাও বোধহয় জানা নেই তোমার? নিরস্ত্র একজন লোক, হয়তো কোনো আলমিরার ভেতর লুকিয়ে আছে, তাকে এত গুরুত্ব দেবার কি দরকার পড়লো? যাও, ত্রিশজন লোককে

আবার চার্জটা খোঁজার কাজে ফিরিয়ে আনো। পাপাগোপালাকে খুঁজে বের করার জন্যে বিশজনই যথেষ্ট।’

মুলারকে দেখে মনে হলো, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মস্ত একটা ঢোক গিললো সে। তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো, ‘লোকটা নিরস্ত্র নয়, স্যার। তার কাছে একটা রাইফেল আছে···

‘এই না বললে সারফির রাইফেল তার পাশেই পেয়েছো?’

‘তা পেয়েছি, স্যার। কিন্তু আমার মনে হয় প্রাইভেট বুমলার তার লোয়ার ডেক কেবিনে ঘুমাচ্ছিল, এইসময় ভেতরে ঢুকে পাপাগোপালা

‘ঘুমাচ্ছিল?’ আক্রমণের দিক এবং কৌশল বদল করলো ব্রিজেলবার্ড। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একজন সৈনিক ঘুমায় কিভাবে সেটার বিচার পরে করবে সে। বুমলার বোধহয় ভেবেছিল কেউ টের পাবে না। ‘কোথায় সে? পাপাগোপালা তাকে···?’

‘খুন করে রেখে গেছে। দেখে মনে হলো, গলা টিপে মেরেছে। অনেক খুঁজেও তার রাইফেল আর অ্যামুনিশন বেল্ট পেলাম না, নিশ্চয়ই ওই পাপাগোপালাই নিয়ে গেছে।’

মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল ব্রিজেলবার্ড। যা ঘটছে ঘটুক, কিন্তু সবই যদি শুনতে পায় অ্যাবওয়ের অফিসার, না জানি শেষ পর্যন্ত কি আছে তার কপালে! ‘তবু ওই বিশজনকেই তাকে খুঁজে বের করার কাজে লাগাও। একটা জেনারেল ওয়ার্নিং ইস্যু করো—তার কাছে রাইফেল আছে।’

‘সে আমি আগেই করেছি, স্যার।’

'তাহলে খোলা ডেকে যারা রয়েছে তাদের জন্যে স্পেশাল ওয়ার্ণিং ইস্যু করো—নিজেদের মধ্যে গুলি বিনিময় হোক সেটা আমরা চাই না।'

ব্রিজ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল মুলার। সার্চলাইটের আলো অনুসরণ করে গালফের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। রিস্ট ওয়াচ না দেখেও জানে, সোয়া পাঁচটা বাজে। তীরে নামতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। টাটরায় ওঠার পর থেকে অভিযানটাকে পিছিয়ে এবং ব্যর্থ করে দেবার জন্যে যা যা ঘটেছে সব তার এক এক করে মনে পড়ে গেল। রুপেসকু থেকে টাটরায় আসার পথে এক বোট ভর্তি ট্রুপস একটুর জন্যে ডুবে মরেনি। ইংরেজ সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ব্রায়ান ম্যালোরি একজন অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিককে সাগরে ফেলে দিয়েছে। টিউনিং কয়েল ভেঙে অকেজো করে দেয়া হয়েছে একটা ওয়ায়েরলেস সেট। ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের সামনে পড়তে হয়েছিল। ভীষণ শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিমোলিশন চার্জ চুরি করে জাহাজের কোথাও গোপনে ফিট করে রাখা আছে। গ্রীক পাপাগোপালা পালিয়েছে। পালাবার সময় দু'জন সৈনিককে খুন করে রেখে গেছে সে। তারমানে গ্রীসে পা দেবার আগেই দু'শোর মধ্যে থেকে কমে গেছে তিনজন সৈনিক। বাকি পনেরো মিনিটে নিশ্চয়ই আর কিছু ঘটবে না? আসলে, ল্যাণ্ড করতে পঁচিশ বা ত্রিশ মিনিট লেগে যাবে। মাইনের ভয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে জাহাজ, শিডিউল বজায় রাখা যাবে না। এরই মধ্যে স্পীড আরও কমাতে চেয়েছে ফকার, তাহলে সময় থাকতে মাইনগুলোকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা বাড়বে। অনেক রকম

সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, এখনও কোনো মাইন চোখে পড়েনি কারও।

'মেজর হেফনারের সাথে আমার কথা হওয়া দরকার, যদি তাকে পাওয়া যায়।' মন্তব্যের অপেক্ষায় না থেকে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গেল রাহাত। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো ব্রিজেলবার্ড। অ্যাবওয়ের অফিসারের উপস্থিতি তার জন্যে সাংঘাতিক অস্বস্তিকর। যেখানেই যায় সে, পরিবেশটাকে নিজের মতো করে কন্ট্রোল করতে শুরু করে। গোটা জাহাজের মাথায় লোকটা যেন দুঃসংবাদ, দুর্ঘটনা আর ধ্বংসের দেবতার মতো ঝুলছে।

রাহাত বেরিয়ে যাবার এক মিনিট পরই ব্রিজে ঢুকলো ফ্র্যাংক। তার চেহারা দেখেই বুঝলো ব্রিজেলবার্ড, ভাল কোনো খবর নিয়ে আসেনি সার্জেন্ট।

'তোমার আবার কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ব্রিজেলবার্ড।

'প্রাইভেট বার্গকে বোধহয় পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার।'

প্রথমেই পাপাগোপালার কথা মনে পড়লো ব্রিজেলবার্ডের, অন্ধকারে লোড করা রাইফেল হাতে জাহাজের এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করছে। 'বোধহয়? হয় বার্গ হারিয়ে গেছে নয়তো যায়নি। কোন্‌টা?'

'আমরা জানি না, স্যার,' লেফটেন্যান্ট মুলারের মতো গুছিয়ে দ্রুত রিপোর্ট করার ক্ষমতা সার্জেন্ট ফ্র্যাংকের নেই। কমাণ্ডিং অফিসারের প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে যা মুখে এল তাই বললো সে।

'তার মানেটা কি ?'

'অনেকক্ষণ হলো বার্গকে দেখা যাচ্ছে না। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারছে না। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে ··'

'হোয়াট ? তোমার সেকশনকে ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছো তুমি ?'

'খোলা ডেকে রয়েছি আমরা, স্যার। অন্ধকারে সব কিছু চেক্ করতে সময় লাগে···।

'যত তাড়াতাড়ি পারো রিপোর্ট করো আমাকে—বার্গ হারিয়েছে নাকি হারায়নি। যে-কোনো একটা আগে ঠিক জানবে, তারপর। গেট আউট!'

ব্রিজে এত কিছু হচ্ছে, সেদিকে যেন কোনো খেয়ালই নেই গ্রীক ক্যাপটেন মোপাস্থ আর জার্মান ন্যাভাল অফিসার ফকারের। জাহাজ পরিচালনা আর মাইন খোঁজার কাজে মগ্ন হয়ে আছে দু'জনই। এক পা এগিয়ে মোপাস্থর পাশে চলে এল ব্রিজেলবার্ড। 'পাপাগোপালা পালিয়েছে, রাইফেল আর অ্যামুনিশন বেল্ট নিয়ে। ওগুলো সে ব্যবহার করতে জানে? উত্তর দেবার আগে মনে রেখো, সে একজন সিভিলিয়ান, যার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো অধিকার নেই। তুমি যদি তথ্য গোপন করার চেষ্টা করো, এবং তার ফলে আমার কোনো লোকের যদি ক্ষতি হয়, আমি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করবো।'

ব্রিজেলবার্ডের দিকে তাকালো মোপাস্থ। উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত দেখালো তাঁর চেহারা, তবু শিরদাঁড়া খাড়া করেই দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে হলো বলে, জাহান্নামে যাও! কিন্তু শুভ-

বুদ্ধি নিষেধ করলো। বললো, 'সেই ছোটবেলা থেকেই রাইফেল চালাতে জানে সে।'

'কিন্তু আশ্রমে, সন্ন্যাসীদের সাথে থাকে সে, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো ব্রিজেলবার্ড। 'রাইফেল চালানো শিখলো কেন? কখন শিখলো? সন্ন্যাসীদের সাথে থাকলে...'

'পাপাগোপালা এখনও সন্ন্যাসী হবার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেনি, এখনও সে একজন নবিশ মাত্র। কাজেই নিয়ম-আচার মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তার। আশ্রমে সে থাকে, সন্ন্যাসীদের কাজকর্ম করে, এই পর্যন্ত। বই ইত্যাদি কেনাকাটার জন্যে মাঝেমধ্যে তাকেই ইস্তাম্বুলে পাঠায় সন্ন্যাসীরা। ছোটবেলা থেকেই পাখি মারছে সে। হ্যাঁ, রাইফেল খুব ভালোই চালাতে জানে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তাকে আপনি একজন ভাল মার্কসম্যান বলতে পারেন।'

'সেনাবাহিনীতে যায়নি কেন? খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? কি করেছে সে?'

'আমার দু'জন লোককে খুন করেছে।'

বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না মোপাসুর চেহারায়। এমন ভাব করলো, এ-ধরনের কাজ যেন পাপাগোপালার পক্ষে সম্ভব।

'জাহাজটা ভালোই চেনে সে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এখনও যখন তাকে পাননি, তাড়াতাড়ি পাবেন বলে মনে হয় না। জাহাজে লুকাবার জায়গা তো আর কম নেই, সব-

গুলোর কথা জানা আছে তার।' প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইলো মোপাস্থ, 'টাইম বোমাটা পাওয়া গেছে?'

'না।'

'এখনও অবশ্য সময় আছে।'

সময় নেই, সময় নেই! বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো ব্রিজেলবার্ডের। কেন যেন অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে তার, ঠিক শেষ মুহূর্তে, সৈনিকরা যখন টাটরা থেকে নামতে শুরু করবে, ঠিক সেই সময় ফাটবে টাইম বোমা।

দড়াম করে খুলে গেল ব্রিজের দরজা। কর্নেলকে দেখে স্যালুট করলো একজন সৈনিক। রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'মাইন, স্যার! মাইন দেখা গেছে! পোর্ট বোর দিকে!'

লণ্ডন।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ভোর চারটের ঘণ্টা পড়লো। সেই সাথে হেসে উঠলেন জেনারেল ব্রায়ান ম্যালোরি। গল্পের মধ্যে এতক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিল ওরা তিনজন, বৃদ্ধ জেনারেলের হাসি শুনে হুঁশ ফিরলো।

যে-যার সোফায় নড়েচড়ে বসলো ওরা।

'রাত তো শেষ হয়ে এল...' শুরু করলেন বৃদ্ধ জেনারেল।

তাকে বাধা দিয়ে বললো রানা, 'কিন্তু গল্প তো শেষ হলো না!'

'সেজন্যে তোমাদের মনে যদি খেদ থাকে তো বলো...' বৃদ্ধের চোখে কৌতুক ঝিক্ করে উঠলো। 'আর যদি মনে করো, শুনতে

ভাল লাগছে না, তাহলে

রানা, সোহেল আর সোহানা একসাথে প্রতিবাদ জানালো তিনজনই। 'ভাল লাগছে না মানে?'

'লাগছে?' মিটিমিটি হাসলেন জেনারেল ম্যালোরি।

'একশোবার...'

সোহেলকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল। 'ঠিক আছে, শোনা যাক কার কি রকম লাগছে। প্রথমে, লেডিস ফার্স্ট, সোহানা তুমি বলো, মেজর রাহাতের গল্প কেমন লাগছে তোমার?'

'চীফের গল্প শুনছি বলে মনেই হচ্ছে না,' সাথে সাথে নিজের অনুভূতির কথা জানালো সোহানা। 'মনে হচ্ছে ··মনে হচ্ছে···' আরও একটু ইতস্তত করে পাশে বসা রানার দিকে তাকালো সে, তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে আমি যেন মেজর রানার একটা অ্যাসাইনমেন্টের রিপোর্ট শুনছি।'

'আমার একেবারে মনের কথা।' প্রায় চিৎকার করে বললো সোহেল। 'আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে। আপনি যতবার রাহাত শব্দটা উচ্চারণ করেছেন ততবার আমি চোখের সামনে চীফকে নয়, রানাকে দেখতে পেয়েছি।'

'স্ট্রেঞ্জ।' কৌতূহলী চোখে রানার দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ জেনারেল। 'এবার তোমার অনুভূতির কথা শোনাও, ইয়ংম্যান।'

একমনে কি যেন ভাবছিল রানা, জেনারেলের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাঁর দিকে তাকালো। 'আমার কাছে মেজর রাহাতের গল্পটা কেমন লাগছে? এক কথায় এর উত্তর দেয়ার সাধ্য আমার নেই, জেনারেল। শুধু বলতে পারি, মেজর রাহাতের

গল্প শুনতে শুনতে আমি যেন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারছিলাম। বিপদে পড়লে আমার মনের যে অবস্থা হয়, মেজর রাহাতকে বিপদে পড়তে দেখে এই নিরাপদ ঘরে বসেও ঠিক সেই অনুভূতি হচ্ছিলো আমার।'

'সংক্ষেপে তোমরা কি তাহলে বোঝাতে চাইছো, গল্পটা তোমাদের ভাল লাগছে?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন ম্যালোরি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ওরা তিনজন।

'তাহলে তো আবার বসতে হয়,' বললেন ম্যালোরি। 'আবার তোমাদের কখন সময় হবে...'

'আপনার সময় হলেই আমাদের সময় হবে,' তাড়াতাড়ি বললো রানা। 'একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার না হয় বেলা দশটার দিকে...?'

'ইয়ংম্যান, ভুলে যাচ্ছো আমার বয়স হয়েছে,' কৃত্রিম অভিযোগের সুরে বললেন ম্যালোরি। 'তোমাদের মতো প্রাণশক্তি কোথায় আমার? বুড়োকে আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যদি ক্ষমা করো...'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'তাহলে আবার আমরা রাতে বসি?'

'আর কতটা বাকি আছে গল্প?' জানতে চাইলো সোহানা।

জেনারেল উত্তর দেবার আগেই সোহেল তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললো, 'কিন্তু, স্যার, সময় কম মনে করে আপনি আবার গল্পটা সংক্ষেপ করার বা কাট-ছাঁট করার চেষ্টা করবেন না, প্লিজ!'

'শেষ করতে বোধহয় আরও দু'তিন রাত লাগবে, তাই না?' জানতে চাইলো সোহানা।

'মনে হয় না,' বললেন জেনারেল। 'আর এক রাতেই শেষ করা যাবে।'

কেমন যেন নিরাশ দেখালো ওদেরকে।

'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম...'

ওকে বাধা দিল সোহানা, 'ও-কথা বলছো কেন? কষ্ট দেয়া এখনও শেষ করিনি আমরা। ক্ষমা যদি চাইতেই হয়, সবশেষে চাইবো...'

'ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ গল্পটা আমিই নিজের অন্তরের তাগিতে তোমাদেরকে শোনাতে চেয়েছিলাম,' মুচকি হেসে বললেন ম্যালোরি। 'তবে, এখন দেখছি কাজটা আমার ভুলই হয়ে গেছে।'

'কেন, কেন?'

'আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে এই গল্পটা শেষ হলেই তোমরা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবে, আরেকটা গল্প শোনাবার জন্যে!' বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ।

'এবং তারপর আরেকটা।' বললো রানা।

'এবং তারপর আরও একটা,' হাসি থামিয়ে বললেন বৃদ্ধ। "এভাবে যদি চলতে থাকে; এর শেষটা কোথায় গিয়ে থামবে?'

'আপনার গল্পের ঝুলি খালি হলে,' বলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সোহানা। ওর দেখাদেখি বাকি দু'জনও উঠলো।

'গল্পের ঝুলি খালি হবে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ম্যালোরি। 'উঁহু, ইয়ং লেডি, তা সম্ভব নয়। রাহাত সম্পর্কে এত কথা জানি আমি, আর যে ক'দিন বাঁচবো, বলে শেষ করার

জন্যে যথেষ্ট নয়। আরে, তোমরা উঠে দাঁড়ালে যে? এত রাতে যাবে কোথায়? আমার এই বাড়িতে ইচ্ছে করলে পুরো এক কোম্পানি সৈনিককে থাকার জায়গা দিতে পারি আমি। সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানেই তোমরা থাকতে পারো। কোথাও যাবার কোনো দরকার নেই।'

'কিন্তু…'

'কোনো কিন্তু নয়। রাহাতের সাগরেদ তোমরা, তোমা-দেরকে আমি এই অসময়ে ছেড়ে দিতে পারি না। এসো, আমার সাথে এসো তোমরা।'

বৃদ্ধ জেনারেলের পিছু পিছু এগোলো ওরা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

তানভীর খান
১/১৫ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

কাজীদা, আমি আপনার তথা 'সেবা'র একমাত্র ভক্ত বা পাঠক—যার কাছে সবচেয়ে বেশি 'সেবা প্রকাশনী'র বই আছে। এ পর্যন্ত আপনাদের যে সমস্ত বই বের হয়েছে তার সব কটাই আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছে, অবশ্য 'কুয়াশা' বাদে। আমার লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে যা বর্তমানে আপনাদের কাছে বা মার্কেটে নেই। যেমন-দুঃস্বপ্নের আগে, অপরিণত পাপ, রক্ত পুতুল, কলঙ্কিনী, দ্বীপ বিভীষিকা, দুষ্টগ্রহ, বিপদ সংকেত, আমি কি হত্যাকারী, ইত্যাদি। এই সমস্ত বই কালেক্ট করে আমি গর্ব অনুভব করি। আমার কাছ থেকে অনেকেই এই সমস্ত বই পড়ে 'সেবা'র লেখকদের লেখনীর সাথে পরিচিত হতে পেরেছেন।

০ জেনে সুখী হলাম।

ইয়াসমিন মাহবুবা
টি-১৫/এ আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

আমি আপনার "মাসুদ রানা" সিরিজের একজন অন্ধ ভক্ত।

এই সিরিজের বইগুলো পেলে আর কোনো কিছুর কথা মনে থাকে না, ইচ্ছা করে শুধু পড়ি। দেরিতে শুরু করলেও সিরিজের অনেক বই পড়া হয়েছে। প্রত্যেক বইতে মাসুদ রানাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আপনার সর্বশেষ বই "প্রতিশোধ"-১, ২ পড়লাম। বেশ ভাল লেগেছে।

০ ধন্যবাদ।

আবু তাহের
মধ্যপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রতিশোধ-১, ২ ভাল লেগেছে, তবে 'আলী হোসেন'কে এমনি ছেড়ে দেয়াতে আপনার উপর রাগ করেছি।

চট্টগ্রামের পাঠক, ভাই মুজিব উদ্দীনের প্রস্তাবে (...অতীতের কোনো ঘটনা ফুট-নোট দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে বারণ করেছেন।) প্রবল আপত্তি জানাচ্ছি। কারণ ফুট-নোটে পাঠকের উপকার বৈ অপকার হয় না। কাজেই আমার অনুরোধ, কাজীদা, আগের মতোই ফুট-নোট দিলে সাধারণ পাঠক সমাজ উপকৃত হবে বলে মনে করি। সেই সাথে প্রিয় "রানার" রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে সুবিধা হবে। পরিশেষে, আপনার ও সেবা'র সাথে সংশ্লিষ্ট সবার কুশল কামনান্তে এবং আসন্ন 'রানা'র অপেক্ষায়।

মালিকা লতা আহ্‌মেদ
বিল কৃষ্ণপুর, রাজশাহী।

কাজীদা, আপনার লেখা খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে বর্ণনা ভঙ্গি। তাই আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আর, না বলে রানাকে ভালবেসেছি, তার জন্য

মাফ চাই।

০ ঠিক আছে। তবে বলে কয়ে ভালবাসলেই বোধহয় ভাল করতেন ··হয়তো পারমিশন দিয়ে দিতাম।

নাজনীন হক
২৭৩/২ জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, ঢাকা।

প্রতিশোধ-১ ও ২ পড়লাম। ধন্যবাদটা কাকে দেবো? আপনাকে না হেডলী চেজকে? আর প্রতিশোধ নামকরণ না করে আবিদ নামকরণ করলেই তো ভাল হতো।

০ প্রতিশোধ পড়েছেন বলে বরং আমিই আপনাকে ধন্যবাদ দিই। আর, নামকরণের ব্যাপারে রুচির মিল হলো না—দুঃখিত।

কৌতুক

নেছার উদ্দীন আহমেদ
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ, যশোহর।

আমার শখের পোষা বিড়ালটি হারিয়ে যাওয়ায় বহুল প্রচারিত এক সংবাদপত্রে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাতে দিয়ে আসলাম। পরদিন বিজ্ঞাপনটি ছাপা হলো কিনা জানার উদ্দেশ্যে বাজারে গিয়ে হকারের নিকট একটা পত্রিকা চাইলাম। হকার বল্লোঃ পত্রিকা তো ছাপা হয়নি। আমি প্রশ্ন করলামঃ কেন? উত্তরে সে বললোঃ কারণ, গত রাত্রে অফিসের সবাই "বিড়াল" খুঁজতে গেছিল।

মোঃ হুমায়ুন কবীর বেলাল,
নওয়াদাবগা, সরকারপাড়া, বগুড়া।

এই গ্রামে বসেই 'সেবা প্রকাশনী'র প্রতিটি বই পাই।

রাজশাহীতে বড় ভাই থাকেন। তিনি "জ্ঞানের আলো" রানী-বাজার, রাজশাহী হতে বই সংগ্রহ করে এবং পড়ে আমার নিকট পাঠান। আপনার "নিরাপদ কারাগার" ১, ২ এতো ভাল লেগেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

০ জেনে সুখী হলাম। ধন্যবাদ।

আ. স. ম. খায়রুল আলম বাবু,
শিববাটী, বগুড়া।

প্রতিশোধ-২ বইটি ভাল লাগলো। খুশি হয়েছি প্রতিহিংসা-পরায়ণ কেয়ার ভয়ার্ত পরিণতিতে । তবে ডিউকের আসল পরিচয় ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে জানালে আরও ভাল হতো। মাসুদ রানা সিরিজের আরও বই ডিউককে নিয়ে লিখলে ভাল হয়।

বুলবুল মুরাদ
ডাকবাঙলো রোড, রহনপুর, রাজশাহী।

কুআকিমাকুদেকুর কুসকুবাকুর কুপ্রিকুয় কুমাকিসুকুদ কিরা-কুনা। কিরাকুনা কুনিকিজেকুর কুদেকুশকিকে কুভাকুলোকিবাকুসে; কুআকুমকুরাকুও কুআকিমাকুদেকুর কুদেকিশকুকে কুভাকুলোকিবা-কুসি। কুভাকুলোকিবাকুসি কুকাকুজীকুদা কুতোকিমাকিকে। কুকাকুজীকুদা কিতুকুমিকিও কুআকিমাকুদেকুর কুসকুবাকুইকিকে কুভাকুলোকিবাকুস, কুতাকুই কুনা ?

০ কুতাকুই।

রুনা
হরিনারায়ণপুর, নোয়াখালী।

মাসুদ রানার নিয়মিত পাঠিকা না হলেও গত চার বছর ধরে

রানার সাথে আমার পরিচয়। সেবা প্রকাশনীর বই আমার প্রিয় বই এবং অবসর মুহূর্তগুলোতে 'সেবা'কে কাছে পেলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হয়। এইমাত্র প্রতিশোধ-২ শেষ করলাম। বই দু'টো ভীষণ ভাল লেগেছে। তবে বই শেষ করে টিনার জন্য কেন যেন মনটা দেখলাম ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। আপনার আগামী যে কোনো বইতে ডিউকের পাশে টিনাকে দেখতে চাই।

০ কাহিনীর প্রয়োজনে যদি এসে যায় আমার আপত্তি নেই।

শংকর বড়ুয়া,

পলিটেক্নিক কলেজ, বরিশাল।

'প্রতিশোধ' পর্যন্ত অনেকগুলো বই লিখেছেন, কিন্তু মাসুদ রানা "ডিউক" চরিত্রে খাপ খাচ্ছে না। কারণ 'দুর্গম দুর্গ', 'সেই উ সেন', 'আমিই রানা', 'পালাবে কোথায়' ইত্যাদির মতো বইগুলোতে রানার যে অ্যাকশন দেখেছি সেই হিসেবে 'ডিউক' চরিত্রে রানাকে দুর্বল লাগছে।

০ মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

আ. ব. ম. আমিরুজ্জামান/পিয়াল,

রুলী কটেজ, লালকুঠি ধাপ, রংপুর।

আমার মা-বাবা, ভাই সকলেই "মাসুদ রানা" সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা নিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন? রানার দু-চারটে বই যখন আমি জোর করে পড়ালাম তখন থেকেই ওনাদের পেয়ে বসেছে 'রানা' রোগে। আমার ট্রাঙ্কটা নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করেছেন ওনারা ক'জন। কিন্তু কাজীদা, একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম। আমার বড় বোন, যিনি

এবার মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী—আমার হাতে রান্না দেখলেই ক্ষেপে যায়। এতো চেষ্টা করলাম কিন্তু এই দজ্জাল মেয়েটাকে কিছুতেই বশে আনতে পারলাম না। একটা উপায় বাতলে দিন—প্লিজ।

০ হিপনোটাইজ করো।

তুষার কুমার দে,
ছুর্বার বেতার শ্রোতা সংঘ, গুনাইঘর, কুমিল্লা।

নববর্ষ উপলক্ষে 'সেবা প্রকাশনী' আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের কি উপহার দেবে?

০ বই।

মোঃ আলাউদ্দীন,
মেথা রোড, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

প্রতিশোধ-২ এক নিঃশ্বাসে শেষ করে উঠলাম। কিন্তু এক জায়গায় এসে খটকা লাগলো। ১৬১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় বাক্যে 'দশ ঘোড়ার ইঞ্জিন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য শাচৌ-কে ধন্যবাদ। আর খুব শীঘ্রই মাসুদ রানা সিরিজে গিল্‌টি মিঞার আগমন আশা করছি। রকিব হাসানের "বিশ্বের বিস্ময়"-২ প্রকাশ পাচ্ছে না কেন? ছুই-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষার অবসান ঘটাবার জন্য অনুরোধ করছি।

০ দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনকে 'দশ ঘোড়া' বলা হয়েছে—অশ্ব-শক্তি একটা শক্তি মাপার মান।...সব অনুরোধই রক্ষার চেষ্টা করবো।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী,
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিলেট।

এইমাত্র 'প্রতিশোধ'-১, ২ পড়লাম। এক কথায় দারুণ! ডিউককে আবার পেয়ে খুবই ভাল লেগেছে। কেয়া চৌধুরী ও শাহেদ-এর চরিত্র চমৎকার হয়েছে। বেচারী টিনার জন্য দুঃখ হয়...। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য প্রচ্ছদ শিল্পীকে ধন্যবাদ জানাবেন। সবশেষে, সুন্দর বই উপহার দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো না, একরাশ শুভেচ্ছা গ্রহণের অনুরোধ করবো।

o আপনার শুভেচ্ছা রেখে দিলাম বুক-পকেটে। ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম প্রচ্ছদ শিল্পীকে।

রফিক আমিন
ফুলবাড়িয়া, জামালপুর।

শুভেচ্ছা রইলো। প্রতিশোধ-২ এই মাত্রই শেষ করলাম। কি বলবো, বলুন? খুব ভাল, দারুণ সুন্দর, এই সব? না-না মশাই, এই সবতো সবাই বলছে সব সময়, আমার না বললেও চলবে, তাই না? যাক, বইটাতে দেখলাম প্রকাশকাল নভেম্বর '৮২ কিন্তু আমার পড়ার সৌভাগ্য হলো ১২·১২·৮২তে। এর কারণ কি? আগামীতে বই প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে পাঠিয়ে দেবেন। বুক-স্টলে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে আপনারাই নাকি পাঠাতে দেরি করেন। যাক "রানা" নাকি জামালপুরের উপর দিয়েই "খুলনা" গিয়েছিল? খবরটা দিলেনই যখন, কিছুদিন আগে দিলেই তো পারতেন। দেখাটা তো অন্ততঃ করতে পারতাম। রানা সত্যিই ভাগ্যবান, নয়তো সকাল দশটায় জামালপুর থেকে ঐদিনের

পত্রিকা কিনলো কি করে? কারণ জামালপুরে পত্রিকা আসে দুপুর একটা-দেড়টায়। আর, একটা কথা, পাঠকরা আলি হোসেনের ওপর যেভাবে রেগেছে, পুলিশের সঙ্গে তার যতোই দহরম মহরম থাক, তার মাথাটার ভবিষ্যৎ খুব ভাল মনে হচ্ছে না। ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন।

০ ওকে পেলে তো বলবো! ব্যাটা গা ঢাকা দিয়েছে।··· বইটি আসলে বেরিয়েছে ডিসেম্বরের আট তারিখে। কাজেই আপনার পেতে খুব দেরি হয়নি।···চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আবিদ
হেলেনাবাদ কলোনী, রাজশাহী।

'অশুভ সংকেত' পড়লাম। সত্যিই অতুলনীয়। বইটা হাতে নেয়ার পর কখন যে শেষ হয়ে গেল টেরই পাইনি। সেবা থেকে এইরকম বইয়ের সত্যিই অভাব ছিল। "অশুভ সংকেত" সে অভাব কিছুটা পূরণ করলো। কাজি মাহবুব হোসেনের সাবলীল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর গুণে বইটা অপূর্ব স্বাদ সৃষ্টি করেছে। ওনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। আশাকরি তিনি এরকম আরও বই আমাদের উপহার দেবেন। প্রতিশোধ-১, ২-এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

০ চিঠির জন্য আপনাকেও।

মুনির আহমেদ চৌধুরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

এইচ. জি. ওয়েলসের 'দি ইনভিজিবল ম্যান' বইটি কি সেবা প্রকাশনী থেকে বাংলায় পাবো? অনেক নাম শুনেছি, কিন্তু বইটি

কখনও পড়বার সুযোগ হয়নি। বাংলায় পেলে আমার মনে হয় সেবা'র পাঠক-পাঠিকা বইটি লুফে নেবেন।

০ আমারও তাই মনে হয়। সুলেখক আসাদুজ্জামান বইটি অনুবাদ করতে আগ্রহী। আমরা খুঁজছি ইংরেজী বইটা, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। পরিচিত কারও কাছে আছে? পারবেন, মাস দু'য়েকের জন্যে ধার দিতে? তাহলে মার্চ-এপ্রিল নাগাদ পেয়ে যাবেন 'অদৃশ্য মানব।'

এস, এইচ, হাসান (নওশাদ)
সরকারী বৃন্দাবন কলেজ, হবিগঞ্জ, সিলেট।

এইমাত্র "প্রতিশোধ-২" শেষ করলাম। ভালোই লেগেছে। বলতে দ্বিধা নেই বইয়ের শেষান্তে এসে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে বেদনার করুণ রসে সিক্ত হতে বাধ্য করেছেন। "কেউ জানলো না, ঝোপের আড়ালে একটা জিগে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে তখন মেয়েটা"—এ জায়গায় এসে টিনার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারিনি।

'প্রতিশোধ-১' শুরু হয়েছিল ট্রাজেডির মধ্যে দিয়ে, দ্বিতীয় খণ্ডে এসে তার সমাপ্তি ঘটলো ট্রাজেডির গভীর কারুণ্যের মধ্যে দিয়েই।

শামসুদ্দিন আহমেদ
জল্লারপাড়, সিলেট।

রকিব হাসানের অনুবাদ 'বিষ-বলয়' ভাল লেগেছে। আন্দাজ করছি, এরপর সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হবে মাসুদ রানা সিরিজের ১০৯ নং বই—যদিও নামটা কি জানি না। যদি বিষ-বলয়ের শেষ পৃষ্ঠায় আগামী বইয়ের নাম পেতাম, তাহলে ভাল

হতো।

০ ঠিকই বলেছেন। এবার থেকে প্রত্যেক বইয়ের তৃতীয় প্রচ্ছদে জানিয়ে দেয়া হবে আগামী বইয়ের নাম, বিষয়বস্তু, এবং সম্ভব হলে দাম।

প্রাপ্তি-স্বীকার

১। সহিদ, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট। ২। শামীম কবীর, টাইলা, রজনীগঞ্জ, সিলেট। ৩। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বাচ্চু, গুড়বাজার রোড, ঝিনাইদহ, যশোর। ৪। মনি, চঞ্চল, শামসুদ্দিন ছাত্রাবাস, সিলেট মেডিকেল কলেজ, সিলেট। [মাসুদ রানা বইগুলোর নাম দিয়ে বেশ চমৎকার রচনা হয়েছে।] ৫। মোঃ খুরশীদজামান, টেপাখোলা, ফরিদপুর [ঠিক।] ৬। মোঃ সাইফুল ইসলাম / জুয়েল, পশ্চিম পাড়া, গাইবান্ধা, রংপুর [পরীক্ষার সময় গল্পের বই সম্পূর্ণ বাদ দেয়া উচিত বলে মনে করি।] ৭। মোঃ হাবিবুর রহমান / জাহিদ, নালুয়ার দীঘির পশ্চিম পাড়, কুমিল্লা ৮। তুহিন, ৬৯/১, যোগীনগর, উয়ারী, ঢাকা-৩। ৯। জাহাঙ্গীর জাভেদ, শহীদ মির্জা লেন, মেহেদিবাগ, চট্টগ্রাম। ১০। আজম খান, পাইকপাড়া, মীরপুর, ঢাকা [ইউরোপ-আমেরিকায় শৌচকর্মের জন্য যে টিশু কাগজ ব্যবহার করা হয় তাকেই টয়লেট পেপার বলে।] ১১। বিয়াস, মৌলভীপাড়া, খুলনা। ১২। মোহাম্মদ হোসেন, রূপালী ট্রেডার্স, পাঠানটুলী রোড, চট্টগ্রাম ['তিমির প্রেমে'র জন্য আপনার স্পেশাল ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম রকিব হাসানকে।] ১৩। নারায়ণ কান্তি ধর, ডুলা হাজারা, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম [না। পচাব্দী গাজী এখন আর বাঘ মারেন না। বাঘ মারা আইনত নিষিদ্ধ।]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন।

কিন্তু অনেক ঘুরে, অনেক খুঁজে, পুস্তক বিক্রেতাকে অনেক অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ-উপরোধ করেও অনেক পাঠক সেবা'র বিশেষ কোনো বই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমাদের কাছে চিঠি আসে।

তাঁদের জন্যে আমরা ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি। ইচ্ছে করলেই আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। নতুবা নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

স্টার ওয়রস্

মূল—গ্যারী কুর্জ ।। রূপান্তর—রকিব হাসান

মূল্য—এখনও স্থির হয়নি। বেশ মোটাসোটা হচ্ছে বইটি।

বিষয়—বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী। মহাশূন্যের কয়েকটি গ্রহ দখল করে নিয়েছে এক অত্যাচারী জঘন্য চরিত্রের লোক, গণতন্ত্রকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে নিজেকে ঘোষণা করেছে সম্রাট বলে। কিন্তু কিছু মানুষ মুখ বুজে সহ্য করলো না। বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিল বিবেকবান সবাই। শুরু হলো এক মহাযুদ্ধ।

রানা-১০৯

দুই খণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

মেজর রাহাত-১

মেজর জেনারেল ব্রায়ান ম্যালোরির মুখে
গল্প শুনছে ওরা তিনজন—রানা,
সোহানা আর সোহেল।
শুনছে মেজর রাহাত বলে এক যুবকের
অসমসাহসিক কীর্তিকলাপের কথা।

অবাক হয়ে ভাবছে রানা—
সত্যিই কি মেজর রাহাত, নাকি
ও নিজেই যুদ্ধ করেছিল সেদিন?
কিম্বা তারও আগে; প্রথম মহাযুদ্ধে?
যুগে যুগে ও-ই কি ঘুরে ফিরে
আসছে পৃথিবীতে বারবার?
নইলে এত মিল পাচ্ছে কেন সে নিজের সাথে?
এই ভাবেই কি ঘুরছে জীবনের চাকা—
পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বারবার একই কাহিনীর?
ভাবছে, যাই হোক, সুযোগ যখন হয়েছে বুড়োর
গোপন কথা জানবার—
এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

চোদ্দ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম ঃ ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-